

পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা

লোধ · বসু · চট্টোপাধ্যায়

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class IX.
Vide Notification No. TB/74/IX/PS/75 and also Board's letter No. 11220/G Dated 11.12.75.

পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা

[নবম শ্রেণীর পাঠক্রম অনুযায়ী লিখিত]

শ্রীসত্যেন লোধ, এম. এস্-সি, প্রধান অধ্যাপক
রসায়ন বিভাগ; এ. পি. সি. রায় পলিটেকনিক,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
General Chemistry, Chemistry for Engineers,
Chemistry for Beginners in Engineering,
প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

ও

ডাঃ লতিকা বসু, এম. এস্-সি, ডি. ফিল.
অধ্যাপিকা রামমোহন কলেজ।

ও

শ্রীসমীর চট্টোপাধ্যায়, বি. এস্-সি, বি এ.,
বিজ্ঞান শিক্ষক, জগদ্বন্ধু ইন্‌স্টিটিউশন, কলিকাতা

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
অঞ্জনা বিশ্বাস ও দীপালি মজুমদার
জি. সি. বোস এণ্ড কোং
৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৭৩

মূল্য : ৪ ২০

মুদ্রাকর :
শ্রীপরিমল বসু
বসুশ্রী প্রেস
৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির নবম শ্রেণীর নূতন পাঠক্রম অনুসারে লিখিত পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এই পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে এই পুস্তকখানি বিজ্ঞান শিক্ষার সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইলে কৃতার্থ হইব। আশা করি শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী পুস্তকখানির ভুলত্রুটি নির্দেশ করিয়া ও মূল্যবান উপদেশ দিয়া বাধিত করিবেন।

পাণ্ডুলিপি রচনায় অকুণ্ঠ সাহায্য করিয়াছে রীতা মুখোপাধ্যায় ও মুনমুন রায়। শ্রীরমনীরঞ্জন মণ্ডল ও ছাপাখানার অন্যান্য কর্মিদের সহযোগিতা ও অক্লান্ত চেষ্টাতেই এই পুস্তকখানির প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

ডিসেম্বর, ১৯৭৩

সত্যেন লোধ
লতিকা বসু
সমীর চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পদার্থ

প্রথম অধ্যায়

পরিমাপের পদ্ধতি

একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বলিয়াছিলেন,—তুমি যে জিনিসের কথা বলিতেছ, তাহা যদি মাপিতে পার, সংখ্যা দিয়া প্রকাশ করিতে পার, তাহা হইলে বোঝা যাইবে যে, সে সম্বন্ধে তোমার কিছু জ্ঞান আছে। কিন্তু তাহা যদি না পার, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান খুবই অল্প।

লোহাটি ভারি, খুব ভারি এই সব কথার কোন অর্থ হয় না। ইহাতে একজন যাহা বুঝিবে, অপর একজন ঠিক তাহা নাও মনে করিতে পারে, কিন্তু যদি বলা যায় ওই লোহাটির ওজন এত গ্রাম বা এত পাউণ্ড, তাহা হইলে ওই কথা যাহাকেই বলা হউক না কেন, প্রত্যেকেই ওই লোহার ওজন সম্বন্ধে একই রকম ভাবিবে।

কলিকাতা হইতে দিল্লী অনেক দূর বা রাজধানী এক্সপ্রেস খুব দ্রুত যায়—ইহাও বিজ্ঞানের কথা নয়। বিজ্ঞানের পরিমাপে বলিতে হইবে—রেলপথে কলিকাতা ও দিল্লীর মধ্যে দূরত্ব হইল ১৪০০ কিলোমিটার এবং ওই পথ অতিক্রম করিতে রাজধানী এক্সপ্রেসের সময় লাগে ১৭ ঘণ্টা।

এই ভাবে ছোট বড় সব কিছুরই পরিমাপ করিবার মূলে দেখি মাত্র তিনটি কথা, দৈর্ঘ্য, ওজন এবং সময়। বিজ্ঞানের ভাষায় ইহারাই হইল এক একটি রাশি।

প্রাকৃতিক রাশি (Physical Quantity): যাহা পরিমাপ করা যায় তাহাকে রাশি বলে। একটি ঘরের 'উচ্চতা' স্কেল, বা ফিতা দ্বারা পরিমাপ করা যায়। শরীরের 'ওজন' তুলাযন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়। পরীক্ষাঘরে ছেলেরা কত সময় ধরিয়া পরীক্ষা দিল সেই 'সময়' ঘড়ির সাহায্যে মাপা যায়। এই ক্ষেত্রে উচ্চতা, ওজন এবং সময় প্রত্যেকে এক একটি রাশি।

মাপের একক (Units of measurement): কোন রাশির সুবিধাজনক পরিমাণকে নির্দিষ্ট মান ধরিয়া একই প্রকার রাশির পরিমাপ করা হয়। এই নির্দিষ্ট মানকে একক বলা হয়। যেমন, একটি পেন্সিলের দৈর্ঘ্য 10

সেন্টিমিটার। এখানে একক হইল, 1 সেন্টিমিটার। 6 কিলোগ্রাম চিনি। এখানে একক হইল 1 কিলোগ্রাম। আবার ছেলেটি 5 ঘণ্টা সময় ধরিয়া পড়িয়াছে। এখানে একক হইল 1 ঘণ্টা।

একক যতবার রাশির মধ্যে থাকে তাহাই রাশির পরিমাপ। সুতরাং

রাশির পরিমাপ = সংখ্যা × একক

যেমন, একটি ঘরের দৈর্ঘ্য 500 সেন্টিমিটার। রেশন হইতে 5 কিলোগ্রাম চিনি আনা হইল। বাসে কলিকাতা হইতে দুর্গাপুর যাইতে 5 ঘণ্টা সময় লাগে। এই সকল ক্ষেত্রের প্রথম ক্ষেত্রে ঘরটির দৈর্ঘ্যের মধ্যে সেন্টিমিটার নামক একক 500 বার আছে। 500 সংখ্যা এবং সেন্টিমিটার একক। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, চিনির ওজনের মধ্যে কিলোগ্রাম নামক একক 5 বার আছে। এক্ষেত্রে 5 সংখ্যা এবং কিলোগ্রাম একক। তৃতীয় ক্ষেত্রে 5 ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ঘণ্টা নামক একক 5 বার আছে। সুতরাং 5 সংখ্যা এবং ঘণ্টা একক।

প্রত্যেক রাশির একটি একক আছে। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানে অসংখ্য রাশির উল্লেখ আছে। রাশি অসংখ্য হইলেও মাত্র তিনটি রাশির একক হইতে বিভিন্ন রাশির একক পাওয়া যায়। যেমন, গাড়িটির গতি ঘণ্টায় 30 কিলোমিটার। এখানে গতির পরিমাণ বুঝাইতে দুই জাতীয় এককের ব্যবহার করা হইয়াছে। সময়ের একক ঘণ্টা এবং দৈর্ঘ্যের একক কিলোমিটার।

আবার, একটি ঘরের দৈর্ঘ্য 4 মিটার এবং প্রস্থ 5 মিটার। সুতরাং ঘরটির ক্ষেত্রফল 40 বর্গমিটার। এখানে ক্ষেত্রফলের একক 1 বর্গমিটার, কিন্তু ইহার পরিমাপ দৈর্ঘ্যের একক মিটারের উপর নির্ভর করিয়া আছে। সুতরাং অধিকাংশ পরিমাপই তিনটি মাত্র এককের সাহায্যেই প্রকাশ করা হয়। এই তিনটি একক হইল দৈর্ঘ্য, ভর এবং সময়ের একক। এই কারণে এই তিনটি রাশির একককে প্রাথমিক একক বা মৌলিক একক বলা হয়। এই তিনটি রাশির একক হইতে আবার অন্য রাশির একক পাওয়া যায়। ইহাদের গঠিত বা লব্ধ একক (Derived unit) বলা হয়।

মৌলিক বা প্রাথমিক একক : যে তিনটি রাশির একক পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নহে এবং যে-তিনটি রাশির একক হইতে অন্যান্য রাশির একক গঠন করা যায়, তাহাদের মৌলিক বা প্রাথমিক একক বলে।

গঠিত বা লব্ধ একক : এক বা একের বেশি মৌলিক একক হইতে অন্যান্য যে সকল একক গঠন করা হয়, তাহাকে গঠিত বা লব্ধ একক বলে।

এই একক গড়িয়া উঠিবার পিছনে নানান কাহিনী আছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম হেনরীর খেয়াল অনুসারে নাকের ডগা হইতে আরম্ভ করিয়া হাতের বুড়া আঙ্গুল পর্যন্ত মাপিয়া যে দূরত্ব পাওয়া গেল, তাহারই নাম দেওয়া হইল দৈর্ঘ্যের একক 'গজ'। ইংরাজীতে যাহাকে বলা হইল 'ইয়ার্ড'। ইহার প্রায় একশ বৎসর পরে রানী এলিজাবেথের খুশিমত নতুন দৈর্ঘ্যের একক স্থির হইল। একটি নির্দিষ্ট রবিবারে গীর্জার উপাসনা শেষে যে লোকেরা বাহির হইয়া আসিবে তাহাদের মধ্যে ষোল জন লোককে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া যে দুরত্ব পাওয়া গেল তাহারই নাম দেওয়া হইল 'রড'। এই 'রডের' ষোল ভাগের এক ভাগকে নাম দেওয়া হইল 'ফুট'। আবার রোমদেশের লোকেরা দৈর্ঘ্য পরিমাপের বিষয়ে শস্য ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। তিনটি 'যব' পাশাপাশি রাখিলে যে দূরত্ব হয়, সেই দূরত্বকে 'ইঞ্চি' নাম দেওয়া হইল। 'একক' গড়িবার এইরূপ নানান ঘটনা আছে।

ইহা হইতে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, দৈর্ঘ্য মাপার একক স্থির করিবার বিষয় প্রাচীনকালের মানুষের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করিত।

কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতসহ পৃথিবীর সকল দেশ একটি চুক্তি করিয়া 'একক' এবং প্রাথমিক মান নির্বাচন বিষয়ক সকল ক্ষমতা 'ওজন ও মাপের আন্তর্জাতিক কমিটির' হাতে তুলিয়া দিয়াছে। ফলে বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই এই কমিটি নির্ধারিত 'একক' এবং প্রাথমিক মান প্রচলিত।

পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি : (Systems of measurement) মৌলিক এককে প্রকাশ করিবার কয়েকটি পদ্ধতি আছে।

1. সি. জি. এস (C. G. S) বা ফ্রেন্স বা মেট্রিক পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যকে সেন্টিমিটারে, ভরকে গ্রামে এবং সময়কে সেকেণ্ডে প্রকাশ করা হয়।

'সি' → সেন্টিমিটার → দৈর্ঘ্যের একক
'জি' → গ্রাম → ভরের একক
'এস্' → সেকেণ্ড → সময়ের একক

সেন্টিমিটার, গ্রাম, সেকেণ্ডকেই সংক্ষেপে সি. জি. এস বলা হয়।

উদাহরণ : একটি ছেলের উচ্চতা 150 সেন্টিমিটার, ওজন 50000 গ্রাম। ছেলেটি 120 সেকেণ্ড সময় ধরিয়া সাঁতার কাটিয়াছে। এখানে যে এককগুলির কথা বলা হইল, ইহা সি, জি, এস পদ্ধতির একটি প্রকাশ।

ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ভারতে সকল কার্য এই সি. জি. এস্ পদ্ধতির এককেই হইবে।

2. **এফ, পি, এস্ (F. P. S) বা মেট্রিক পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যকে ফুটে, ভরকে পাউণ্ডে এবং সময়কে সেকেণ্ডে প্রকাশ করা হয়।

এফ——→ফুট——→দ�ৈর্ঘ্যের একক

পি——→পাউণ্ড——→ভরের একক

এস্——→সেকেণ্ড→সময়ের একক

ফুট, পাউণ্ড, সেকেণ্ডকেই সংক্ষেপে এফ. পি এস. বলা হয়।

উদাহরণ : একজন লোকের উচ্চতা 5 ফুট, তাঁহার দেহের ওজন 80 পাউণ্ড। লোকটি 28800 সেকেণ্ড সময় ধরিয়া কারখানায় কাজ করে।

এখানে যে এককগুলির কথা বলা হইল, ইহা এফ. পি. এস পদ্ধতির একটি প্রকাশ। গ্রেট বৃটেনে এই পদ্ধতির ব্যবহার আছে।

3. **এম, কে, এস্ (M. K. S) পদ্ধতি :** সি. জি. এস এবং এফ. পি. এস এই প্রচলিত দুইটি পদ্ধতি ছাড়া এম. কে. এস পদ্ধতি বর্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে।

এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যকে মিটারে, ভরকে কিলোগ্রামে এবং সময়কে সেকেণ্ডে প্রকাশ করা হয়।

এম্ → মিটার→ দৈর্ঘ্যের একক

কে → কিলোগ্রাম → ভরের একক

এস্ → সেকেণ্ড → সময়ের একক

মিটার, কিলোগ্রাম এবং সেকেণ্ডকেই সংক্ষেপে এম, কে, এস বলা হয়।

উদাহরণ : একটি লোহার রডের দৈর্ঘ্য 2 মিটার। উহার ওজন 10 কিলোগ্রাম। রডটি রাস্তার পার্শ্বে 18000 সেকেণ্ড সময় ধরিয়া পড়িয়া আছে। এখানে যে এককগুলির উল্লেখ করা হইল ইহা এম. কে. এস পদ্ধতির একটি প্রকাশ। বর্তমানে আমেরিকায় এই পদ্ধতির বহুল ব্যবহার রহিয়াছে।

দৈর্ঘ্যের একক (Units of length) :

সেন্টিমিটার : প্যারী সহরের নিকটে সেভ্রেতে 'আন্তর্জাতিক বুরো অফ ওয়েট্‌স এ্যাণ্ড মেজারস' নামে একটি সংস্থার অফিস আছে। এই অফিসে সর্বদা 0° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সুরক্ষিত একটি প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম সংকর ধাতুর দণ্ডের

উপর দুইটি নির্দিষ্ট দাগের মধ্যবর্তী দূরত্বকে 'আন্তর্জাতিক মিটার' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই দূরত্বের একশত ভাগের এক ভাগকে সেন্টিমিটার বলা হইয়াছে।

দৈর্ঘ্যের একক এক সেন্টিমিটার এক মিটারের এক শতাংশ। মিটারের পূর্বে মিলি, সেন্টি, ডেসি, ডেকা, হেক্টো কিলো ইত্যাদি বসাইয়া এক মিটারের সহস্রাংশ, শতাংশ, দশমাংশ প্রভৃতি অণু-একক গঠন করা হয়। ইহাই সি, জি, এস পদ্ধতির একটি বিশেষ সুবিধা।

সি, জি, এস্ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের তালিকা :

10 মিলিমিটার (mm)	=1 সেন্টিমিটার (cm)
10 সেন্টিমিটার	=1 ডেসিমিটার
10 ডেসিমিটার	=1 মিটার (m)
10 মিটার	=1 ডেকামিটার
10 ডেকামিটার	=1 হেক্টোমিটার
10 হেক্টোমিটার	=1 কিলোমিটার (km)

ফুট (Foot) **:** ইংলণ্ডের 'বোর্ড অফ ট্রেড'এর মান নির্ণয় বিভাগে 62°F তাপমাত্রায় সুরক্ষিত একটি ব্রোঞ্জ দণ্ডের উপর দুইটি নির্দিষ্ট দাগের অন্তর্বর্তী দূরত্বকে 'গজ' বলে। এক গজের এক-তৃতীয়াংশ দৈর্ঘ্যকে এক ফুট বলা হয়। এক ফুট অপেক্ষা ছোট-বড় দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য ফুটের ভগ্নাংশ ও গুণিতাংশ ব্যবহৃত হয়।

এফ, পি, এস্ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের তালিকা :

12 ইঞ্চি = 1 ফুট	3 ফুট = 1 গজ
220 গজ = 1 ফার্লং	8 ফার্লং = 1 মাইল
1760 গজ = 1 মাইল	

সি, জি, এস্ এবং এফ, পি, এস পদ্ধতির দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পর্ক :

1 ইঞ্চি = 2·54 সেন্টিমিটার	1 ফুট = 30·48 সেন্টিমিটার
1 গজ = 91·44 সেন্টিমিটার	1 সেন্টিমিটার = 0·3937 ইঞ্চি
1 মিটার = 1·09363 গজ	1 মাইল = 1·6093 কিলোমিটার
1 কিলোমিটার = 0·6214 মাইল	

ভরের একক (Units of mass) : কোন পদার্থের বস্তু পরিমাণকে উহার ভর বলা হয়। তুলাযন্ত্রের সাহায্যে এই ভর পরিমাপ করা হয়।

গ্রাম : প্যারিসে 'আন্তর্জাতিক বুরো অফ ওয়েটস অ্যাণ্ড মেজারর্স' অফিসে সুরক্ষিত প্লাটিনাম ইরিডিয়াম সংকর ধাতুর তৈয়ারী একটি নিরেট চোঙের ভরকে আন্তর্জাতিক 'কিলোগ্রাম' বলা হয়। কিলোগ্রামের একহাজার ভাগের এক ভাগকে 'গ্রাম' বলে। এই চোঙের ভর 4°C তাপমাত্রায় 1000 ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের বিশুদ্ধ জলের সমান। ইহার জন্য 4°C তাপমাত্রায় এক ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ জলের ভরকে এক 'গ্রাম' বলা হয়।

সি, জি, এস্ পদ্ধতিতে ভরের তালিকা :

10 মিলিগ্রাম = 1 সেন্টিগ্রাম	10 সেন্টিগ্রাম = 1 ডেসিগ্রাম
10 ডেসিগ্রাম = 1 গ্রাম (gm)	10 গ্রাম = 1 ডেকাগ্রাম
10 হেক্টাগ্রাম = 1 কুইন্টাল	

পাউণ্ড : ইংলণ্ডের 'বোর্ড অফ ট্রেডের' মান নির্ণয় বিভাগে সুরক্ষিত একটি প্লাটিনামের নিরেট চোঙের ভরকে 'পাউণ্ড' বলে।

ভর পরিমাপের জন্য— পাউণ্ডের ভগ্নাংশ ও গুণিতাংশ ব্যবহৃত হয়।

এফ, পি, এস, পদ্ধতিতে ভরের একক তালিকা :

16 ড্রাম = 1 আউন্স	16 আউন্স = 1 পাউণ্ড
28 পাউণ্ড = 1 কোয়ার্টার	4 কোয়ার্টার = 1 হন্দর
20 হন্দর = 1 টন	1 টন = 2240 পাউণ্ড

সি. জি. এস. এবং এফ. পি. এস্. পদ্ধতির ভরের বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পর্ক :

1 পাউণ্ড = 7,000 গ্রেণ	1 পাউণ্ড = 453·6 গ্রাম
1 কিলোগ্রাম = 2·205 পাউণ্ড	1 গ্রাম = 15·43 গ্রেণ
1 গ্রেণ = 64 8 মিলিগ্রাম	1 আউন্স = 28·35 গ্রাম।

সময়ের একক (units of time) :

পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে আপাত পরিক্রমার সময়কে ভিত্তি করিয়া সময়ের একক স্থির করা হইয়াছে। যে কোনও স্থানে সূর্য একবার মধ্যরেখা অতিক্রম করিবার পর আরেকবার অতিক্রম করা পর্যন্ত সময়কে বলা হয় সৌরদিন বা

দিন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সৌরদিনের পরিমাণ বৎসরের সকল সময় সমান নয়। এক বৎসরে ৩৬৫ দিনের গড় পরিমাণকে এক গড় সৌরদিন বলা হয়। এক গড় সৌরদিনের 24 ভাগের এক ভাগকে বলা হয় ঘণ্টা। 1 ঘণ্টার 60 ভাগের এক ভাগ হইল মিনিট এবং 1 মিনিটের 60 ভাগের এক ভাগ হইল সেকেণ্ড।

সি, জি, এস এবং এফ, পি, এস উভয় পদ্ধতিতে সময়ের একক এক অর্থাৎ এক সেকেণ্ড।

সময়ের একক তালিকা :

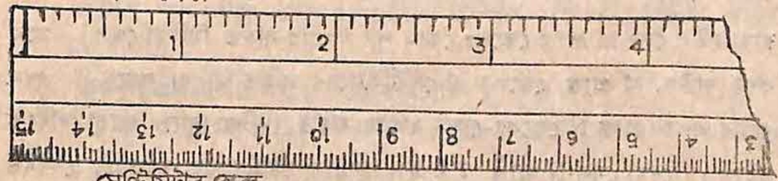
1 গড় সৌরদিন = 24 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা = 60 মিনিট

1 মিনিট = 60 সেকেণ্ড

পরিমাপের যন্ত্র (Measuring devices)

দৈর্ঘ্য মাপার যন্ত্র :

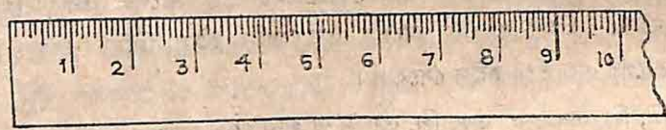
দৈর্ঘ্য পরিমাপের সহজ যন্ত্র হইল সাধারণ সরল স্কেল।



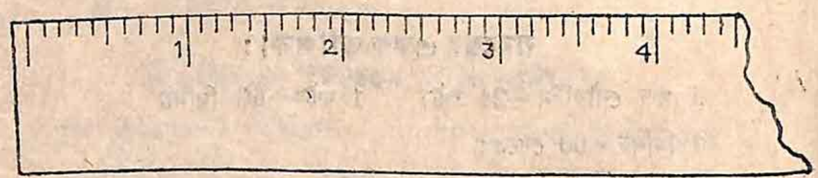
চিত্র ১

বর্ণনা : সাধারণ সরল স্কেল পাতলা কাঠ, ইস্পাতের পাত বা প্লাস্টিকের পাত দ্বারা তৈয়ারী হয়। সাধারণ কাঠের স্কেল 100 সেন্টিমিটার লম্বা এবং আড়াই হইতে চার সেন্টিমিটার চওড়া হইয়া থাকে। ইহার একদিকে সেন্টি-মিটারের দাগ থাকে এবং অপরদিকে ইঞ্চির দাগ (চিত্র ১) থাকে। প্রত্যেক সেন্টিমিটারকে দশভাগে ভাগ করিয়া মিলিমিটার দাগ কাটা হয়। এক ইঞ্চিকে 10 ভাগে ভাগ করিয়া দাগ কাটা হয়। যে স্কেল শুধু সেন্টিমিটার ও মিলিমিটারে দাগ কাটা থাকে, তাহাকে মিটার স্কেল বলা হয় (চিত্র ২)। আবার যে স্কেল শুধু ইঞ্চি এবং ইঞ্চির দশমাংশে দাগ কাটা থাকে তাহাকে ফুট রুল বলা (চিত্র৩) হয়

ব্যবহার : মনে করা যাউক MN একটি রড। স্কেলের সাহায্যে ইহার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করিতে হইবে।



চিত্র ২—মিটার স্কেল



চিত্র ৩—ফুট স্কেল

প্রথমে MN রডটিকে স্কেলের অংশাঙ্কনের পাশে লম্বালম্বিভাবে এমন ভাবে

M————————————N

রড

রাখা হইল যেন M প্রান্ত স্কেলের কোন পূর্ণ সংখ্যার সহিত মিলিয়া গেল। মনে করা যাউক, M প্রান্ত স্কেলের 2 সেন্টিমিটারের সহিত মিলিয়া আছে। এখন রডের অপর প্রান্ত N স্কেলের কোন দাগের সহিত মিলিয়া আছে তাহা দেখিতে হইবে। দেখা গেল N প্রান্ত 7·1 এবং 7·2 সেন্টিমিটারের মধ্যবর্তী কোনও দাগের সহিত মিলিয়া আছে। এ ক্ষেত্রে N প্রান্তের পাঠ চোখের আন্দাজের সাহায্যে 1 মিলিমিটারকে দশভাগে ভাগ করিয়া দেখিতে হইবে। ঐ ভাবে দেখিয়া N প্রান্তের পাঠ দেখা গেল 7·15 সে. মি।

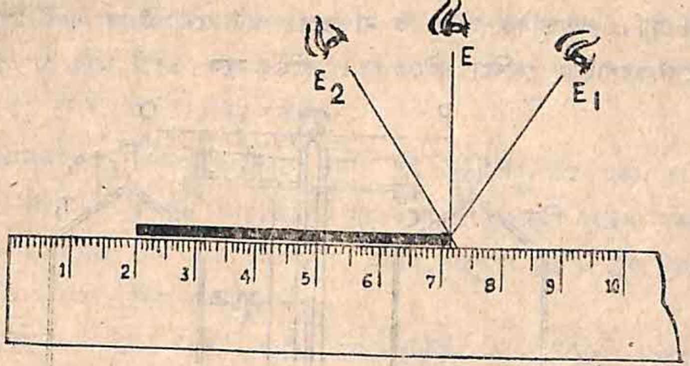
এখন MN রডটির দৈর্ঘ্য = N প্রান্তের পাঠ − M প্রান্তের পাঠ

$$7{\cdot}15 - 2 = 5{\cdot}15 \text{ সে. মি।}$$

এইভাবে MN রডটির M প্রান্ত স্কেলের বিভিন্ন পূর্ণসংখ্যার সহিত মিলাইয়া রাখিয়া কয়েকবার পাঠ লইয়া উহার গড় বাহির করিলে MN রডের দৈর্ঘ্য পাওয়া যাইবে।

রডের N প্রান্ত স্কেলের যে দাগের সহিত মিলিয়া আছে তাহা দেখিবার সময় চোখের দৃষ্টিরেখা রডটির প্রান্ত বরাবর স্কেলের দাগের সহিত লম্বভাবে

রাখিতে হইবে, নতুবা পাঠ লইতে ভুল হইবে এবং চোখের বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন পাঠ হইবে। E_1 স্থানে চোখ রাখিয়া যদি পাঠ নেওয়া যায় তাহা হইলে



চিত্র ৪

পাঠ হইবে 7·0 সে.মি। আবার E_2 স্থানে চোখ রাখিয়া পাঠ লইলে পাঠ হইবে 7·3 সে.মি।

কিন্তু E স্থানে চোখ রাখিয়া লম্বভাবে দেখিলে সঠিক পাঠ 7·1 এবং 7·2 এর মধ্যবর্তী স্থানে হইবে। চোখের অবস্থানের জন্য এইরূপ ভুল হওয়াকে প্যারালাক্স ঘটিত বা লম্ব জনিত ভুল বলা হয়।

এইরূপ ভাবে ইঞ্চি স্কেলের সাহায্যে মাপিলে MN রডের দৈর্ঘ্য ইঞ্চিতে পাওয়া যাইবে।

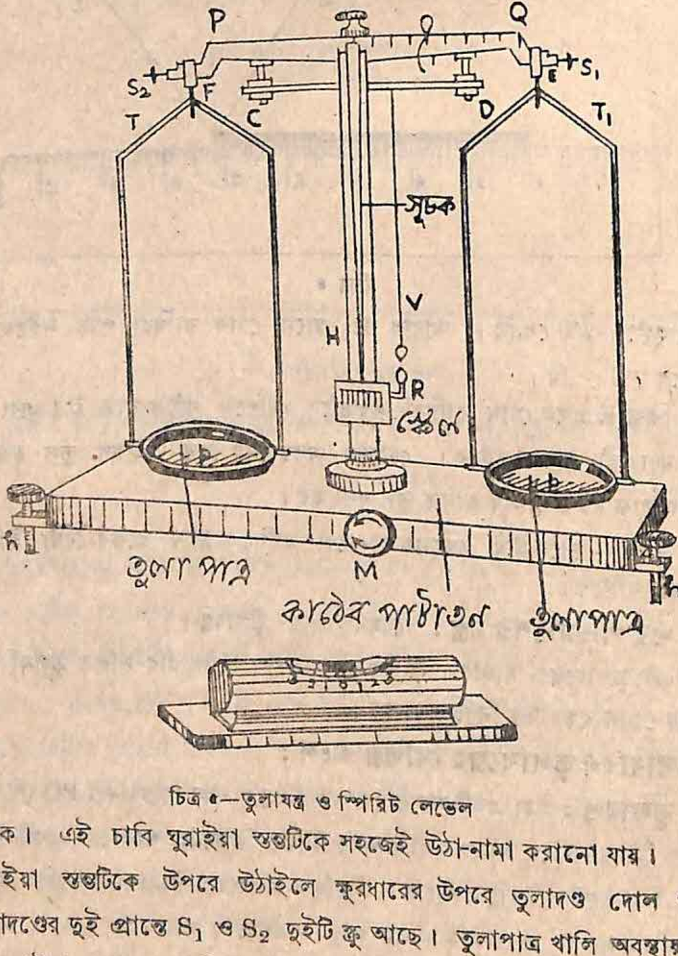
ভর পরিমাপের যন্ত্র : যেমন সাধারণ তুলাযন্ত্র।

এই তুলাযন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি প্রমাণ বাটখারার সহিত তুলনা মূলক ভাবে কোন বস্তুর ভর নির্ণয় করা হয়।

সাধারণ তুলাযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ :

তুলাদণ্ড : ইহা একটি অনুভূমিক শক্ত কিন্তু হাল্কা ধাতব দণ্ড PQ (চিত্র৫)। ইহার ঠিক মাঝখানে অ্যাগেট বা ইস্পাত নির্মিত প্রিজমের আকারের একটি টুকরা (K) শক্তভাবে আটকানো থাকে। ইহার একদিক চ্যাপ্টা এবং অপরদিক ক্ষুরের ফলার মত সরু। ক্ষুরধারকে আলম্ব বলে। প্রিজমের আকারের আসনের চ্যাপ্টা দিকটির উপর দণ্ডের মধ্য-বিন্দু বসিয়া থাকে। সরু দিকটি একটি সমতল অ্যাগেট বা ইস্পাত নির্মিত পাতের (N) উপর বসানো থাকে। ঘর্ষণজনিত বাধা অতিক্রম করিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। পাতটি একটি খাড়া ফাঁপা H চোঙের মধ্যে ঢোকানো একটি D স্তম্ভের উপর অবস্থিত। চোঙটি একটি কাঠের পাটাতনের উপর উল্লম্বভাবে বসানো থাকে। এই কাঠের পাটাতন

তিনটি স্ক্রুর উপর থাকে। সামনের দিকে দুই প্রান্তে থাকে দুইটি (b, h) এবং পিছনের দিকে মধ্যস্থলে থাকে একটি স্ক্রুর সাহায্যে পাটাতনকে অনুভূমিক করা হয়। অনুভূমিক হইল কি না তাহা পাটাতনের উপর একটি স্পিরিট লেভেল বসাইয়া দেখিয়া লইতে হয়। দণ্ডের সঙ্গে একটি চাবি M সংযুক্ত



চিত্র ৫—তুলাযন্ত্র ও স্পিরিট লেভেল

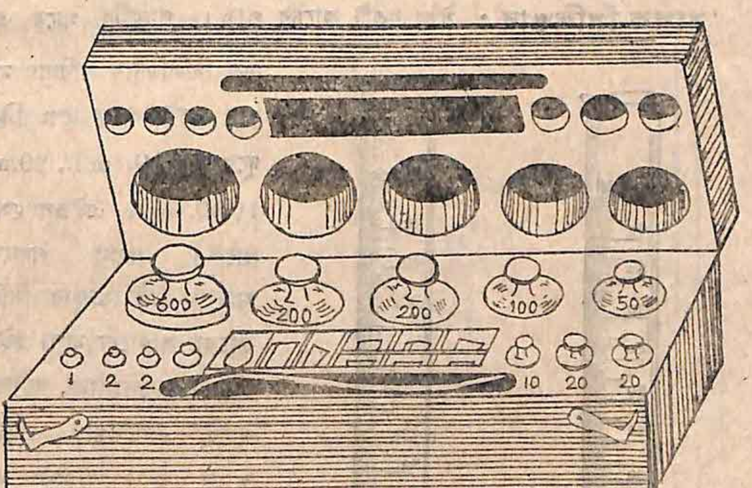
থাকে। এই চাবি ঘুরাইয়া স্তম্ভটিকে সহজেই উঠা-নামা করানো যায়। চাবি ঘুরাইয়া স্তম্ভটিকে উপরে উঠাইলে ক্ষুরধারের উপরে তুলাদণ্ড দোল খায়। তুলাদণ্ডের দুই প্রান্তে S_1 ও S_2 দুইটি স্ক্রু আছে। তুলাপাত্র খালি অবস্থায় এই স্ক্রু ঘুরাইয়া দণ্ডকে অনুভূমিক করা হয়।

তুলাপাত্র : তুলাদণ্ডের দুই প্রান্তে দুইটি খাজের মধ্যে প্রিজম আকৃতির ক্ষুরধারের উপর ষ্টীরাপ E এবং F আছে। এই স্টীরাপ হইতে বাঁকানো হুকের সাহায্যে দুইটি সমান ওজনের তুলাপাত্র (p p) ঝুলানো থাকে। বামদিকের পাত্রে পরিমেয় বস্তু এবং ডানদিকের পাত্রে প্রমাণ বাটখারা রাখিতে হয়।

সূচক : ইহা একটি সরু কাঁটা। উপরদিকে তুলাদণ্ডের ঠিক মাঝখানে ইহা আটকানো থাকে। সূচকের নিম্নপ্রান্ত তীক্ষ্ণ। উহা একটি স্কেলের গা বরাবর বামদিকে বা ডানদিকে চলিতে পারে। দুই তুলাপাত্রে সমান ভর থাকিলে এবং তুলাদণ্ড দোল খাইলে সূচক স্কেলের O দাগে স্থির থাকিবে, নতুবা O দাগের দুই পার্শ্বে সমান ঘর পর্যন্ত যাইবে।

ওলনদড়ি : অবলম্বন D হইতে ঝুলানো V ওলনদড়ির সূক্ষ্ম প্রান্ত যখন থামের সহিত সংলগ্ন শঙ্কু আকৃতির R ধাতব খণ্ডের মুখোমুখি আসে তখন বোঝা যায় যে স্তম্ভ ঠিক উল্লম্ব হইয়াছে। ইহার সাহায্যে স্তম্ভ H ঠিক উল্লম্ব আছে কিনা তাহা দেখিয়া লওয়া হয়।

ওজনের বাক্স : একটি কাঠের বাক্সে বিভিন্ন খাপে বিভিন্ন ওজনের বাটখারা সাজানো থাকে। চিমটা দিয়া বাটখারাগুলি তুলিতে হয়।



চিত্র ৬—বাটখারা সমেত ওজনের বাক্স

তুলাযন্ত্রের ব্যবহার : (i) নীচের চাবি ঘুরাইয়া স্তম্ভটিকে উঠাইতে হইবে। যন্ত্রের ব্যবস্থা ঠিক থাকিলে সূচক স্কেলের O দাগের দুই দিকে সমানভাবে দুলিবে নতুবা O দাগে স্থির থাকিবে। এইরূপ না হইলে S_1 S_2 স্ক্রু ঘুরাইয়া তুলাদণ্ডকে অনুভূমিক করিয়া লইতে হইবে।

(ii) এখন বামদিকের তুলা পাত্রে পরিমেয় বস্তু রাখিয়া ডান দিকের

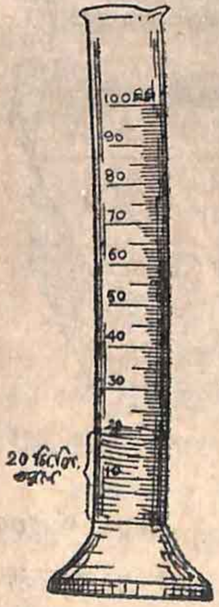
তুলাপাত্রে আন্দাজমত পর পর বাটখারা বসাইয়া তুলাদণ্ডকে অনুভূমিক করিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে সূচক 12 p দাগের দুইদিকে সমান ঘর পর্যন্ত দোলে কিনা। এইরূপ হইলে ডানদিকের তুলাপাত্রের বাটখারাগুলি যোগ করিতে হইবে এবং বাটখারাগুলির ঐ যোগফলই হইবে নির্ণেয় বস্তুর ভর।

ভাল তুলাযন্ত্রের গুণ : ভাল তুলাযন্ত্রের নিম্নোক্ত গুণগুলি থাকা প্রয়োজন :

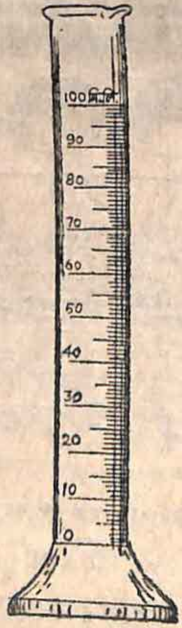
(i) তুলা সুবেদী হইবে। এই অবস্থায় দুই তুলাপাত্রে রাখা ভরগুলির মধ্যে সামান্য পার্থক্য হইলে তুলা দণ্ড একদিকে ঝুঁকিবে অর্থাৎ অনুভূমিক হইবে না। (ii) তুলা-নির্ভুল হইবে। এই অবস্থায় দুই তুলাপাত্রে সমানভরের বস্তু রাখিলে তুলাদণ্ড অনুভূমিক হইবে। (iii) তুলা যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ মজবুত হইবে। (iv) তুলা সুস্থিত হইবে। এই অবস্থায় সূচক একবার আন্দোলিত হইলে পুনরায় সাম্য অবস্থানে শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।

তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের যন্ত্র :

মাপক সিলিণ্ডার : ইহা একটি কাচের পাত্র। পাত্রটির গায়ে এক এক মিলিমিটার পরিমাণ মত দাগ কাটা থাকে এবং কিছু দূরে দূরে 10. m.l., 20.m. l., 30. m l. এইরূপ লেখা থাকে। তরল পদার্থের আয়তন এই প্রকার সিলিণ্ডারের সাহায্যে মাপা হইয়া থাকে। ডাক্তারখানা, পরীক্ষাগারে, রসায়নগার প্রভৃতি স্থানে ইহা ব্যবহৃত হয় (চিত্র ৮)।



চিত্র ৭
তরল সমেত মাপক সিলিণ্ডার



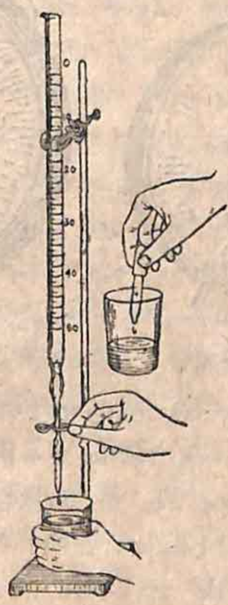
চিত্র ৮

ব্যবহার : মনে করা যাউক ২০ মিলিমিটার কোন তরল পদার্থ মাপিতে হইবে। একটি বীকারে তরল লইয়া উহা বীকার হইতে মাপক সিলিণ্ডারে ধীরে ধীরে ঢালিতে হইবে এবং তরলের লেভেল লক্ষ্য করিতে হইবে।

যতক্ষণ না তরলের লেভেল ঠিক 20 m.l দাগ স্পর্শ করে ততক্ষণ তরল ঢালিতে হইবে। তরলের লেভেল 20 m.l দাগ স্পর্শ করিলেই বুঝিতে হইবে, মাপক সিলিণ্ডারে তরলের পরিমাপ 20 m.l হইয়াছে। যে কোন আকৃতিবিশিষ্ট অদ্রাব্য কঠিন পদার্থের আয়তন আর্কিমিডিসের সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া মাপক সিলিণ্ডার ও জলের সাহায্যে পরিমাপ করা যায় (চিত্র ৭)।

বুরেট : ইহা একটি কাঁচের লম্বা নল, ক্লাম্পের সাহায্যে ইহাকে উল্লম্ব ভাবে দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। ইহার উপর দিক খোলা এবং নীচের দিক সূচালো। সূচালো মুখের একটু উপরে একটি স্টপকক্ আছে। স্টপকক্ ঘুরাইয়া নলের মুখ খোলা বা বন্ধ করা যায়। ইহার গায়ে মাপক সিলিণ্ডারের মত সমান দূরে দূরে উপর হইতে নীচের দীকে 10 m.l, 20 m.l, 30 m.l ইত্যাদি দাগ কাটা আছে। ইহার সাহায্যে ইচ্ছামত তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ করা যায়।

ব্যবহার : স্টপকক্ বন্ধ করিয়া খোলা মুখে তরল পদার্থ ঢালা হয়! স্টপ কক্ অল্প খুলিলে ধীরে ধীরে নীচের সরু মুখ দিয়া তরল পদার্থ নীচে রাখা পাত্রে পড়িবে, যেমন কালি ভরার ড্রপার হইতে পড়ে। বুরেটে তরল পদার্থের লেভেল দেখিয়া কি পরিমাণ তরল পাত্রে সংগ্রহ করা হইল তাহা পরিমাপ করা যাইবে (চিত্র ৯)।



চিত্র ৯

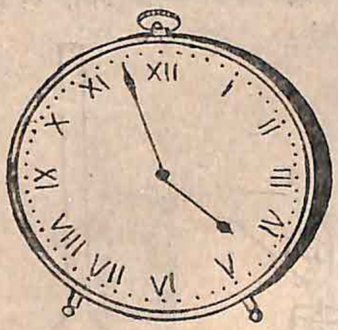


চিত্র ১০

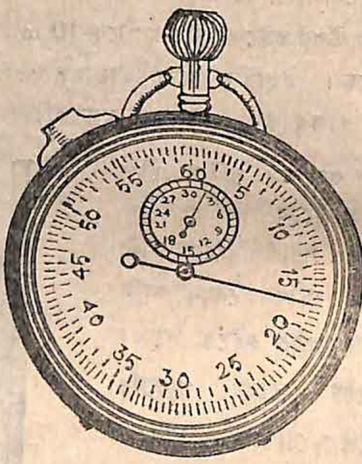
পিপেট : ইহা কাঁচের তৈরী একটি নল। ইহার মাঝখানটা মোটা এবং দুইদিক সরু। ইহার নীচের দিক সূচালো। উপরের দিকে নলের গায়ে একটিমাত্র দাগ কাটা আছে। পিপেটের গায়ে ঐ দাগ পর্যন্ত তরল পদার্থের আয়তন পূর্বেই লেখা থাকে। যেমন 20 m.l,25 m.l ইত্যাদি (চিত্র ১০)।

ব্যবহার : ইহার সূচালো মুখ তরল পদার্থের মধ্যে রাখিয়া উপরের মুখে মুখ দিয়া সাবধানে টানিলে তরল পদার্থ নলের মধ্যে উঠিয়া প্রায় মুখ পর্যন্ত আসিবে। এই বার বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা উপরের মুখ বন্ধ করিয়া ধরিলে তরল পদার্থ সূচালো মুখ দিয়া আর বাহির হইবে না। বৃদ্ধাঙ্গুল অল্প অল্প সরাইয়া প্রয়োজন মত তরল পদার্থ বাহির করিয়া দিয়া তরল পদার্থের লেভেল পিপেটের দাগ পর্যন্ত আনিতে হইবে। তরল পদার্থের লেভেল দাগ পর্যন্ত আসিলে বুঝিতে হইবে, পিপেটের মধ্যের তরল পদার্থের পরিমাপ পিপেটের গায়ে লেখা পরিমাণের সমান।

সময় পরিমাপের যন্ত্র : সময় পরিমাণের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা



চিত্র ১১—টেবিল ঘড়ি



চিত্র ১২

হয় তাহার নাম **ঘড়ি**। ঘড়ি নানা রকমের হয়। যেমন, দোলক ঘড়ি, টেবিল ঘড়ি (চিত্র ১১), হাত ঘড়ি, ক্রনোমিটার বা নির্ভুল সময় নির্দেশক ঘড়ি, স্টপক্লক বা স্টপ ওয়াচ, খুব সূক্ষ্ম সময় যথা 5 সেকেণ্ড দেখিবার জন্য স্টপ ওয়াচ বা স্টপ ক্লক ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্টপ ওয়াচ দ্বারা সেকেণ্ডের 5 ভাগের এক ভাগ, 10 ভাগের এক ভাগ সময়ও পরিমাপ করা যায়।

স্টপ ওয়াচের চাবি (চিত্র ১২) প্রথমবার টিপিলে ঘড়ি চালু হয় এবং দ্বিতীয়বার টিপিলে ঘড়ি বন্ধ হয়।

পরীক্ষাগারে, খেলাধূলার ক্ষেত্রে, দৌড় প্রতিযোগিতার সময় এই ঘড়ি ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদার্থ ও শক্তি

পদার্থ:

সপ্তদশ শতাব্দীতে আইরিশ বিজ্ঞানী **রবার্ট বয়েল** পদার্থ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলেন,—যে কোন বস্তুর যাহার অস্তিত্ব আছে তাহাই পদার্থ। বয়েলের ধারণাই আমাদের বর্তমানের পদার্থ সম্বন্ধে ধারণা। পদার্থের কতকগুলি সাধারণ গুণ বা ধর্মের সাহায্যে আমরা বস্তুর অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। পদার্থ মাত্রেরই এই সাধারণ গুণ বা ধর্ম থাকে। প্রথমতঃ, পদার্থ স্থান অধিকার করিবে। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত পদার্থের কিছু না কিছু ওজন থাকিবে। তৃতীয়তঃ, চাপের সাহায্যে যে কোন প্রকার পদার্থের ভিতর গতিবেগ সঞ্চারণ করিতে সক্ষম। যেমন, একটি টেবিল ঘরের কিছু স্থান অধিকার করিয়া থাকে, টেবিলটিকে তুলিতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, কারণ টেবিলটির ওজন আছে। উপরন্তু টেবিলটি নিশ্চল অবস্থায় আছে, কিন্তু একদিক হইতে উহাতে যথেষ্ট চাপ দিলে উহা অপরদিকে সরিয়া যাইবে, ফলে উহাতে গতিবেগ সঞ্চারিত হইবে। প্রত্যেক পদার্থেরই এই তিনটি ধর্ম থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আরও বলা যায়, প্রচণ্ড গরম পড়িয়াছে। বাতাস স্থির হইয়া আছে। মেঘের গর্জন শোনা যাইতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে এবং তাহার সঙ্গে শিলা পড়িতেছে।

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গরম, মেঘের গর্জন, বিদ্যুৎ চমকানো ইত্যাদি উপলব্ধি করিলেও ইহাদের কোন ওজন নাই এবং ইহারা কোনও স্থান অধিকার করিয়া নাই। সুতরাং ইহারা পদার্থ নহে, শক্তি বিশেষ। কিন্তু বাতাস, বৃষ্টি, শিলা ইত্যাদির ওজন আছে এবং ইহারা কিছু না কিছু স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইহাদের পরিচয়ও পাওয়া যায়। অতএব ইহারা প্রত্যেকে এক একটি পদার্থ। অতএব পদার্থের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলা যায়,— **ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ওজনবিশিষ্ট, স্থানব্যাপী ও চাপ-শক্তির প্রভাবে গতিশীল বস্তুই পদার্থ।**

পদার্থের সাধারণ ধর্ম (General properties of matter):

পদার্থ কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, উহাদের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে। যেমন—

(1) ভর (**Mass**): প্রত্যেক পদার্থে যে পরিমাণ জড় আছে তাহাকে পদার্থের ভর বলে। পদার্থ মাত্রেই ভর থাকিবে।

(2) ঘনত্ব: (**Density**): কোন বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ পদার্থ থাকে তাহাকে উহার ভর এবং উহা যে স্থান অধিকার করিয়া থাকে তাহাকে উহার আয়তন বলা হয়। যে অবস্থাতেই বস্তু থাকুক না কেন, উহার প্রতি একক আয়তনের একটি নির্দিষ্ট ভর থাকে। প্রতি একক আয়তনের ভরকে বস্তুর ঘনত্ব বলে। প্রত্যেক পদার্থেই এই ধর্ম রহিয়াছে।

(3) মহাকর্ষ (**Gravitation**): সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে আকর্ষণের ফলেই পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমা করে। পৃথিবীর আকর্ষণের ফলেই পাকা ফল গাছ হইতে মাটিতে পড়ে। সমুদ্র ও চন্দ্রের পারস্পরিক আকর্ষণের ফলেই জোয়ার-ভাঁটা হয়। এই সব কিছুই মহাকর্ষের উদাহরণ।

(4) বিভাজ্যতা (**Divisibility**): পদার্থকে উহার ধর্ম বজায় রাখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় ভাগ করা যায়। ইহাকে পদার্থের বিভাজ্যতা বলে। হাতুড়ি মারিয়া, কাটিয়া, ঘষিয়া, পিষিয়া এইরূপ নানা উপায়ে পদার্থকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করা যায়।

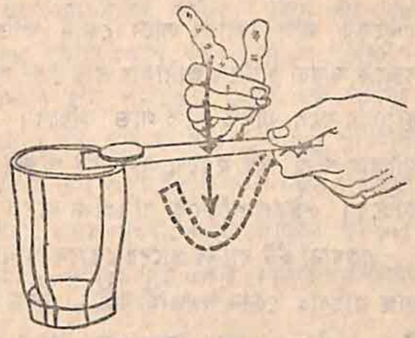
(5) অভেদ্যতা (**Impenetrability**): দুইটি পৃথক পদার্থ একই সময়ে একই স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। ইহাকে পদার্থের অভেদ্যতা বলে। কানায় কানায় পূর্ণ একগ্লাস জলের মধ্যে একটি চামচ ডুবাইলে চামচটি নিজ আয়তন জল অপসারিত করিয়া আপন স্থান অধিকার করিয়া লয়।

(6) স্থিতিস্থাপকতা (**Elasticity**): বাহির হইতে বলপ্রয়োগের দ্বারা কোন পদার্থের আকার বা আয়তনের পরিবর্তন করিতে গেলে,পদার্থের আভ্যন্তরীণ যে ধর্ম ঐ প্রযুক্ত বলকে বাধা দেয় তাহাকে পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা বলে। বলপ্রয়োগের দ্বারা কোন পদার্থের আকার এবং আয়তনের যে পরিবর্তন ঘটে তাহা যদি নির্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া না যায়, তবে পদার্থের স্থিতিস্থাপকতার গুণে প্রযুক্ত বল অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থ পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়া আসে। যেমন রবার, স্প্রীং—ইহাদের টানিয়া ছাড়িয়া দিলে ইহারা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

(7) জাড্য (**Inertia**): কোন পদার্থ আপনা হইতে উহার স্থির অবস্থা বা চলমান অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারে না। বাহির হইতে বল প্রয়োগ ছাড়া এই অবস্থার পরিবর্তন হয় না। পদার্থ যদি স্থির থাকে তাহা

হইলে উহা চিরকাল স্থিরই থাকিবে। আবার যদি পদার্থ গতিশীল হয়, তাহা হইলে উহা চিরকাল গতিশীল থাকিবে। পদার্থের এই ধর্মকে জাড্য বলে। একটি পরীক্ষা দ্বারা পদার্থের জাড্য ধর্ম লক্ষ্য করা যায়।

একটি গ্লাসের উপর একখানা কার্ড বোর্ডের টুকরা বসানো হইল। কার্ড বোর্ডের উপর একটি আধুলি রাখা হইল। আঙ্গুলের দ্বারা জোরে কার্ড বোর্ডটিকে ঘা দিলে কার্ড বোর্ডটি ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া যাইবে কিন্তু আধুলিটি গ্লাসের মধ্যে পড়িবে। কারণ জোর আঘাতে কার্ড বোর্ডটি গতিযুক্ত হইল কিন্তু আধুলিটি সেই গতি পাইবার আগেই নীচে গ্লাসের মধ্যে পড়িল (চিত্র ১১)।



চিত্র ১১

শক্তি (Energy) : এই বিশ্বে সর্বত্র শক্তি ছড়াইয়া আছে। কিন্তু পদার্থের উপর শক্তি কার্য না করিলে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার অস্তিত্বকে বুঝিতে পারা যায় না। পদার্থের উপর শক্তির ক্রিয়াকে কার্য বলা হয়। শক্তি হইল কারণ এবং কার্য হইল উহার ক্রিয়ার ফল। শক্তি ব্যয় না করিয়া কোন কার্য করা যায় না। কোন বস্তুর শক্তি বলিতে উহার দ্বারা সম্ভব মোট কার্যের পরিমাণকে বোঝায়। শক্তির ওজন নাই বা কোন স্থান অধিকার করে না। কিন্তু শক্তির অন্য ধর্ম রহিয়াছে। শক্তি পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। যেমন জলকে উত্তপ্ত করিলে উহা জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। অর্থাৎ তাপ জলের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। অতএব তাপ একপ্রকার শক্তি। একটি কাঁচ দণ্ডকে রেশমের কাপড় দ্বারা ঘর্ষণ করিলে উহা কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করে। ঘর্ষণে কাঁচদণ্ডে তড়িতের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ কাঁচ-দণ্ডের ভিতর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

শক্তির আর একটি ধর্ম হইল উহা পদার্থের উপর কার্য করিতে পারে। জলে তাপ দিলে উহা জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়, অর্থাৎ জলের অনুগুলির গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। অণুর গতিশক্তি বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালায়। বিদ্যুৎ শক্তি পাখা, মোটর ট্রাম, ট্রেন চালায়; বিজলী বাতির মাধ্যমে আলোর সৃষ্টি করে, বৈদ্যুতিক

ঘণ্টার সাহায্যে শব্দ সৃষ্টি করে, ক্রেনের কাঁচা লোহাকে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চুম্বকে পরিণত করিয়া উহার সাহায্যে ভারী জিনিষ তোলে। শক্তি ব্যয় করিয়া এইরূপ নানান কার্য করা হয়।

শক্তি প্রধানত দুই রকমের—**গতিশক্তি এবং স্থিতিশক্তি**। একটি বন্দুকের গুলি সাধারণ ভাবে কোন ক্ষতি করিতে পারে না, কিন্তু উহাকে বন্দুকে ভরিয়া ছুঁড়িলে জানালার কাঁচ ভেদ করিয়া ছুটিয়া যাইবে। এক্ষেত্রে বন্দুক ছুড়িবার ফলে গুলিটি গতি লাভ করিবে। এই গতির জন্যই গুলির মধ্যে কাজ করিবার শক্তি সৃষ্টি হইবে, এবং সেই শক্তিই কাঁচকে ভেদ করিবার কার্য সম্পন্ন করিবে। এইরূপ শক্তিকে গতিশক্তি বলে।

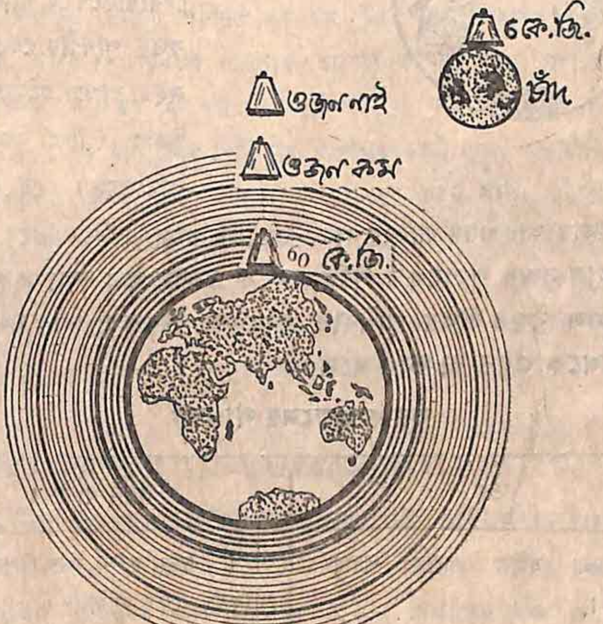
একখানা ইট বাড়ির ছাদের কোনে অনেকদিন ধরিয়া পড়িয়া আছে। উহার কাজ করিবার কোন ক্ষমতাই নাই। কিন্তু ইটখানা যদি কোনক্রমে ছাদ হইতে নীচে কাহারো মাথার উপর পড়ে, তাহা হইলে লোকটির মাথা ফাটিয়া যাইতে পারে। ইটখানা এই শক্তি পাইয়াছে স্থিতিশক্তির জন্য। ইটখানা ছিল মাটিতে, উহাকে কেউ ছাদের উপর তুলিয়াছে বলিয়া উহার মধ্যে কাজ করিবার ক্ষমতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাকেই স্থিতিশক্তি বলা হয়।

কোন বস্তুর কার্য করিবার ক্ষমতাকে শক্তি বলে। গতিশীল বস্তু গতির জন্য যে শক্তি লাভ করে তাহাকে গতিশক্তি বলে। বস্তুকে উহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পরিবর্তন করিয়া অন্য অবস্থায় আনিলে উহা কিছু শক্তি সঞ্চয় করে। বস্তুর স্থিতির জন্য এই যে শক্তি সঞ্চিত হয়, তাহাকে স্থিতিশক্তি বলে।

ভর ও ওজন বা ভার (Mass and Weight): একখানা বই হাতের উপর রাখিলে নীচের দিকে একটি বল অনুভব হইবে। একখানা বইয়ের জায়গায় যদি দশখানা মোটা বই রাখা যায়, তাহা হইলে হাতের উপর বই-গুলিকে আর রাখা সম্ভব হয় না। ইহার কারণ হইল প্রত্যেক বস্তুকে পৃথিবী উহার কেন্দ্রের দিকে সর্বদা আকর্ষণ করিতেছে। অর্থাৎ এই বল অভিকর্ষ বল। বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে পৃথিবীর আকর্ষণ বল ও বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে একখানা বইয়ের জায়গায় দশখানা বই রাখার ফলে পৃথিবীর আকর্ষণ বল বৃদ্ধি হইল, ফলে হাতের উপর বইগুলি রাখা সম্ভব হইল না।

কোন বস্তু যে পরিমাণ পদার্থের দ্বারা গঠিত উহা বস্তুর ভর। আর ওজন বা ভার হইল বস্তুটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলের পরিমাণ।

'ভর' পদার্থের একটি মৌলিক ধর্ম। কিন্তু ওজনকে সেইরূপ বলা যায় না। একই বস্তুকে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় লইয়া গেলে উহার 'ভর' বদলায় না, কিন্তু ওজন বদলায়। যেমন কলিকাতায় কোন জিনিষের ওজন 10 কিলোগ্রাম হইলে দার্জিলিঙে উহার ওজন 10 কিলোগ্রামের কম হইবে। কিন্তু ভর দুই স্থানে একই থাকিবে। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে কোন বস্তুর দূরত্ব যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, বস্তুর ওজনও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইবে। কোন বস্তু পৃথিবী হইতে চন্দ্রে লইয়া গেলে পথে এমন একটি স্থান আসিবে যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণ চন্দ্রের আকর্ষণ দ্বারা নাকচ হইবে এবং বস্তুটি উহার সকল ওজন হারাইয়া ফেলিবে। বস্তুটি চন্দ্রে লইয়া গেলে উহার ওজন পৃথিবীতে থাকাকালীন ওজনের ছয় ভাগের একভাগ মাত্র হইবে। যেমন,—পৃথিবী পৃষ্ঠে একটি লোহার বাটখাড়ার



চিত্র ১২

ওজন 60 কিলোগ্রাম। উহাকে চন্দ্রে লইয়া গেলে যাইবার পথে যত পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে দূরে যাওয়া যাইবে ততই উহার ওজন কমিতে থাকিবে এব পথে এমন একটি স্থান আসিবে যেখানে উহার কোনও ওজন থাকিবে না

(চিত্র ১২)। আবার চন্দ্র পৃষ্ঠে বাটখাড়াকে রাখিলে উহার ওজন আনুমানিক 6 কিলোগ্রাম হইবে। বাটখাড়াটির 'ভরের' পরিমাণ কিন্তু সর্বত্র একই থাকিবে।

কোন বস্তু হইতে কিছু পদার্থ বাদ না দিলে অথবা কিছু পদার্থ উহার সহিত যুক্ত না করিলে ভরের কোন পরিবর্তন হয় না।

আবার, পৃথিবী পৃষ্ঠের কোন স্থানে রাখা 60 কিলোগ্রাম ওজনের বাটখাড়াটিকে যদি মাটি ভেদ করিয়া পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে মনে হইতে পারে যে, উহার ওজন বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু তাহা হয় না। যদি এইরূপ পরীক্ষা করা সম্ভব হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বাটখাড়াটিকে যতই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে লইয়া যাওয়া হইতেছে ততই উহার (চিত্র ১৩) ওজন কমিতেছে। কেন্দ্রে লইয়া গেলে উহার আর ওজন থাকিবে না। ভর কিন্তু সর্বত্র একই থাকিবে।



চিত্র ১৩

কোন বস্তুর পদার্থের পরিমাণকে উহার ভর বলা হয়।

কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকের আকর্ষণ বলের পরিমাণকে ওজন বা ভার বলে।

ভর ও ওজনের পার্থক্য

ভর	ওজন বা ভার
১। ভর হইল বস্তুর পদার্থের পরিমাণ।	১। ওজন হইল বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলের পরিমাণ।
২। সাধারণ তুলাযন্ত্রের সাহায্যে 'ভর' মাপা হয়।	২। স্প্রিং তুলাযন্ত্রের সাহায্যে ওজন মাপা হয়।
৩। কোনও বস্তুর ভর সর্বত্র সমান।	৩। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে দূরত্বের উপর কোনও বস্তুর ওজন নির্ভর করে অর্থাৎ ওজন সর্বত্র সমান নয়।

পদার্থের অবিনশ্বরতা (Conservation of mass):

পদার্থ সম্বন্ধে একটি মূল কথা হইল যে পদার্থ সৃষ্টি করা যায় না আবার পদার্থের ধ্বংসও নাই। ইহাই পদার্থের অবিনশ্বরতা। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাঁভসিয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে সর্বপ্রথম পদার্থের অবিনশ্বরতা প্রমাণ করেন। এই সূত্রের মূল কথা হইল যে কোন অবস্থাগত বা রাসায়নিক পরিবর্তনে পদার্থের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু ইহার ফলে পদার্থের সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না। যে কোন প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থগুলির মোট ভরের কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না।

লোহা আর্দ্র বায়ুতে রাখিয়া দিলে উহা অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া মরিচায় পরিণত হয় এবং উহার ওজন বৃদ্ধি পায়। কাঠ কয়লা পুড়াইলে উহা কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয় এবং উহা উড়িয়া যায়। অল্প কিছু ভস্ম পড়িয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের রূপ পরিবর্তন হয় এবং মনে হয় যেন বস্তুর ভর বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইয়াছে ও নতুন পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে। যদি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহনকারী সকল পদার্থের ওজন এবং বিক্রিয়াজাত সকল পদার্থের ওজন লওয়া সম্ভব হয়; তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বিক্রিয়ায় অংশগ্রহনকারী সকল পদার্থের মোট ওজন বিক্রিয়াজাত সকল পদার্থের মোট ওজনের সমান। ইহা হইতে বুঝা যায় যে কোন পদার্থ ধ্বংসও হয় না বা কোন নতুন পদার্থ সৃষ্টিও হয় না। যাহাকে পদার্থের ধ্বংস বা সৃষ্টি বলিয়া মনে করা হয় প্রকৃতপক্ষে উহা পদার্থের রূপান্তর মাত্র।

শক্তির অবিনশ্বরতা (Conservation of energy):

প্রথমে বিজ্ঞানীরা এমন যন্ত্র তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহা দ্বারা কোন শক্তি ব্যায় না করিয়াই নতুন শক্তি উৎপাদন করা যায়। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের মতে কোন প্রকারের শক্তি রূপান্তরিত হইলে তাহা সমপরিমাণে অন্যরূপে প্রকাশিত হয়। কোন শক্তিকে ধ্বংসও করা যায় না বা সৃষ্টিও করা যায় না। শক্তি বিশ্বময় ছড়াইয়া আছে। বিশ্বের এই সমগ্র শক্তির পরিমাণের কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। ইহাকেই শক্তির অবিনশ্বরতা বলা হয়। শক্তির অবিনশ্বরতার সূত্র হইল, শক্তির সৃষ্টিও নাই ধ্বংসও নাই, শক্তি একরূপ হইতে এক বা একাধিক অন্যরূপে পরিবর্তিত হইতে পারে কিন্তু উহার পরিমাণ একই থাকে। বিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ ধ্রুব।

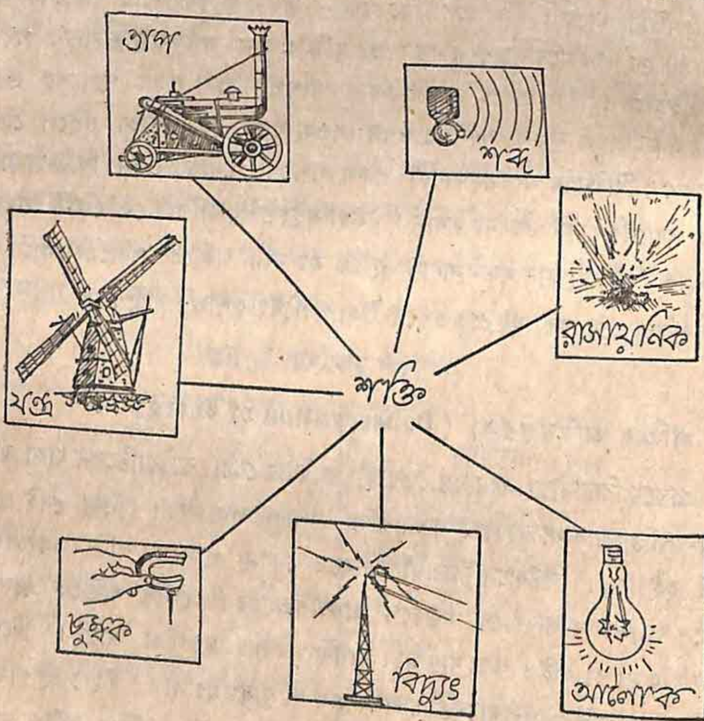
শক্তির বিভিন্ন রূপ (Different forms of energy) :

মূলত সকল শক্তি এক হইলেও উহা বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইতে পারে। শক্তির এই বিভিন্নরূপ হইল প্রধানত সাত প্রকার। যথা—

(১) যান্ত্রিক শক্তি (Mechanical energy)
(২) তাপশক্তি (Heat energy)
(৩) শব্দশক্তি (Sound energy)
(৪) আলোকশক্তি (Light energy)
(৫) চুম্বক শক্তি (Magnetic energy)
(৬) বিদ্যুত শক্তি (Electrical energy)
(৭) রাসায়নিক শক্তি (Chemical energy)

শক্তির রূপান্তর (Tnansfomation of energy) :

শক্তিকে উহার একরূপ হইতে অন্য যে কোন রূপে পরিবর্তিত করা যায়।



চিত্র ১৪

শক্তির রূপ পরিবর্তনের প্রতি ক্ষেত্রেই শক্তির পূর্ববর্তী মোট শক্তির পরিমাণ পরিবর্তিত মোট শক্তির সমান হইবে।

বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে বিজলীবাতি জ্বালানো হইল। এখানে বিদ্যুৎ শক্তি কিছু পরিমাণ তাপ শক্তি ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হইল।

তাপ শক্তির সাহায্যে জলকে স্টীমে পরিণত করিয়া স্টীম ইঞ্জিনের সাহায্যে রেলগাড়ী, ধানকল ইত্যাদি চালানো হইল। এক্ষেত্রে তাপশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইল। তাপশক্তি দ্বারা স্টীম উৎপন্ন করিয়া স্টীম ইঞ্জিন ও চুম্বক শক্তির সাহায্য লইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ডায়নামো চালনা করা হইল। এই ডায়নামো হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া আলো জ্বালানো হইল, পাখা ঘোরানো হইল, হিটার জ্বালানো হইল, ইস্ত্রি গরম করা হইল। এ ক্ষেত্রে তাপশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে এবং যান্ত্রিক শক্তি চুম্বক শক্তি ও বিদ্যুৎ শক্তিতে আবার বিদ্যুৎ শক্তি আলোক শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি এবং তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

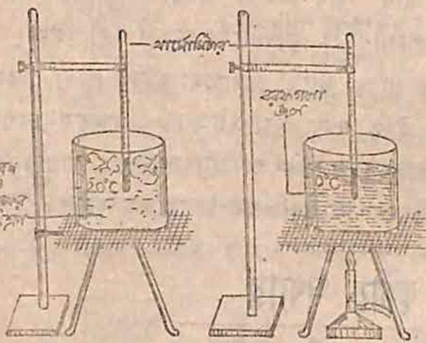
অবস্থা পরিবর্তন

অবস্থা পরিবর্তন (Change of State) : পদার্থ তিন রকম অবস্থায় থাকিতে পারে ; যথা— কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। তাপের তারতম্যের ফলে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। অধিকাংশ কঠিন পদার্থ তাপ প্রয়োগে প্রথমে তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং তরল পদার্থ তাপ প্রয়োগে গ্যাসীয় পদার্থে পরিবর্তিত হয়। আবার গ্যাসীয় পদার্থ তাপ বর্জন করিয়া তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং তরল পদার্থ তাপ বর্জন করিয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। যেমন, কঠিন বরফ তাপ বৃদ্ধিতে তরল জলে পরিণত হয়, এবং জল তাপ বৃদ্ধিতে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। আবার তাপ হ্রাসে ইহার বিপরীত অবস্থা ঘটিয়া থাকে। যেমন জলীয় বাষ্প তাপ-হ্রাসে তরল জলে এবং তরল জল তাপ-হ্রাসে কঠিন বরফে পরিণত হয়। পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের সময় পদার্থ হয় তাপ গ্রহণ করে না হয় তাপ বর্জন করে। পদার্থের এই অবস্থার পরিবর্তনের সময় তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু আয়তন এবং ভৌতিক গুণের পরিবর্তন হয়।

যখন কোন পদার্থ তাপ বৃদ্ধিতে কঠিন হইতে তরলে বা তরল হইতে গ্যাসীয় অবস্থাতে অথবা তাপ-হ্রাসে গ্যাসীয় হইতে তরলে বা তরল হইতে কঠিন পদার্থে পরিণত হয় অর্থাৎ

পদার্থ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয় তখন তাহাকে পদার্থের অবস্থা পরিবর্তন বলে।

গলন (Melting) : তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থ তরল পদার্থে পরিণত হয়। চারি ভাগ বরফের সঙ্গে একভাগ সাধারণ লবণ ওজন অনুসারে মিশ্রিত করিয়া উহার মধ্যে বরফ রাখিলে উহার উষ্ণতা – 20°C হয়। এই বরফে তাপ প্রয়োগ করিলে উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। থার্মোমিটারের সাহায্যে উষ্ণতা দেখা হইল। উষ্ণতা – 20°C হইতে 0°C এ পৌছিলে তাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও উষ্ণতার কোন পরিবর্তন থার্মোমিটারে দেখা যায় না, কিন্তু বরফ গলিয়া জলে পরিণত হইতে থাকে। যতক্ষণ সমস্ত বরফ গলিয়া জলে পরিণত না হয় ততক্ষণ তাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও উষ্ণতা 0°C এ স্থির থাকে। যখন সমস্ত বরফ গলিয়া জলে পরিণত হইবে, তখন উষ্ণতার বৃদ্ধি আরম্ভ হইবে। গলনের সময় বরফের উপর বায়ুর চাপও নির্দিষ্ট থাকে।



চিত্র ১৫

নির্দিষ্ট চাপে ও নির্দিষ্ট উষ্ণতায় পদার্থের কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় পরিণত হওয়াকে পদার্থের 'গলন' বলে।

কঠিনীভবন (Freezing) : তরল পদার্থ তাপ হ্রাসে কঠিনে পরিণত হয়। একটি পাত্রে বিশুদ্ধ জল লইয়া উহাকে হিমমিশ্রে (বরফ ও সাধারণ লবণের মিশ্রণ যাহার উষ্ণতা – 20°C) রাখিলে জলের উষ্ণতা কমিতে থাকিবে ও যখন 0°C এ পৌছিবে তখন উহাকে শীতল করা সত্ত্বেও উহার উষ্ণতার কোন পরিবর্তন হইবে না, কিন্তু জল জমিয়া বরফ হইবে। যতক্ষণ সমস্ত জল জমিয়া বরফে পরিণত না হয় ততক্ষণ উষ্ণতা 0°C এ স্থির থাকে। পরে বরফের উষ্ণতা ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। জল জমিয়া বরফ হইবার সময় জলের উপর বায়ুর চাপও নির্দিষ্ট থাকে।

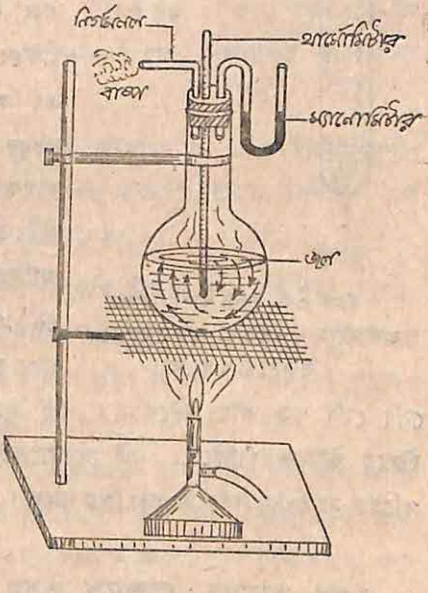
নির্দিষ্ট চাপে ও নির্দিষ্ট উষ্ণতায় পদার্থের তরল অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় পরিণত হওয়াকে পদার্থের 'কঠিনীভবন' বলে।

বাষ্পীভবন (Evaporation) : গ্রীষ্মকালে সূর্য তাপে খাল, বিল পুকুর, সাগর প্রভৃতি জলাশয়ের উপরিতল হইতে জল প্রতিনিয়ত জলীয়-বাষ্পে পরিণত হয়। ভিজা জামা-কাপড় সূর্য তাপে শুষ্ক হয়। তাপের প্রভাবে ভিজা জামাকাপড়ের জল জলীয়-বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাওয়ার জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে তরল পদার্থ তাপের প্রভাবে ধীরে ধীরে তরল অবস্থা হইতে বাষ্পে পরিণত হয়। ইহাই হইল বাষ্পীভবন। উষ্ণতা যত বেশী হইবে বাষ্পীভবনও তত বেশী ও দ্রুত হইবে।

একটি প্লেটে কয়েক ফোঁটা জল রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে প্লেটে জলের চিহ্নও নাই। কারণ, সাধারণ তাপেও জল বাষ্পে পরিণত হয়। ঘরের মেঝে জল দিয়া মুছিবার কিছু সময় পরেই শুকাইয়া যায়। কালি দিয়া লিখিলে কালি শুকাইয়া যায়। সাধারণ তাপে কোহল, ইথার ইত্যাদি দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয়।

তাপের প্রভাবে তরল পদার্থের উপরিভাগ হইতে ক্রমাগত উহার বাষ্পে পরিণত হওয়াকে বাষ্পীভবন বলে।

বাষ্পীভবন পদ্ধতিতে দ্রবণ হইতে কঠিন ও তরল পদার্থ পৃথক করা যায়। যেমন, লবণ জলের দ্রবণকে উত্তপ্ত করিলে জল বাষ্পে পরিণত হইয়া যায় এবং কঠিন লবণের শুষ্ক দানা পড়িয়া থাকে। এইভাবে সমুদ্র জল হইতে লবণ তৈরী করা হয়।



চিত্র ১৬

স্ফুটন (Boiling) : তাপ প্রয়োগে খুব দ্রুত পদার্থের তরল অবস্থা হইতে বাষ্পে পরিণত হওয়াকেই স্ফুটন বলা হয়। স্ফুটন তরলের সমস্ত অংশ হইতে সংগঠিত হইয়া থাকে। ইহা পারিপার্শ্বিক চাপের উপর নির্ভর করিয়া একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় শুরু হয়। সমস্ত তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত এই উষ্ণতা স্থির থাকে।

একটি কাচের ফ্লাস্কের প্রায় অর্ধেক অংশ জলে ভর্তি করা হইল। ফ্লাস্কের মুখে

তিনটি ছিদ্রযুক্ত একটি রবারের ছিপি দ্বারা বন্ধ করিয়া মধ্যের ছিদ্র দিয়া একটি থার্মোমিটার, বাম পাশের ছিদ্র দিয়া একটি নির্গমনল এবং ডান পাশের ছিদ্র দিয়া পারদপূর্ণ চাপমাপক-U আকৃতির নল প্রবেশ করানো হইল। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন থার্মোমিটারের বাল্‌বটি জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে এবং নির্গমনলের মুখটি যেন নলের উপরে থাকে। U-নলের দুই বাহুতে—পারদের তলের পার্থক্য দেখিয়া ভিতরের বাষ্পের চাপ মাপা হয় (চিত্র ১৬)।

ফ্লাস্কটিকে তার জালির উপর রাখিয়া বুনসেন বার্ণারের সাহায্যে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা হইল। প্রথমে জলের নীচের স্তর উষ্ণ ও হালকা হইয়া উপরে উঠিবে এবং উপরের ভারী শীতল স্তর নীচে নামিবে। এইরূপে সমস্ত জল উষ্ণ হইতে থাকিবে। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রবীভূত বায়ু বুদ্‌বুদের আকারে বাহির হইয়া প্রথমে পাত্রের দেওয়ালে জমিবে এবং পরে জল হইতে বাহির হইয়া যাইবে। থার্মোমিটারের উষ্ণতা 100°C এর কাছাকাছি হইলে জলের নিম্নস্তরে বুদবুদ গঠিত হইবে। স্টীম জল অপেক্ষা হালকা। সুতরাং এই হালকা স্টীম উপরে উঠিতে উঠিতে শীতল জলের সংস্পর্শে আসিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। ফলে জলে সোঁ সোঁ একটি শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে। সমস্ত জলের উষ্ণতা 100°C এ পৌছিলে সোঁ সোঁ শব্দ আর হইবে না। এই সময় জলের সমস্ত অংশ হইতে স্টীম উপরে উঠিতে থাকিবে। এই অবস্থাকেই স্ফুটন বলা হয়। সমস্ত জল স্টীমে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত উষ্ণতা স্থির থাকে।



চিত্র ১৭—দেখা যাইবে সমস্ত জল স্টীমে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত উষ্ণতা স্থির থাকে।

যখন তাপের প্রভাবে তরল পদার্থ উহার সকল অংশ হইতেই গ্যাসীয় রূপে পরিবর্তিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে স্ফুটন বলে।

বাষ্পীভবন ও স্ফুটনের মধ্যে পার্থক্য

বাষ্পীভবন	স্ফুটন
১। বাষ্পীভবন সকল উষ্ণতায় ঘটিয়া থাকে। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বাষ্পীভবনের হার বৃদ্ধি পায়।	১। স্ফুটন নির্দিষ্ট চাপে ও একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ঘটিয়া থাকে।
২। বাষ্পীভবন তরলের উপর তল হইতে হয়।	২। স্ফুটন তরলের সকল অংশ হইতে হয়।
৩। বাষ্পীভবন নিঃশব্দে ধীরে ধীরে হয়।	৩। স্ফুটন সশব্দে দ্রুত হয়।
৪। বাষ্পীভবনের সময় বাষ্পের চাপ বায়ুর চাপ অপেক্ষা কম।	৪। স্ফুটনাংকে তরলের গ্যাসীয় চাপ বায়ুর চাপের সমান।

বাষ্পীভবনের হার পরিবর্তনের কারণ (Factors influencing rate of evaporation) ঃ

সকল তরল পদার্থের বাষ্পীভবন সমান গতিতে হয় না এবং একই তরলের বাষ্পীভবনের হারও এক হয় না। বাষ্পীভবনের হার নিম্নলিখিত কারণগুলির উপর নির্ভর করে।

১। **তরলের প্রকৃতি**—তরল পদার্থের স্ফুটনাংক যত কম হয় উহার বাষ্পীভবন তত দ্রুত হয়। পেট্রল, ইথার, কোহল ইত্যাদি হাতে রাখিলে সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পে পরিণত হয়। ইহাদের স্ফুটনাংক কম।

২। **তরলের উষ্ণতা**—তরল পদার্থের উষ্ণতা যত বৃদ্ধি হয়, বাষ্পীভবনের হারও তত বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মকালে নদী, পুকুর ইত্যাদি জলাশয়ের জল দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয়। গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলেই এরূপ হইয়া থাকে। স্ফূটনাংকে বাষ্পীভবনের হার সর্বাপেক্ষা অধিক।

৩। **বায়ুর শুষ্কতা**—বায়ুতে যত কম জলীয় বাষ্প থাকে তত দ্রুত জলের বাষ্পীভবন হয়। শীতকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম থাকে বলিয়া ভিজা-জামা কাপড় দ্রুত শুকায়। আবার বর্ষাকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশী থাকে, ফলে বাষ্পীভবন ধীরে ধীরে হয় এবং জামা কাপড় দেরীতে শুকায়।

৪। **বায়ুর চাপ**—তরলের পদার্থের উপর বায়ুর চাপ যত কম হয় বাষ্পীভবনের হার তত বৃদ্ধি পায়। এইজন্য বায়ুশূন্য স্থানে বাষ্পীভবন খুব দ্রুত হয়।

৫। **বায়ুপ্রবাহ**—তরল পদার্থের উপর দিয়া যত দ্রুত বায়ু প্রবাহিত হয় তরল পদার্থের বাষ্পীভবন তত দ্রুত হয়। এইজন্য ভিজা জামা-কাপড় শীঘ্র শুকাইবার জন্য বাতাসে আন্দোলিত করা হয়। শরীরে হাওয়া করিলে ঘাম শীঘ্র শুকায়।

৬। **তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল**—তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পাইলে বাষ্পীভবনের হারও বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে গরম চা প্লেটে ঢালিলে উহার বাষ্পীভবন দ্রুত হয় এবং বাষ্পীভবনের ফলে উষ্ণতা কমিয়া যায়।

ঘনীভবন (Condensation): জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিলে উহা জলে পরিণত হয়। বায়ুর জলীয় বাষ্প উর্দ্ধাকাশে কোন বিশেষ কারণে তাপ হ্রাসে শীতল হইয়া তরলে পরিণত হয় এবং উহা বৃষ্টিরূপে মাটিতে পড়ে! একটি কেটলীতে খানিকটা জল লইয়া ফুটাইলে কেটলীর মুখ হইতে জলীয়বাষ্প বাহির বাহির হইবে। ঐ মুখে একটি কাচের গ্লাস ধরিয়া গ্লাসের গায়ের উপর যদি বরফ শীতল জল ঢালা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে গ্লাসের মধ্যে কেটলীর মুখ হইতে নির্গত জলীয় বাষ্প গ্লাসের মধ্যে জলে পরিণত হইতেছে। কারণ জলীয়বাষ্প তাপ হ্রাসে শীতল হইয়া জলে পরিণত হইতেছে এই সকলই হইল ঘনীভবনের উদাহরণ।

তাপ হ্রাসে গ্যাসীয় পদার্থ শীতল হইয়া উহা তরল পদার্থে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনকে ঘনীভবন বলে।

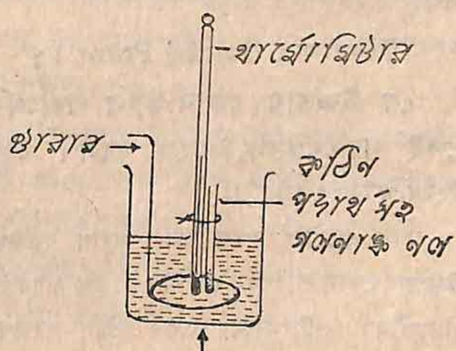
গলনাংক (Melting point): অধিকাংশ কঠিন পদার্থকে তাপ প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে প্রথমে তাপ প্রয়োগ করিলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। ক্রমাগত তাপ প্রয়োগে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কঠিন পদার্থ গলিতে আরম্ভ করে, এবং সমস্ত পদার্থ না গলা পর্যন্ত উহার উষ্ণতা আর বৃদ্ধি পায় না। এই উষ্ণতাকে ঐ পদার্থের গলনাংক বলা হয়। এই গলনাংকের উষ্ণতা বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। সুতরাং অধিকাংশ পদার্থের একটি নির্দিষ্ট গলনাংক আছে।

ন্যাপথালিনের গলনাংক 80°C—এই কথার অর্থ সাধারণ বায়ুর চাপে কিছু ন্যাপথালিন লইয়া উত্তপ্ত করিলে উহার তাপ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে 80°C এ যখন পৌঁছায় তখন ন্যাপথালিন গলিতে আরম্ভ করে এবং যতক্ষণ সমস্ত ন্যাপথালিনের গলন শেষ না হয় ততক্ষণ এই উষ্ণতা স্থির থাকে।

বিভিন্ন পদার্থের গলনাংক বিভিন্ন। যেমন সাধারণ বায়ুর চাপে—

তামার	গলনাংক	1083°C
রূপার	”	960°C
সীসার	”	327·4°C
সোনার	”	1063°C
দস্তার	”	418°C
ন্যাপথালিনের	”	80°C
টাংস্টেনের	”	3000°C
মোমের	”	52°—58°C
বরফের	”	0°C
পারদের	”	–39°C

কেলাসিত (crystalline) পদার্থের গলনাংক এবং হিমাংক এক হয়। যেমন, প্রমাণ বায়ুর চাপে বরফ 0°C এ গলিয়া জলে পরিণত হয়। আবার জল ঐ তাপমাত্রাতেই জমিয়া বরফে পরিণত হয়। কিন্তু কতগুলি অকেলাসিত (Non-crystalline) পদার্থ আছে যা চর্বি, মোম, কাঁচ, মাখন ইত্যাদি গলিবার পূর্বে এক প্রকার থক্‌থকে (Viscous) অবস্থায় আসে। এই পদার্থগুলির নির্দিষ্ট গলনাংক বা হিমাংক নাই। মাখন 28°C হইতে 37°C উষ্ণতার মধ্যে গলে এবং 23°C হইতে 20°C এর মধ্যে জমে। সংকর ধাতুর গলনাংক উপাদান ধাতুর গলনাংক অপেক্ষা কম হয়। অর্থাৎ যে সকল মৌলিক ধাতুর উপাদানে সংকর ধাতু তৈয়ারী হয়, সেই সকল উপাদান ধাতুর গলনাংক অপেক্ষা সংকর ধাতুর গলনাংক কম। ইস্পাতের গলনাংক বিশুদ্ধ লোহা অপেক্ষা কম।



চিত্র ১৮—কঠিন পদার্থের গলনাংক এইভাবে স্থির করা যায়।

অধিকাংশ কঠিন পদার্থ নির্দিষ্ট চাপে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় গলিতে আরম্ভ করে এবং যতক্ষণ না সমস্ত পদার্থ গলিয়া তরল পদার্থে পরিণত হয় ততক্ষণ এই উষ্ণতার কোন পরিবর্তন হয় না। এই উষ্ণতাকে গলনাংক বলা হয়।

গলনাংকের উপর চাপের প্রভাব (Effects of pressure on melting point) ঃ

কঠিন পদার্থের গলনাংক চাপের উপর নির্ভর করে। চাপের পরিবর্তনে গলনাংকের পরিবর্তন হয়। চাপ ও গলনাংকের পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায়।

(ক) গলনের ফলে কোন পদার্থের আয়তন কমিয়া গেলে ঐরূপ ক্ষেত্রে চাপ বৃদ্ধিতে গলনাংক হ্রাস পায়। যেমন,—বরফ, বিসমাথ, ঢালাই লোহা, অ্যান্টিমণি ইত্যাদি।

(খ) গলনের ফলে কোন পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পাইলে ঐরূপ পদার্থের ক্ষেত্রে চাপ বৃদ্ধিতে গলনাংক বৃদ্ধি হইবে। যেমন,—তামা, রূপা, মোম ইত্যাদি।

স্ফুটনাংক (Boiling Point) ঃ

যে উষ্ণতায় কোন তরল পদার্থের স্ফুটন হয়, তাহাকে সেই পদার্থের স্ফুটনাংক বলে। যেমন,—প্রমাণ বায়ুমণ্ডলের চাপে জলের স্ফুটনাংক 100°C.

তাপ প্রয়োগে সমস্ত তরল পদার্থ যতক্ষণ না বাষ্পে পরিণত হয় ততক্ষণ উষ্ণতার কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের চাপের উপর ঐ তাপমাত্রা নির্ভরশীল। এই কারণে একই তরল পদার্থের স্ফুটনাংক বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন চাপে বিভিন্ন। প্রমাণ বায়ু মণ্ডলের চাপে বিভিন্ন পদার্থের স্ফুটনাংক বিভিন্ন। যেমন,—

অ্যালুমিনিয়ামের স্ফুটনাংক		2200°C	পারদের	স্ফুটনাংক	356·7°C
তামার	"	2310°C	রূপার	"	2152°C
সোনার	"	2530°C	প্লাটিনামের	"	4300°C
সীসার	"	1755°C	লোহার	"	3235°C

আবার একই তরলের বিভিন্ন বায়ুমণ্ডলের চাপে স্ফুটনাংক বিভিন্ন। যেমন,—

780	মিলিমিটার	চাপে	জলের	স্ফুটনাংক	100·7°C
770	"	"	"	"	100·4°C
760	"	"	"	"	100°C
750	"	"	"	"	99·6°C
740	"	"	"	"	99·3°C
730	"	"	"	"	98·9°C
720	"	"	"	"	98·5°C
528	"	"	"	"	90°C
95	"	"	"	"	50°C

স্ফুটনাংকের পরিবর্তনের কারণ (Factors influencing boiling point) :

তরলের স্ফুটনাংক নিম্নলিখিত কারণে পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

১। **তরলের উপরিস্থিত চাপ**—তরল পদার্থের উপর চাপ বৃদ্ধি পাইলে স্ফুটনাংক ও বৃদ্ধি পায় আবার চাপ হ্রাস পাইলে স্ফুটনাংকের ও হ্রাস হয়। জলের উপর প্রতি 27 মিলিমিটার বায়ু চাপ হ্রাস পাইলে বা বৃদ্ধি পাইলে জলের স্বাভাবিক স্ফুটনাংক 1°C হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়।

২। **তরলের দ্রবীভূত দ্রাব**—তরল পদার্থে কোন দ্রাব বা অশুদ্ধি তরলের স্ফুটনাংক অপেক্ষা বেশী হয়। সাধারণ লবণ জলে দ্রবীভূত থাকিলে জলের স্বাভাবিক স্ফুটনাংক প্রায় 9°C বৃদ্ধি পায়।

৩। **স্ফুটন পাত্রের ভৌত অবস্থা :** তরল পদার্থের স্ফুটনাংক, স্ফুটন পাত্রের উপাদান, পরিচ্ছন্নতা এবং পূর্বের অবস্থার উপরও নির্ভর করে।

লীনতাপ (Latent heat) : তাপ প্রয়োগে পদার্থের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং তাপ হ্রাসে উষ্ণতা হ্রাস পায় ইহাই সাধারণ নিয়ম! কিন্তু গলন, কঠিনীভবন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যাতিক্রম দেখা যায়।

অধিকাংশ কঠিন পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ তাপ প্রয়োগে পদার্থের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং উষ্ণতা একটি নির্দিষ্ট মাপে পৌছিলে কঠিন পদার্থ গলিতে আরম্ভ করে এবং সমস্ত গলিয়া তরল পদার্থে পরিণত না

হওয়া পর্য্যন্ত উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। এই মাপ বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। কিন্তু যে তাপ প্রয়োগ করা হইল তাহা কোথায় গেল ? যতক্ষণ সমস্ত কঠিন পদার্থ তরলে পরিবর্তিত হয় ততক্ষণ প্রযুক্ত তাপ সম্পূর্ণ রূপে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে ব্যয়িত হয়। তাপের বৃদ্ধি হয় কিন্তু উহার প্রকাশ উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না—ইহা যেন লুকায়িত থাকিয়া পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। এই কারণে এই তাপকে লীনতাপ (Latent heat) বলা হয়।

উষ্ণতার পরিবর্তন না ঘটাইয়া এক গ্রাম পরিমিত কোনও কঠিন পদার্থকে কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় পরিবর্তিত করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ তাপকে ঐ পদার্থের গলনের লীনতাপ বলে।

যথা—'বরফ গলনের লীনতাপ 80 ক্যালরি গ্রাম'। ইহার অর্থ 0°C উষ্ণতায় একগ্রাম বরফকে জলে পরিবর্তিত করিতে 80 ক্যালরি তাপের প্রয়োজন। আবার 0°C উষ্ণতায় 1 গ্রাম জল 0°C উষ্ণতায় বরফে পরিণত হইলে 80 ক্যালরি তাপ বর্জন করে।

উষ্ণতার পরিবর্তন না ঘটাইয়া এক গ্রাম তরলকে বাষ্পে পরিবর্তিত করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে বাষ্পীভবনের লীনতাপ বলে। যথা—

'জলের বাষ্পীভবনের লীনতাপ 537 ক্যালরি গ্রাম' ইহার অর্থ জলের স্ফুটনাংকে 1 গ্রাম জলকে 100°C উষ্ণতায় স্টীমে পরিবর্তিত করিতে 537 ক্যালরি তাপের প্রয়োজন। আবার 100°C উষ্ণতায় 1 গ্রাম স্টীমকে 100°Cএ জলে পরিবর্তিত করিলে 537 ক্যালরি তাপ নির্গত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

স্থিতি ও গতি

স্থিতি ও গতি (Rest and motion) :

এই পৃথিবীর বুকে ঘরবাড়ি, গাছপালা, পাহাড় পর্বত প্রভৃতিকে স্থির অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উহারা একই স্থানে সর্বদা স্থির থাকে বলিয়া উহাদের স্থির বলা হয়। আবার নৌকা, জাহাজ, রেলগাড়ি যখন চলিতে থাকে, একটি ঘোড়া, একটি বল যখন ছুটিতে থাকে, তখন উহাদের গতিশীল অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ নৌকা, জাহাজ রেলগাড়ি, ঘোড়া, বল প্রভৃতি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করিতেছে। বস্তুকে কখন ও স্থির দেখি আবার উহাকেই গতিশীল অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন একটি ষ্টেশনে একটি রেলগাড়ি 5 মিনিট সময় দাঁড়াইয়া আছে, এক্ষেত্রে রেলগাড়িটি স্থির। আবার 5 মিনিট পরে গাড়িটি ছাড়িয়া দিল অর্থাৎ 5 মিনিট পরে গাড়িটি ক্রমাগত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থান পরিবর্তন করিয়া চলিল। এক্ষেত্রে গাড়িটি গতিশীল।

পৃথিবীর বুকে যে সকল বস্তুকে স্থির অবস্থায় দেখা গেল উহারা প্রকৃত পক্ষে স্থির নহে। কারণ পৃথিবী নিজে স্থির নহে, গতিশীল। পৃথিবী অনবরত নিজ কক্ষের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে এবং এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্যকে প্রচণ্ড গতিতে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সুতরাং পৃথিবীর উপর অবস্থিত যে সকল বস্তুকে, যেমন ঘরবাড়ি, পাহাড় পর্বত প্রভৃতিকে স্থির বলিয়া মনে হয় প্রকৃতপক্ষে উহারা স্থির নহে কারণ উহারা পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরিতেছে।

পৃথিবী হইতে অন্য কোন গ্রহে যাইয়া পৃথিবীকে দেখা সম্ভবপর হইলে পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থিত কোন বস্তুকেই স্থির অবস্থায় দেখা যাইবে না।

বিজ্ঞানীদের মতে যে সূর্যকে পৃথিবী অনবরত প্রদক্ষিণ করিতেছে সেই সূর্যও স্থির নহে অর্থাৎ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সূর্যেরও স্থানের পরিবর্তন ঘটিতেছে। শুধু সূর্য নয়, আকাশের কোনও নক্ষত্রই স্থির নয়। এক কথায় এই মহাবিশ্বে এমন কিছুই নাই যাহা চরম স্থির অবস্থায় রহিয়াছে।

সুতরাং পৃথিবীর বুকে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবী সাপেক্ষে যে বস্তু স্থির সাধারণতঃ তাহাকেই স্থির বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। যেমন—পৃথিবীর বুকে 'ক'

বস্তুর সাপেক্ষে যদি 'খ' বস্তু সময়ের সহিত স্থান পরিবর্তন না করে তাহা হইলে খ বস্তুকে স্থির বলা হইবে। প্রকৃতপক্ষে 'ক' এবং 'খ' দুইটি বস্তুই পৃথিবীর গতির সঙ্গে গতিশীল। আবার 'ক' বস্তুর সাপেক্ষে যদি 'খ' বস্তুটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করিতে থাকে তাহা হইলে 'খ' বস্তুটিকে গতিশীল বলা হয়।

যখন কোন বস্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ স্থান পরিবর্তন করে না তখন উহার অবস্থাকে স্থিতি বলে।

যখন কোন বস্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ স্থান পরিবর্তন করে তখন উহার অবস্থাকে গতি বলে।

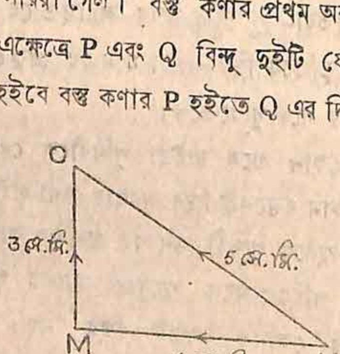
সরণ (Displacement) ঃ

কোন বস্তু একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরিয়া গেলে ঐ সময়ে বস্তুটির যে অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে তাহাই হইল বস্তুটির সরণ। বস্তুর স্থান পরিবর্তন সরল বা বক্র যে পথেই হউক না কেন, বস্তুটির প্রথম অবস্থান এবং শেষ অবস্থান একটি সরলরেখা দ্বারা যোগ করিলে ঐ সরলরেখার দূরত্বই হইবে বস্তুটির সরণ



চিত্র-১৯

মনে করা যাউক একটি বস্তুকণা যে কোন সময়ের ব্যবধানে P বিন্দু হইতে সরল পথে Q বিন্দুতে সরিয়া গেল। বস্তু কণার প্রথম অবস্থান ছিল P এবং শেষ অবস্থান হইলে Q। এক্ষেত্রে P এবং Q বিন্দু দুইটি যোগ করিয়া যে দূরত্ব পাওয়া যাইবে উহাই হইবে বস্তু কণার P হইতে Q এর দিকে সরণ (চিত্র-১৯)।

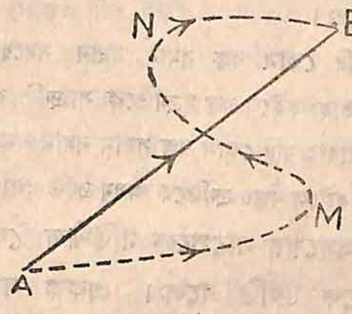


চিত্র-২০

আবার ধরা যাউক একটি বস্তুকণা প্রথমে N বিন্দুতে ছিল। বস্তুকণাটি N বিন্দু হইতে সরিয়া গিয়া M বিন্দুতে পৌছিল। পরে M বিন্দু হইতে বস্তুকণাটি

সরিয়া O বিন্দুতে পৌছিল। বস্তুকণাটি যদিও NMO পথে সরিয়া গেল কিন্তু উহার সরণ হইল NO সরলখোর দূরত্ব। কারণ বস্তুটির প্রথম অবস্থান ছিল N এবং শেষ হইল O। যদি NM সরলরেখার দূরত্ব 4 সেন্টিমিটার, MO সরলরেখার দূরত্ব 3 সেন্টিমিটার এবং উহারা যদি পরস্পর লম্ব হয় তাহা হইলে বস্তুকণার সরণের মান $NO = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ সেন্টিমিটার হইবে (চিত্র-২০)।

পুনরায়, যদি কোণ বস্তুকণা A বিন্দু হইতে AMNB বক্রপথে B বিন্দুতে পৌছায় তাহা হইলে বস্তুকণার প্রথম অবস্থান A এবং শেষ অবস্থান B বিন্দু যোগ করিয়া যে সরল রেখা পাওয়া যাইবে উহার দূরত্বই হইবে বস্তুকণার সরণ। এক্ষেত্রে সরণের দিক A হইতে B পর্য্যন্ত নির্দেশ করিবে (চিত্র-২১)।



চিত্র-২১

স্নতরাং সরণের দিক ও মান দুইই আছে। সরণ একটি 'ভেকটর' রাশি।

ভেকটর রাশি ঃ যে রাশির দিক্ এবং মান দুইই আছে তাহাকে ভেকটর রাশি বলে।

যদি কোন বস্তু একটি নির্দিষ্ট দিকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায় তাহা হইলে সেই পরিবর্তনকে সরণ বলে। বস্তুটির প্রথম অবস্থান এবং শেষ অবস্থানের মধ্যে যে সরলরৈখিক দূরত্ব উহাই হইল বস্তুর সরণের মান।

দ্রুতি (Speed) ঃ

প্রতি একক সময়ে সরল বা বক্র যে কোন পথে কোন বস্তুর স্থান পরিবর্তনই হইল বস্তুর দ্রুতি। দ্রুতির মান আছে কিন্তু দিক নির্দিষ্ট নাই। কোন বস্তুর দ্রুতি বলিতে উহা এক সেকেণ্ডে কত পথ অতিক্রম করে তাহা জানা যায় কিন্তু অতিক্রমের দিক্ বলা হয় না। দ্রুতি একটি স্কেলার রাশি।

স্কেলার রাশি ঃ

যে রাশির মান আছে কিন্তু দিক নির্দিষ্ট নাই তাহাকে স্কেলার রাশি বলে।

কোন বস্তু যদি 5 সেকেণ্ডে 10 ফুট পথ অতিক্রম করে তাহা হইলে বস্তুটির দ্রুতি হইবে $\frac{10}{5}$ বা 2 ফুট প্রতি সেকেণ্ডে আবার যদি কোন বস্তু 10 সেকেণ্ড সময়ে 30 সেন্টিমিটার পথ অতিক্রম করে তাহা হইলে বস্তুটির দ্রুতি হইবে $\frac{30}{10}$ বা 3 সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে।

সুতরাং দ্রুতির একক হইল সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে বা ফুট প্রতি সেকেণ্ডে।

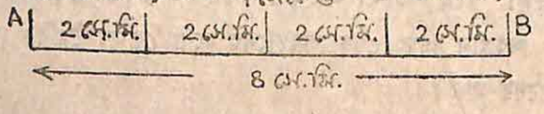
যদি কোন বস্তু সমান সমান সময়ে সর্বদা সমান সমান পথ অতিক্রম করে তাহা হইলে বস্তুর দ্রুতিকে সমদ্রুতি বলা হয়।

আবার যদি কোন বস্তু সমান সমান সময়ে সর্বদা সমান পথ অতিক্রম না করে তাহা হইলে বস্তুর দ্রুতিকে অসম দ্রুতি বলা হয়।

সময়ের সাপেক্ষে গতিশীল কোন বস্তুর স্থান পরিবর্তনের হারকে দ্রুতি বলে। একক সময়ে বস্তুর অতিক্রান্ত পথের দূরত্বই হইল দ্রুতির মান।

বেগ (Velocity) ঃ

কোন নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতিই হইল বেগ। যেমন কোন বস্তু একটি নির্দিষ্ট দিকে 4 সেকেণ্ডে 8 সেন্টিমিটার পথ অতিক্রম করিলে উহার বেগ হইবে সেকেণ্ডে 2 সেন্টিমিটার (চিত্র-২২)।

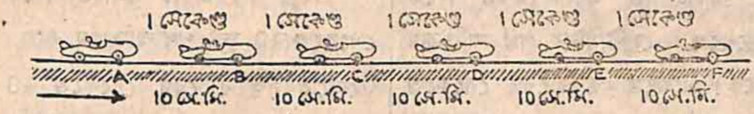


চিত্র-২২

কোন নির্দিষ্ট দিকে এক সেকেণ্ডে কোন বস্তু যতটা পথ যাইতে পারে উহাই হইল বেগের পরিমাপ। বেগের মাপ ও নির্দিষ্ট দিক আছে। অতএব ইহা একটি ভেকটর রাশি।

বেগ সম এবং অসম দুই রকমের হইতে পারে। সমান সমান সময়ে কোন বস্তু একটি নির্দিষ্ট দিকে সমান সমান পথ অতিক্রম করিলে বস্তুটির বেগকে সমবেগ বলা হয়।

আবার একটি নির্দিষ্ট দিকে কোন বস্তু যদি সমান সমান সময়ে সমান সমান পথ অতিক্রম না করে তাহা হইলে বস্তুটির বেগকে অসম বেগ বলা হয়।



চিত্র-২৩

ধরা যাউক একটি গাড়ীর A বিন্দু হইতে F বিন্দু পর্য্যন্ত 50 সেন্টিমিটার দূরত্ব A F নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিতে 5 সেকেণ্ড সময় লাগে। গাড়ীটি যদি প্রতি-সেকেণ্ডে 10 সেন্টিমিটার পথ অতিক্রম করিয়া 50 সেন্টিমিটার 5 সেকেণ্ড সময়ে অতিক্রম করে অর্থাৎ গাড়ীটি যদি একটি নির্দিষ্ট A F পথে সমান সমান পথ সমান সমান সময়ে অতিক্রম করে তাহা হইলে গাড়ীটির বেগ সমবেগ হইবে।

আবার কোন গাড়ী যদি A হইতে F পর্য্যন্ত পথ অতিক্রম করিতে A হইতে B 8 সে.মি. পথ এক সেকেণ্ডে, B হইতে C 11 সে.মি. পথ এক সেকেণ্ডে, C হইতে D পর্য্যন্ত 14 সে.মি. পথ এক সেকেণ্ডে, D হইতে E পর্য্যন্ত 17 সে.মি. পথ এক সেকেণ্ডে অতিক্রম করে তাহা হইলে বস্তুটির বেগ অসম হইবে। এই ক্ষেত্রে বস্তুটি সমান সমান সময়ে সমান সমান পথ অতিক্রম করে না বলিয়া বস্তুটির বেগ অসম।

কোন নির্দিষ্ট দিকে কোন বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের হারকে বেগ বলে।

বেগের একক

সি. জি. এস পদ্ধতি	এফ. পি. এস পদ্ধতি
যদি কোন বস্তু এক সেকেণ্ডে কোন নির্দিষ্ট দিকে এক সেন্টিমিটার পথ অতিক্রম করে তাহা হইলে সি. জি. এস. পদ্ধতিতে বেগের এক একক হইবে। অর্থাৎ সি. জি. এস পদ্ধতিতে বেগের একক সেকেণ্ডে এক সেন্টিমিটার।	যদি কোন বস্তু একটি নির্দিষ্ট দিকে এক সেকেণ্ডে এক ফুট পথ অতিক্রম করে তাহা হইলে এফ. সি, এস পদ্ধতি বেগের এক একক হইবে। অর্থাৎ এফ. পি এস. পদ্ধতিতে বেগের একক সেকেণ্ডে এক ফুট।

সি. জি. এস পদ্ধতি	এফ. পি. এস পদ্ধতি
একটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট দিকে সেকেণ্ডে 5 সেন্টিমিটার পথ অতিক্রম করে। এক্ষেত্রে বস্তুটির বেগ সেকেণ্ডে 5 সেন্টিমিটার। ইহা সি. জি. এস পদ্ধতিতে বেগের একক।	একটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট দিকে সেকেণ্ডে 10 ফুট পথ অতিক্রম করে। এক্ষেত্রে বস্তুটির বেগ সেকেণ্ডে 10 ফুট। ইহা এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে বেগের একক।

ত্বরণ ও মন্দন (Acceleration and retardation) ঃ

কোন স্টেশন হইতে একটি ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে উহার গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তারপর হয়তো বিছু সময় একটানা একই বেগে ট্রেনটি চলিতে থাকে। আবার পরবর্তী স্টেশনে আসিয়া থামিবার পূর্বে ধীরে ধীরে ট্রেনটির বেগ হ্রাস পাইতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত ট্রেনটি স্টেশনে স্থির হইয়া দাঁড়ায়। এই ক্ষেত্রে ট্রেনটির বেগ যখন পরিবর্তিত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন বেগের এই পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলা হয়। আবার বেগ পরিবর্তিত হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকিলে বেগের হ্রাসকে মন্দন বলা হয়।

সময়ের সাপেক্ষে কোন বস্তুর গতিবেগ বৃদ্ধির হারকে ত্বরণ বলে।

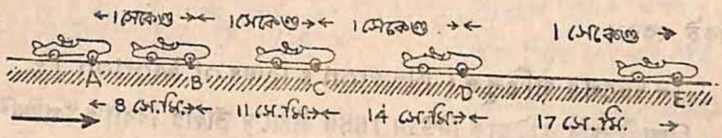
একটি বস্তুর কোন মুহূর্তে বেগ 10 সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে, 5 সেকেণ্ড পরে হইল 20 সে. মি প্রতি সেকেণ্ডে। আরও 5 সেকেণ্ডে পরে বস্তুটির বেগ হইল 30 সে. মি প্রতি সেকেণ্ডে। এক্ষেত্রে প্রতি 5 সেকেণ্ডে বস্তুটির বেগ 10 সে. মি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বস্তুটির বেগ পরিবর্তনের হার প্রতি সেকেণ্ডে $\frac{10}{5}=2$ সে. মি প্রতি সেকেণ্ডে। ইহাই বস্তুটির ত্বরণ। 'প্রতিসেকেণ্ড' কথাটি বস্তুটির 'বেগ' বুঝাইবার জন্য দুইবার ব্যবহার করা হয়। এই কারণে ত্বরনের একক প্রকাশে প্রতি সেকেণ্ড প্রতি সেকেণ্ড বা প্রতি বর্গ সেকেণ্ড কথা ব্যবহার করা হয়।

ত্বরণের একক ঃ

সি. জি. এস্ পদ্ধতি	এফ. পি. এস্ পদ্ধতি
সি. জি. এস পদ্ধতিতে ত্বরণের একক এক সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ড প্রতি সেকেণ্ড বা এক সেন্টিমিটার প্রতি বর্গ সেকেণ্ড।	এফ. পি. এস পদ্ধতিতে ত্বরণের একক হইল এক ফুট প্রতি সেকেণ্ড প্রতি সেকেণ্ড বা একফুট প্রতি বর্গ সেকেণ্ড।

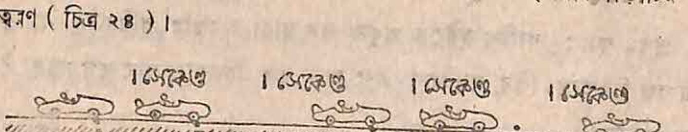
বেগের ন্যায় ত্বরণ সম হইতে পারে আবার অসমও হইতে পারে।

সমান সমান সময়ে কোন বস্তুর বেগের পরিবর্তন সমান সমান হইলে ত্বরণকে সমত্বরণ বলা হয়। আবার সমান সমান সময়ে কোন বস্তুর বেগের পরিবর্তন সমান সমান না হইলে ত্বরণকে অসম ত্বরণ বলা হয়।



চিত্র-২৪

একটি গাড়ীর এক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর বিভিন্ন অবস্থান হইল A, B, C, D, E। প্রথম সেকেণ্ডে গাড়ীটি 8 সেন্টিমিটার যায়, দ্বিতীয় সেকেণ্ডে 11 সে. মি. তৃতীয় সেকেণ্ডে 14 সে. মি. এবং চতুর্থ সেকেণ্ডে 17 সে. মি। এক্ষেত্রে গাড়ীটির প্রতি সেকেণ্ডে বেগ পরিবর্তন হইয়াছে 3 সে. মি. প্রতি সেকেণ্ডে। অর্থাৎ গাড়ীটির ত্বরণ সমান সমান সময়ে সমান সমান হয়। সুতরাং গাড়ীটির ত্বরণ সম-ত্বরণ (চিত্র ২৪)।



চিত্র-২৫

আবার (২৫ নম্বর) চিত্রে একটি গাড়ীর ত্বরণ সমান সমান সময়ে অসমান। সুতরাং এক্ষেত্রে গাড়ীটির ত্বরণ অসম-ত্বরণ।

সময়ের সাপেক্ষে কোন বস্তুর গতিবেগ হ্রাসের হারকে মন্দন বলে।

একটি ট্রেন কোন স্টেশনের কাছে আসিলে উহার বেগ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে এবং শেষে ট্রেনটি স্থির হইয়া স্টেশনে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে ট্রেনটির মন্দন বা ঋণ-ত্বরণ হয়।

একটি বস্তুর কোন মুহূর্তে বেগ হইল সেকেণ্ডে 20 সে. মি.। 2 সেকেণ্ড পরে উহার বেগ হইল সেকেণ্ডে 16 সে. মি. এবং আরও 2 সেকেণ্ড পরে উহার বেগ হ্রাস পাইয়া সেকেণ্ডে 12 সে. মি. হইল। এক্ষেত্রে প্রতি 2 সেকেণ্ড অন্তর অন্তর বস্তুটির বেগ 4 সে. মি. করিয়া হ্রাস পাইল। সুতরাং বস্তুটির বেগ হ্রাসের হার হইল $\frac{4}{2}=2$ সে. মি. প্রতি সেকেণ্ডে। অর্থাৎ বস্তুটির মন্দন হইল 2 সে. মি. প্রতি সেকেণ্ড।

সি. জি. এস এবং এফ. পি. এস পদ্ধতিতে ত্বরণের যে একক মন্দনেরও একই একক।

নিউটনের গতিসূত্র (Newton's laws of Motion) ঃ

বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন 1686 খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থে, বস্তুর গতি সম্পর্কে তিনটি মূল্যবান সূত্র প্রকাশ করেন। প্রথম সূত্র দুইটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তৃতীয় সূত্রটি নিউটনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী হুক, হেগেনস এবং রেণ জানিতেন, কিন্তু নিউটনই সর্বপ্রথম ঐ সূত্রগুলিকে সুস্পষ্ট ভাবে উপস্থাপিত করেন বলিয়া পরবর্তী কাল হইতে এই তিনটি সূত্র নিউটনের গতিসূত্র বলিয়া পরিচিত।

নিউটনের গতিসূত্রাবলী ঃ

প্রথম সূত্র ঃ বাহির হইতে প্রযুক্ত বল দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন না করিলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকিবে এবং সচল বস্তু চিরকাল সমবেগে সরল রৈখিক পথে চলিবে।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যে দিকে প্রযুক্ত হয় ভরবেগের পরিবর্তনও সেই দিকে ঘটে।

তৃতীয় সূত্র ঃ প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

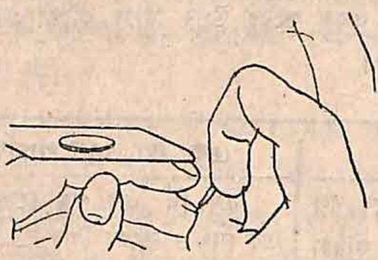
নিউটনের গতিসূত্রাবলীর ব্যাখ্যা ঃ

প্রথম সূত্র ঃ এই সূত্র হইতে জড় পদার্থের একটি প্রধান ধর্ম জানা যায়। জড় পদার্থের নিজস্ব কোন উদ্যোগ নাই। ইহা স্থির থাকিলে, সর্বদাই স্থির

থাকিবে, আবার সরল রৈখিক পথে সমগতি সম্পন্ন হইলে ঐ গতিতেই উহা চলিতে থাকিবে। এই ধর্মকেই পদার্থের জাড্য বলা হয়। স্থির বস্তুর স্থির থাকিবার ধর্মকে স্থিতি জাড্য এবং সরলরৈখিক পথে কোন গতিশীল বস্তুর সমগতি সম্পন্ন থাকিবার ধর্মকে গতি-জাড্য বলা হয়।

স্থিতি জাড্যের উদাহরণ ঃ

(ক) হাতের উপর উপর একটি শক্ত কার্ড বোর্ড রাখিয়া একটি মুদ্রা কার্ড বোর্ডের উপর রাখা হইল। এখন অঙ্গুল দিয়া মুদ্রার উপর টোকা মারিলে মুদ্রাটিকে হাতের মধ্যে পড়িতে দেখা যাইবে। ইহা স্থিতি জাড্যের একটি উদাহরণ। হঠাৎ আঘাত পাইয়া কার্ড বোর্ডেটি এত দ্রুত সরিয়া যায় যে মুদ্রাটির স্থিতি জাড্য নষ্ট হয় না। সুতরাং স্থির মুদ্রা পরেও স্থির থাকে ও নীচে কোন অবলম্বন না থাকায় উহা হাতে পড়ে।



চিত্র-২৬

(খ) হঠাৎ গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে আরোহীর দেহের নিম্নভাগ গাড়ির গতি লাভ করে, কিন্তু দেহের উপর ভাগ স্থিতি জাড্যের জন্য স্থির থাকিবার চেষ্টা করে। সুতরাং আরোহী পিছন দিকে হেলিয়া পড়ে (চিত্র ২৬)।

গতিজাড্যের উদাহরণ ঃ

(ক) একটি চলন্ত গাড়িতে বসিয়া থাকিলে আরোহীর সমস্ত দেহ গতিশীল হয়। চলন্ত গাড়ি হইতে নামিলে আরোহীর দুই পা মাটির সংস্পর্শে আসিয়া গতিহীন হয় কিন্তু দেহের উপরের অংশ গতিজাড্যের জন্য সামনের দিকে আগাইয়া যায় ইহার ফলে আরোহী গতির দিকে আছাড় খায়। সামনের দিকের ধাক্কা সামলাইবার জন্য অরোহীকে পিছন দিকে ঝুঁকিতে হয়।

(খ) সার্কাসে বৃত্তাকার পথে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ হইতে খেলোয়াড় উপরের দিকে লাফ দিয়া আবার ঘোড়ার পিঠে ফিরিয়া আসিয়া বসে। ইহাও গতিজাড্যের একটি উদাহরণ।

বল ঃ প্রথম সূত্র হইতে দেখা যায় যে কোন বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে বাহির হইতে বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিতে হয়। স্থির বস্তুকে সচল

করিতে বা সচল বস্তুকে স্থির করিতে বা উহার গতির হার হ্রাস – বৃদ্ধি করিতে বাহির হইতে বল প্রয়োগ করা প্রয়োজন। চাপ, আকর্ষণ, বিকর্ষণ ইত্যাদি বলের উদাহরণ।

যাহা বাহির হইতে প্রয়োগ করিয়া বস্তুর স্থির অবস্থার বা গতিশীল অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় বা ঘটাইবার চেষ্টা করে তাহাকে 'বল' বলে।

বলের একক : যে বল একক ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া একক ত্বরণ উৎপন্ন করে তাহাই বলের একক।

সি. জি. এস পদ্ধতি	এফ. পি. এস পদ্ধতি
সি. জি. এস পদ্ধতিতে যে বল একগ্রাম ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া এক বর্গ সেকেণ্ডে এক সেন্টিমিটার ত্বরণ উৎপন্ন করে তাহাকে ডাইন বলে।	এফ. পি. এস পদ্ধতিতে যে বল এক পাউণ্ড ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া এক বর্গ সেকেণ্ডে এক ফুট ত্বরণ উৎপন্ন করে তাহাকে পাউণ্ডাল বলে।

দ্বিতীয় সূত্র : দ্বিতীয় সূত্রের সাহায্যে বলের মান নির্ণয় করা যায়। প্রযুক্ত বল ভর বেগের পরিবর্তন ঘটায়! 'বল' হইল কারণ এবং ভর বেগের পরিবর্তন হইল কার্য। কার্য দ্বারাই কারণের পরিমাপ করা হয়।

কোন বস্তুর ভর 'm' এবং বেগ 'v' হইলে বস্তুটির ভরবেগ হইবে mv।

একটি 3000 পাউণ্ড ওজনের গাড়ি যদি সেকেণ্ডে 50 ফুট বেগে চলে তাহা হইলে উহার ভরবেগ হইবে 3000×50 বা 150000 পাউণ্ড-ফুট-সেকেণ্ড।

দ্বিতীয় সূত্রানুয়ায়ী বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক। অর্থাৎ 1 সেকেণ্ডে ভরবেগের যে পরিবর্তন হয় তাহার দ্বারা প্রযুক্ত বলকে ভাগ করিলে একটি ধ্রুব রাশি পাওয়া যায়। অর্থাৎ বল যদি তিন-গুণ হয় তাহা হইলে ভরবেগের পরিবর্তনও প্রতি সেকেণ্ডে তিনগুণ হইবে।

তৃতীয় সূত্র : যদি M_1 বস্তু M_2 বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে তাহা হইলে M_2 বস্তু M_1 বস্তুর উপর বিপরীত দিকে সমান বল প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ সকল ক্রিয়ারই একটি সমান প্রতিক্রিয়া আছে। ক্রিয়া বলিতে ক্রিয়ার বল বুঝাইলে প্রতিক্রিয়ার অর্থেও প্রতিক্রিয়ার বল বুঝাইবে।

(ক) রকেটের ভিতর যে জ্বালানী থাকে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে রকেটের নীচের ছিদ্র দিয়া গ্যাস বাহির হয়। উহা ক্রিয়া। উহারই বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় রকেটটি উপরের দিকে দ্রুত উঠিয়া যায়।

(খ) একটি বলকে সুতাদ্বারা ঝুলাইলে বলের ওজন সুতাকে নীচের দিকে টানে, উহা ক্রিয়া। সুতা আবার বলকে উপরের দিকে টানে, উহা প্রতিক্রিয়া।

এই সকল তৃতীয় সূত্রের উদাহরণ।

প্রশ্ন উঠিতে পারে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত হইলে একটি আপেল ফল পৃথিবীর বুকে ছুটিয়া আসে কেন, পৃথিবী কেন আপেল ফলের দিকে ছুটিয়া যায় না।

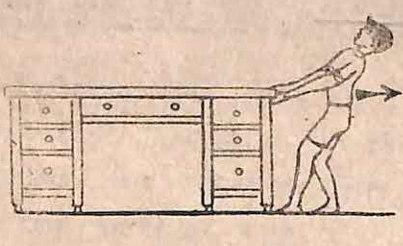
কারণ, আপেল ফল পৃথিবীকে যে বলে আকর্ষণ করে, পৃথিবীও আপেল ফলটিকে ঐ সমান বলে আকর্ষণ করে। ফলটির আকর্ষণ বল পৃথিবীর উপর প্রযুক্ত হয় কিন্তু পৃথিবীর ভর অনেক বেশী বলিয়া পৃথিবী নড়ে না বলিলেই হয়। পৃথিবীর আকর্ষণ বল আপেল ফলটির উপর ক্রিয়া করে। ফলটির ভর কম বলিয়া উহা বেশি গতি লাভ করে এবং পৃথিবীর বুকে ছুটিয়া আসে।

পঞ্চম অধ্যায়

কার্য ও সরল যন্ত্র

কার্য (work) : সাধারণভাবে কোন কিছু করাকেই কার্য বলা হয়। গরু গাড়ি টানে, কুলী মাল বহন করে, চাষী খেত-খামারে চাষ করে; মাঝি নৌকা চালায়। এই সকল ক্ষেত্রে গরু, কুলী, চাষী, মাঝি প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কার্য করিতেছে। দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এইরূপ নানাবিধ কার্যের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে কার্য বলিতে যাহা বুঝায় বিজ্ঞানের ভাষায় কার্য, কথাটির সংজ্ঞা তাহা হইতে পৃথক।

মাঠে ছেলেরা যখন ছোটাছুটি করে তখন উহাকে সাধারণভাবে কার্য বলা হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় এক প্রকার কার্য। আবার একজন লোক যদি একটি টেবিলকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার জন্য অনেক ক্ষণ সজোরে শক্তি ব্যয় করিয়াও টেবিলটিকে একটুও স্থানচ্যুত না করিতে পারে তাহা হইলে সাধারণভাবে বলা হইবে লোকটি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে কিন্তু বিজ্ঞানেয় ভাষায় বলিতে হইবে লোকটি কোন কার্যই করিল না (চিত্র-২৭)।



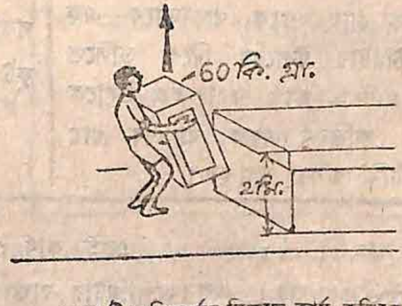
চিত্র-২৭

বিজ্ঞানের ভাষায় কোন বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল স্থির থাকিলে বস্তুর স্থানচ্যুতি যত বেশী হইবে কার্য ও তত বেশী হইবে। আবার স্থানচ্যুতির দূরত্ব স্থির থাকিলে প্রযুক্ত বল যত বেশী হইবে কার্যও তত বেশী হইবে। এই স্থানচ্যুতি প্রযুক্ত বলের অভিমুখে হইলে বল কর্তৃক কার্য করা হইয়াছে বলা হয় আবার স্থানচ্যুতি বিপরীত অভিমুখে হইলে ক্রিয়াশীল বলের বিরুদ্ধে কার্য করা হইয়াছে বলা হয়।

যখন গরু গাড়ী টানে। তখন গরু কর্তৃক প্রযুক্ত বলের অভিমুখে গাড়ির স্থানচ্যুতি ঘটে। এ ক্ষেত্রে বল কর্তৃক কার্য করা হইতেছে। কিন্তু ঘর্ষণ বলের

অভিমুখ, গাড়ির স্থানচ্যুতির অভিমুখের বিপরীত দিকে হয় বলিয়া সেক্ষেত্রে কার্য ঘর্ষণ বলের বিরুদ্ধে হইতেছে বলা হয়। একটি বস্তুকে অন্যকোন বস্তুর সংস্পর্শে রাখিয়া উহাদের মধ্যে একটি আপেক্ষিক গতিবেগ সৃষ্টির চেষ্টা করা হইলে দুইটি বস্তুর স্পর্শতলে ঘর্ষণ জনিত বল উৎপন্ন হয়। এই ঘর্ষণ জনিত বল প্রযুক্ত বলের বিপরীত দিকে কার্য করিয়া থাকে। কোন বস্তুকে নিম্নস্থান হইতে উচ্চস্থানে তুলিলে কিছু কার্য করা হইয়াছে বলা হয়। উচ্চতা যত বৃদ্ধি পাইবে কার্য ও তত বেশী হইবে। আবার উচ্চতাকে স্থির রাখিয়া বস্তুর ভর যত বৃদ্ধি করা হইবে কার্য ও তত বেশী হইবে। এক্ষেত্রে কার্য অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে হইয়া থাকে। পৃথিবী সকল বস্তুকে উহার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণকে অভিকর্ষ বলা হয়।

একটি তিন তলা বাড়ীর একতলা হইতে দোতালার উচ্চতা, দোতলা হইতে তিনতলার উচ্চতা সমান। এখন এক বাল্‌তি জল একতলা হইতে দোতলায় তুলিলে যে পরিমাণ কার্য করা হইবে ঐ এক বাল্‌তি জল একতলা হইতে তিন-তলায় তুলিলে উহার দ্বিগুণ পরিমাণ কার্য করা হইবে। আবার এক বাল্‌তি জলের পরিবর্তে যদি দুই বাল্‌তি জল দোতলায় তোলা হয় তাহা হইলে এক্ষেত্রেও প্রথমবারের তুলনায় দ্বিগুণ কার্য করা হইবে।



লোকটি অভিকর্ষের বিরুদ্ধে কার্য করিতেছে

সুতরাং কোন বস্তুকে নিম্নস্থান হইতে উচ্চস্থানে তুলিলে যে কার্য করা হয় তাহার পরিমাণ ঐ বস্তুর ওজন এবং উহা যত উচ্চতায় তুলিতে হইবে তাহার পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

অর্থাৎ, কার্য = প্রযুক্ত বল × বলের প্রয়োগবিন্দুর স্থানচ্যুতি।

কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিলে যদি বলের প্রয়োগ বিন্দুর স্থানচ্যুতি হয় তাহা হইলে প্রযুক্ত বল দ্বারা কার্য হইয়াছে বলা হয়।

কার্যের বিভিন্ন একক

সি. জি. এস পদ্ধতি	এফ. পি. এস পদ্ধতি
কার্যের পরম একক : প্রযুক্ত বল এক ডাইন এবং বলের দিকে বলের প্রয়োগবিন্দুর স্থানচ্যুতি এক সেন্টিমিটার হইলে সি, জি, এস পদ্ধতিতে কার্যের পরম একক এক ডাইন-সেন্টিমিটার বা এক আর্গ। কার্যের ব্যাবহারিক একক : সি. জি. এস পদ্ধতিতে কার্যের ব্যবহারিক একক হইল এক জুল বা একজুল $= 10^7$ আর্গ। কার্যের অভিকর্ষ একক : এক গ্রাম ভরকে খাড়াভাবে এক সেন্টিমিটার উপরের দিকে তুলিতে যে পরিমাণ কার্য করা হয় উহাকে এক অভিকর্ষ একক বা এক গ্রাম সেন্টিমিটার কার্য বলা হয়।	প্রযুক্ত বল এক পাউণ্ডাল এবং বলের দিকে বলের প্রয়োগবিন্দুর স্থানচ্যুতি এক ফুট হইলে এফ, পি, এস পদ্ধতিতে কার্যের পরম একক এক ফুট পাউণ্ডাল। এফ, পি, এস পদ্ধতিতে কার্যের ব্যবহারিক একক এক ফুট পাউণ্ড এবং এক ফুট পাউণ্ড $= 32$ ফুট পাউণ্ডাল। এক পাউণ্ড ভরকে খাড়াভাবে এক ফুট উপরের দিকে তুলিতে যে পরিমাণ কার্য করা হয় তাহাকে এফ. পি. এস পদ্ধতিতে এক অভিকর্ষ একক বা এক ফুট পাউণ্ড কার্য বলা হয়।

ক্ষমতা (power) : একই কার্য বেশী সময়ে করা যায় আবার কম সময়েও করা যায়। এক কিলোমিটার রাস্তা ধীরে ধীরে হাটিয়া গেলে এক ঘণ্টায় ও যাওয়া যায় আবার দৌড়াইয়া গেলে দশ মিনিটেও যাওয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রে সমান কার্য করা হইয়া থাকে কিন্তু এই দুই প্রকার কার্যের মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে। এই প্রভেদ হইল ক্ষমতার। একই কার্য যে কম সময়ে করিতে পারে তাহার কার্য করিবার ক্ষমতা বেশী। একটি ছেলে একখানি বইয়ের একশত পৃষ্ঠা এক ঘণ্টা সময়ে পড়িতে পারে। আবার অপর একটি ছেলে ঐ বইয়ের পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ঐ সময়ে পড়িতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথম ছেলেটির পড়িবার ক্ষমতা দ্বিতীয় ছেলেটি অপেক্ষা বেশি।

$$\text{সুতরাং,}\quad \text{ক্ষমতা} = \frac{\text{কার্য}}{\text{সময়}}$$

$$= \frac{\text{বল} \times \text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$$

কার্য করিবার সময়ের হারকে 'ক্ষমতা' বলে। এক সেকেণ্ডে যে পরিমাণ কার্য করা হয় তাহাই হইল ক্ষমতার পরিমাণ।

ক্ষমতার বিভিন্ন একক

সি. জি. এস পদ্ধতি	এফ. পি. এস পদ্ধতি
চরম একক : যে এক সেকেণ্ড সময়ে এক আর্গ কার্য করিতে পারে তাহার ক্ষমতাকে সি. জি এস পদ্ধতিতে একক ধরা হয়। অর্থাৎ সি. জি. এস পদ্ধতিতে ক্ষমতার চরম একক এক আর্গ প্রতি সেকেণ্ডে।	যে এক সেকেণ্ড সময়ে এক ফুট পাউণ্ডাল কার্য করিতে পারে তাহার ক্ষমতাকে এফ. পি. এস পদ্ধতিতে একক ধরা হয়। অর্থাৎ এফ. পি. এস পদ্ধতিতে ক্ষমতার চরম একক এক ফুট পাউণ্ডাল প্রতি সেকেণ্ডে।
ব্যবহারিক একক : এক সেকেণ্ডে এক জুলের কার্য করিবার ক্ষমতাকে সি. জি. এস পদ্ধতিতে ওয়াট বলা হয়। ইহার বড় একক হইল কিলোওয়াট।	প্রতিসেকেণ্ডে 550 ফুট পাউণ্ডাল কার্য করিবার ক্ষমতাকে হর্স পাওয়ার বা অশ্বক্ষমতা বলা হয়। ইহা এফ. পি. এস পদ্ধতির একটি ব্যবহারিক একক।
1 ওয়াট = **1**জুল প্রতিসেকেণ্ডে = 10^7 প্রতিসেকেণ্ডে **1** কিলোওয়াট = **1000** ওয়াট	**1** অশ্বক্ষমতা = **550** ফুট পাউণ্ড প্রতিসেকেণ্ডে

শক্তি (Energy) : প্রচণ্ড গরম পড়িয়াছে। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। মেঘগর্জন হইতেছে। এক্ষেত্রে গরম, বিদ্যুৎ চমকানো, মেঘগর্জনের শব্দ ইহারা পদার্থ নহে। ইহারাই শক্তির বিভিন্ন রূপ। শক্তির হ্রাসও নাই বৃদ্ধি ও নাই। ইহার সৃষ্টি ও নাই ধ্বংস ও নাই। কেবলমাত্র শক্তির রূপের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। একখানা ইট উপরে তোলা হইল। ইটখানাকে উপরে তুলিবার জন্য যে শক্তি ব্যয় করা হইল তাহার বিনাশ হইল না উহা ইটখানা সঞ্চয় করিয়া রাখিল। কোন সময়ে ইটখানা উপর হইতে নীচে পড়িলে উহা কিছু কার্য করিবে। এই কার্য করাইবার পিছনে রহিয়াছে উহার সঞ্চিত শক্তি। মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতির কার্য করিবার সামর্থ্য আছে। সুতরাং উহাদের শক্তি আছে। কার্য করিবার সামর্থ্য বা যাহা দ্বারা কোন পদার্থের মধ্যে কোন পরিবর্তন সংঘটিত করা যায় তাহাই শক্তি। কার্য করিবার সামর্থ্য দ্বারাই শক্তির পরিমাপ করা হইয়া থাকে। কোন বিষয়ে, কত শক্তি ব্যয় হইয়াছে বা সঞ্চিত হইয়াছে

তাহা জানিতে হইলে কত পরিমাণ কার্য হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। সুতরাং কার্যের পরিমাণ হইতেই শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। এই কারণে কার্যের একক দ্বারাই শক্তির পরিমাণ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ইহার পরিমাপের জন্য কোন এককের প্রয়োজন নাই।

বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে বিভিন্ন কলকারখানা চালানো হইতেছে। তাপ শক্তির সাহায্যে স্টীম ইঞ্জিন চলিতেছে। তৈলের রাসায়নিক শক্তির সাহায্যে মোটর গাড়ি, এরোপ্লেন প্রভৃতি চলিতেছে। এইভাবে শক্তি বিভিন্ন রূপে বিরাজিত হইয়া এক শক্তি হইতে আবার অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

শক্তির এই বিভিন্ন রূপকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) যান্ত্রিকশক্তি (২) আলোক শক্তি (৩) তাপ শক্তি (৪) শব্দশক্তি (৫) চুম্বক শক্তি (৬) বিদ্যুৎ শক্তি (৭) রাসায়নিক শক্তি।

যান্ত্রিক শক্তি আবার দুইরূপে প্রকাশিতঃ (ক) স্থিতি শক্তি (খ) গতিশক্তি।

স্থিতিশক্তি ঃ কয়েকখানা ইট রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছে। আবার সেই রাস্তার পাশেই একটি বাড়ির ভাঙ্গা ছাদ হইতে একখানি ইট এমন ভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে যে যে কোন মুহূর্তে উহা পড়িতে পারে। পথচারীরা ঝুলন্ত ইট-খানাকে লক্ষ্য করিয়া সাবধানে পথ চলিবে। কারণ ঝুলন্ত ইটখানার নীচে পড়িয়া কার্য করিবার সামর্থ আছে, অর্থাৎ উহার শক্তিও আছে। রাস্তায় যে ইটগুলি পড়িয়া আছে উহাদের ঐরূপ কার্য করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং উহাদের শক্তিও নাই। রাস্তার ইটগুলিকে যদি উপরে তুলিয়া রাখা হয় তাহা হইলে উহাদের মধ্যে উপরে তোলার কার্য্যের জন্য ব্যয় করা শক্তি সঞ্চিত হইবে। শক্তি ব্যয় না করিয়া কোন পদার্থের অবস্থান পরিবর্তন করা যায় না। সুতরাং যে ইটগুলিকে উপরে তুলিবে তাহাকেই শক্তি ব্যয় করিয়া ঐ কার্য করিতে হইবে। সুতরাং ইটগুলিকে উপরে তুলিলেই উহাদের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত হয় উহার মূলে রহিয়াছে কোন ব্যক্তি বা যন্ত্রের কার্য। শক্তি ব্যয় করিয়া ঐ কার্য করিলে তবে ঐ ইটগুলিতে শক্তির সঞ্চার হইবে। যতক্ষণ ঐ ইটগুলি আবার নিচে না পড়িবে ততক্ষণ উহাদের মধ্যে ঐ শক্তি সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। সুদীর্ঘকাল পরে নিচে পড়িবার সময়ও উহাদের কার্য করিবার সামর্থ্য থাকিবে। ঝুলন্ত ইটখানাকে উপরে তোলা হইয়াছিল বলিয়া উহার মধ্যে শক্তি সঞ্চিত হইয়া আছে। এইরূপ সঞ্চিত শক্তিকেই স্থিতিশক্তি বলা হয়।

বল প্রয়োগ করিয়া কোন বস্তুকে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পরিবর্তন করিয়া অন্য অবস্থায় আনিলে সেই বস্তু কিছু শক্তি সঞ্চয় করে। বস্তুর স্থিতির জন্য সঞ্চিত এই শক্তিকে স্থিতিশক্তি বলা হয়।

গতিশক্তি: একটি কাঁচের জানালা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছোড়া হইল। বন্দুকের গুলি কাঁচ ভেদ করিয়া ছুটিয়া গেল। এক্ষেত্রে বন্দুকের গুলি কাঁচ ভেদ করিবার কার্য করিল। কিন্তু বন্দুকের গুলি বেগে ছুটিয়া না গেলে কাঁচ ভাঙিত না এবং ভেদ করিতে পারিত না। সুতরাং বন্দুকের গুলির কার্য করিবার সামর্থ্য জন্মিয়াছে উহার গতির জন্য। গতি না থাকিলে উহা কাজ করিতে পারিত না। গতির জন্য কাজ করিবার এই সামর্থ্যই হইল গতিশক্তি।

বস্তু স্থির অবস্থায় থাকিলে উহার কোন গতিশক্তি থাকে না। কিন্তু গতিশীল বস্তুর গতিশক্তি এবং স্থিতিশক্তি উভয়ই থাকিতে পারে। কোন বস্তু উপর হইতে নীচে পড়িবার সময় উহার স্থিতিশক্তি হ্রাস পাইতে থাকে এবং গতিশক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বস্তুর গতির জন্যই উহার গতিশক্তি। গতিশীল বস্তু স্থির হওয়া পর্যন্ত যে পরিমাণ কার্য করে উহাই হইল গতিশক্তির পরিমাণ।

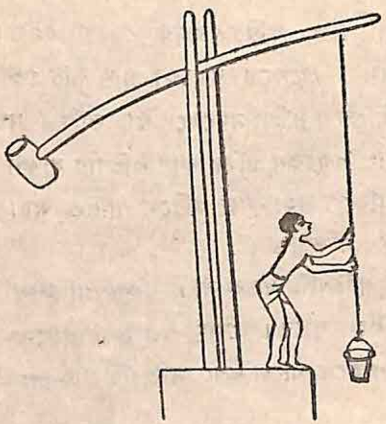
স্থিতিশক্তিকে গতিশক্তিতে পরিণত করা যায় এবং এই পরিবর্তনের জন্য কিছু পরিমাণ কার্য হইয়া থাকে।

একটি ঘড়িতে দম দেওয়া হইল। দম দেওয়ার ফলে স্প্রিং গুটাইয়া গেল। যে শক্তি ব্যয় করিয়া স্প্রিংকে গুটানো হইল উহাই স্প্রিং-এর মধ্যে স্থিতিশক্তি হিসাবে সঞ্চিত হইল। ইহাই ধীরে ধীরে গতিশক্তিতে পরিবর্তিত হইয়া ঘড়ি চালাইবে।

গতিশীল বস্তুর গতির জন্য উহার কার্য করিবার যে সামর্থ্য জন্মে তাহাকে গতিশক্তি বলে। ঐ গতিশীল বস্তুর বেগ নিঃশেষ হইয়া উহা স্থির অবস্থায় আসিবার পূর্বে উহা যে পরিমাণ কার্য করে উহাই ঐ বস্তুর গতিশক্তির পরিমাণ।

সরল যন্ত্র: প্রাচীনকালে মানুষ নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে সকল প্রকার কার্য করিত। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে যন্ত্রের আবিষ্কার হইল এবং মানুষ যন্ত্রের ব্যবহার শিখিল। নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে মানুষ যত বল প্রয়োগ করিতে পারিত, যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী

বল মানুষ উৎপন্ন করিতে এবং নিয়ন্ত্রণ করিতে শিখিল। যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে অল্পশ্রমে বহু কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হইতেছে। আজকাল ভারী ভারী বোঝাকে মাথায় করিয়া উপরে তুলিতে হয় না—কপিকল বা ক্রেনের সাহায্যে সহজে উহাদের উপরে তোলা বা স্থানান্তরিত করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে বেশী জমি চাষ করিবার জন্য ট্রাক্টরের ব্যবহার শুরু হইয়াছে। পাম্পের সাহায্যে বিরাট জলাভূমির জল সেচন করা হইতেছে। যন্ত্রের সাহায্যে এইরূপ নানা কার্য সহজে সম্পন্ন হইতেছে। বিজ্ঞানের ভাষায় যন্ত্র বলিতে সেই ব্যবস্থাকে বুঝায় যাহার দ্বারা সামান্য বল প্রয়োগ করিয়া অধিকতর বাধা অতিক্রম করা যায়।



পাতকুয়া হইতে জল উঠাইবার সরল যন্ত্র

এই যন্ত্রের সাহায্যে যে সুবিধা লাভ করা যায় তাহাকে যান্ত্রিক সুবিধা বলা হয়। ওজন ও চেষ্টার অনুপাতকে যান্ত্রিক সুবিধা বলে।

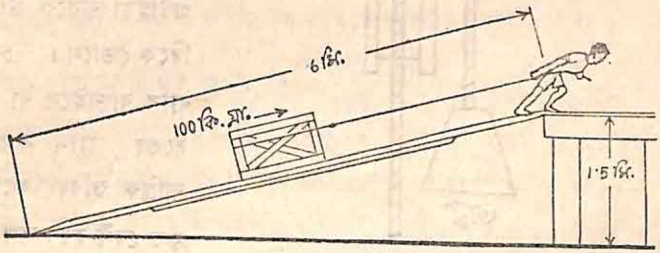
$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ওজন বা বাধা}}{\text{চেষ্টা}}$$

ইহা একটি সংখ্যা মাত্র। সাধারণতঃ যন্ত্রের গঠন প্রণালী জটিল। লিভার, নততল, কপিকল প্রভৃতি যন্ত্রকে সরল যন্ত্র বলা হয়। এই সকল সরল যন্ত্রের সাহায্যে অধিকাংশ জটিল যন্ত্র নির্মিত হইয়া থাকে।

নততল : কোন বাড়ির সিঁড়িগুলি যদি বেশী খাড়া হয় তাহা হইলে দোতলা বা তিনতলায় উঠিবার সময় বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু সিঁড়িগুলি যদি একটু বেশী কাত হয় তাহা হইলে আর তত কষ্ট হয় না। খাড়া পথে কোন পাহাড়ে উঠিবার তুলনায় ঢালু পথে উঠা অনেক সহজ। সেইজন্য কোন গাড়ি পাহাড়ে উঠিবার সময় খাড়া পথে না উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যতটা সম্ভব ঢালু পথে উঠিয়া থাকে। এই সকল উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে কোন বস্তুকে খাড়া উঁচু স্থানে উঠাইতে যত পরিশ্রম হয়, নততলে বা ঢালু পথে তুলিতে ততটা

কষ্ট হয় না। এই কারণে কুলিরা ভারী মাল লরিতে বা রেলের কামরায় তুলিবার জন্য একটি শক্ত কাঠের তক্তা কাত করিয়া ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া মালগুলি গড়াইয়া গড়াইয়া তুলিয়া থাকে। ইহাতে অনেক কম পরিশ্রম হয়। অতি-প্রাচীন কালে পুরীর মন্দির, কোণারকের মন্দির, মিশরের পিরামিড প্রভৃতি তৈয়ারীর সময় ভারী পাথরকে নততলের সাহায্যে উচ্চস্থানে তোলা হইত।

কোন কাঠের তক্তা বা অনুরূপ কোন সমতলকে ভূমির সহিত সূক্ষ্মকোণে কাত করিয়া রাখিলে তাহাকে নততল বলে।



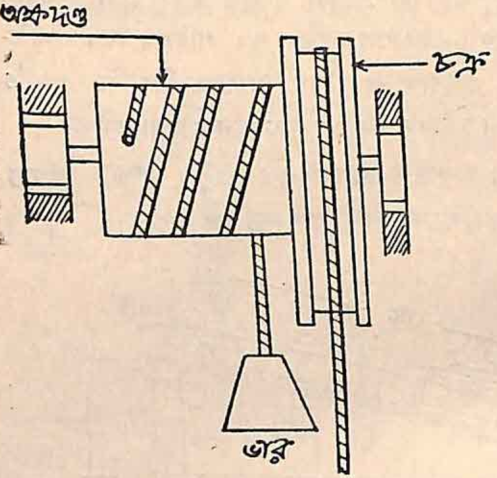
চিত্র-২৮

মনে করা যাউক, 100 কি. গ্রাম ওজনের ভারী একটি বস্তুকে 1·5 মিটার খাড়া উচ্চতায় তুলিতে হইবে। খাড়া ভাবে ঐ উচ্চতায় তুলিতে হইলে 100 কি. গ্রাম ওজনের সমান বল প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু 6 মিটার দৈর্ঘ্য একটি নততলের উপর দিয়া তুলিলে মাত্র 25 কি. গ্রাম ওজনের সমান বল প্রয়োগ করিয়া উহাকে 1·5 মিটার উচ্চতায় তোলা যাইবে (চিত্র-২৮)। কারণ নততলের যান্ত্রিক সুবিধা হইল, $\frac{\text{ওজন}}{\text{প্রযুক্ত বল}} = \frac{\text{নততলের দৈর্ঘ্য}}{\text{নততলের উচ্চতা}}$

চক্র ও অক্ষদণ্ড (Wheel and axle) :

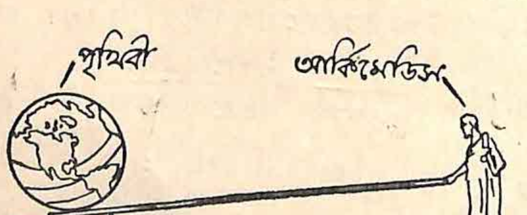
চক্র ও অক্ষদণ্ড আসলে অনুভূমিক ভাবে অবস্থিত একটি শকেটের উপর একটি পুলী ও একটি গোল স্তম্ভ পাশাপাশি যুক্ত করা দণ্ড। পুলীটির ব্যাস স্তম্ভের ব্যাস অপেক্ষা বৃহত্তর। পুলীটিকে চক্র এবং গোল স্তম্ভটিকে অক্ষ বলা হয়। শকেটটির দুই প্রান্ত বেয়ারিং-এর উপর অবস্থিত বলিয়া উভয়েই সহজে ঘুরিতে পারে। চক্র ও অক্ষদণ্ডের উপরে দুইটি দড়িকে বিপরীত ভাবে জড়ানো হইয়া থাকে। অক্ষদণ্ডের উপরে জড়ানো দড়িটির একটি প্রান্তকে ইহার সহিত আবদ্ধ করিয়া অপর প্রান্তে ভার ঝুলানো হয়। চক্রের উপর জড়ানো দড়িটির একটি প্রান্তকে

ইহার সহিত আবদ্ধ করিয়া দড়ির অপর প্রান্তে বল প্রয়োগ দ্বারা দড়িটিকে টানা হয়। চক্রের উপর খাঁজ কাটা থাকে বলিয়া দড়ি পিছলাইয়া যায় না। দড়িটিকে টানিলে চক্র ও অক্ষদণ্ড সহ ইহাদের শকেট ঘোরে। ইহার ফলে চক্রের দড়ি চক্র হইতে খুলিয়া আসে এবং অক্ষদণ্ডের দড়ি ইহার পরিধিতে গুটাইয়া ভারকে উপরের দিকে তোলে। চক্রের ব্যাস বাড়াইলে বা অক্ষদণ্ডের ব্যাস কমাইলে যান্ত্রিক সুবিধা অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। অক্ষদণ্ডের ব্যাসকে বেশী কমাইলে ভাজিবার আশঙ্কা থাকে। আবার চক্রের ব্যাসকে অতিরিক্ত বাড়াইলে উহা দ্বারা কার্য করিতে অসুবিধা হয় (চিত্র ২৯)।



চিত্র-২৯

লিভার: প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস বলিয়াছিলেন, একটি লিভারকে যদি অনেক বড় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এমন কোন ভারী জিনিস নাই



চিত্র-৩০

যাহা ঐ লিভারের সাহায্যে তুলিতে পারা যাইবে না। তিনি রাজাকে বলিয়াছিলেন—আমাকে দাঁড়াইবার একটু স্থান দিলে আমি সমস্ত পৃথিবীটাকে তুলিতে পারিব। অবশ্য আর্কিমিডিস জানিতেন যে লিভারের দণ্ডটি পৃথিবীর ভার বহন:করিবার মত শক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং পৃথিবীর বাহিরে যে স্থানে তিনি

দাঁড়াইবেন সে স্থান সম্পূর্ণ নিশ্চল হইতে হইবে। বাস্তব ক্ষেত্রে এই দুইটির কোনটিই সম্ভব নয় (চিত্র ৩০)।

লিভার একটি শক্ত সরল বা বক্রদণ্ড যাহা একটি স্থির বিন্দুর চারিদিকে ঘুরিতে পারে। স্থির বিন্দুকে আলম্ব বলা হয়। চেষ্টার দ্বারা বাধা অতিক্রম ইহার সাহায্যে করা যায় বলিয়া ইহা একটি সরল যন্ত্র। আলম্বের একই দিকে অথবা দুই দিকে দণ্ডের দুইটি বিন্দুতে একটি বল বা চেষ্টা এবং তাহার প্রতিরোধক বল বা বাধা প্রয়োগ করা হয়, ফলে দণ্ডটি বিপরীত দিকে ঘুরিতে চেষ্টা করে। আলম্ব বিন্দু হইতে বল ও বাধার লম্ব দূরত্বকে লিভারের বাহু বলা হয়।

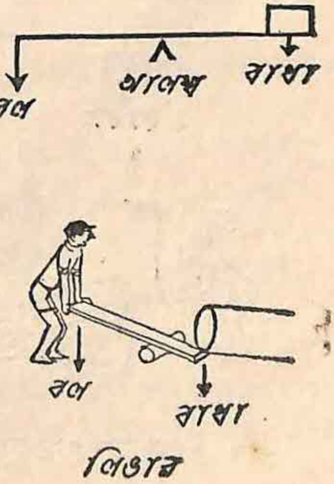
$$\text{লিভারের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{বাধা বা ওজন}}{\text{বল}} = \frac{\text{বল-বাহু}}{\text{রোধ বা ওজন বাহু}}$$

আলম্ব-বিন্দু, বল প্রয়োগের বিন্দু ও বাধা বা ওজন প্রয়োগের বিন্দুর আপেক্ষিক অবস্থান অনুসারে লিভার তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। যথা,—

(ক) প্রথম শ্রেণীর লিভার (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার (গ) তৃতীয় শ্রেণীর লিভার।

(ক) প্রথম শ্রেণীর লিভার ঃ

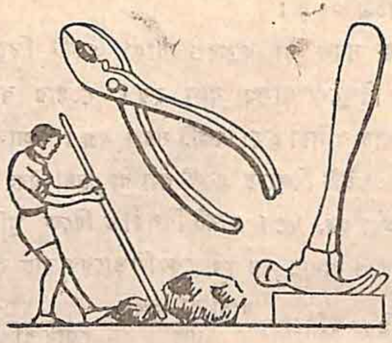
এই শ্রেণীর লিভারে বল এবং বাধা আলম্ব বিন্দুর বিপরীত দিকে থাকে। এই লিভারে সাধারণত দীর্ঘতর বাহু প্রান্তে বল প্রয়োগ করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর বাহু প্রান্তে বাধা বা বোঝা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বল হইতে আলম্ব বিন্দু পর্যন্ত লম্ব দূরত্ব হইল রোধ বা ওজন বাহু। বল-বাহু যদি রোধ-বাহুর সমান হয়, তাহা হইলে যান্ত্রিক সুবিধা বা অসুবিধা কিছুই হইবে না। বল-বাহু, রোধ-বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যাইবে না। কারণ বেশী বল প্রয়োগ করিয়া অপেক্ষাকৃত কম ভার বা ওজন তোলা যাইবে।



চিত্র-৩১

একমাত্র বল বাহু, রোধ-বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হইলেই যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যাইবে (চিত্র ৩১)।

তুলাদণ্ড, শাবল, পেরেক তুলিবার হাতুড়ি, সাড়াশী মাটিকাটার

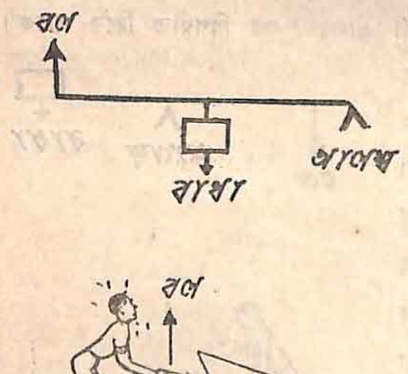


চিত্র-৩২

কোদাল প্রভৃতি প্রথম শ্রেণী লিভারের উদাহরণ (চিত্র ৩২)।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার ঃ

এই শ্রেণীর লিভারের দণ্ডের এক প্রান্তে আলম্ব থাকে এবং অপর প্রান্তে বল প্রয়োগ করা হয়। দণ্ডের মধ্যবর্তী যে কোন বিন্দুতে বাধা বা রোধ থাকে। সুতরাং এই শ্রেণীর লিভারে আলম্ব বিন্দু হইতে বল প্রয়োগ করিবার স্থানের দূরত্ব বাধা বা বোঝার দূরত্ব অপেক্ষা বেশী। বাধা বা বোঝা আলম্বের যত কাছে থাকিবে যান্ত্রিক সুবিধা তত বেশী হইবে। এক্ষেত্রে যেহেতু বল-বাহু সর্বদা রোধ-বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর সেই কারণে সর্বদা যান্ত্রিক সুবিধা থাকে (চিত্র ৩৩)।



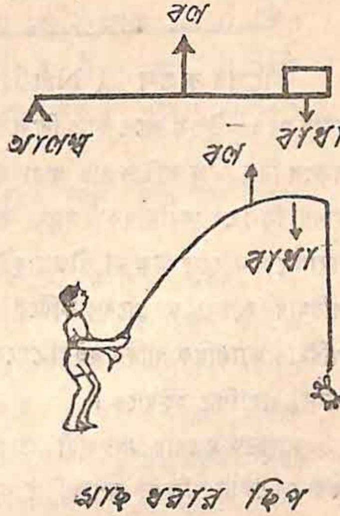
এক চাকার হাতগাড়ী

চিত্র-৩৩

এক চাকার হাতগাড়ি, চলন্ত নৌকার দাঁড়, যাঁতি, পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া দাঁড়ানো, ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর লিভার ঃ

এই শ্রেণীর লিভারের দণ্ডের এক প্রান্তে আলম্ব এবং অপর প্রান্তে বাধা বা ওজন থাকে। দণ্ডের দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী যে কোন বিন্দুতে বলপ্রয়োগ করা হয়। সুতরাং এই শ্রেণীর লিভারে আলম্ব বিন্দু হইতে বোঝার দূরত্ব বল প্রয়োগের স্থানের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী। তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের ক্ষেত্রে যেহেতু রোধ-বাহু সর্বদাই বল-বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর সেই কারণে এই লিভারে কোন যান্ত্রিক সুবিধা লাভ করা যায় না। ইহাতে সর্বদাই যান্ত্রিক অসুবিধা থাকে। যান্ত্রিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর লিভার ব্যবহার করা হইয়া থাকে।



চিত্র ৩৪

চিমটা, ছুরি, মাছ ধরার ছিপ, মানুষের বাহু প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ (চিত্র ৩৪)।

অল্প বল প্রয়োগ করিয়া ভারী জিনিস তুলিবার জন্য কখন কখন কয়েকটি



চিত্র ৩৫ মানুষের শরীর একটা সম্মিলিত লিভার

লিভারের সমন্বয়ে একটি সম্মিলিত লিভার তৈয়ারী করা হয়। রেলওয়ে প্ল্যাটফরমে ভারী বস্তু ওজন করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, উহা সম্মিলিত লিভারের উদাহরণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাপের স্বরূপ

তাপের স্বরূপ (Nature of heat): বরফে হাত দিলে শীতল বোধ হয়। উত্তপ্ত জলে হাত দিলে উষ্ণ বোধ হয়। শীতল ও উষ্ণের পার্থক্য সকলে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকে। প্রাচীন লোকের ধারণা ছিল যে 'ক্যালরিক' নামে একপ্রকার অদৃশ্য ভারহীন তরল বা বায়বীয় পদার্থ কোন বস্তুর উষ্ণ বা শীতল হইবার কারণ। অর্থাৎ কোন বস্তুতে কিছু পরিমাণ ক্যালরিক প্রবেশ করিলে বস্তু উষ্ণ হয়, আবার কোন বস্তু হইতে কিছু পরিমাণ ক্যালরিক বাহির হইয়া গেলে বস্তুটি শীতল হয় কিন্তু এই ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী তাপ শক্তির একটি রূপমাত্র। তাপশক্তিকে অন্য যে কোন শক্তিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। আবার অন্য যে কোন শক্তিকেও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। আদিম মানুষ পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করিয়া আগুন জ্বালাইত। পাথরে পাথরে ঘর্ষণের ফলে যান্ত্রিক শক্তি তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কয়লা পোড়াইলে রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত তাপশক্তির সাহায্যে জল উত্তপ্ত করিয়া বাষ্পে পরিণত করা হয়, এবং এই বাষ্পের সাহায্যে রেলগাড়ী চালানো হয়। ইহা তাপশক্তির যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের একটি উদাহরণ। এইরূপ নানা উদাহরণের সাহায্যে দেখানো যায় যে, তাপ শক্তির একটি রূপ ছাড়া আর কিছুই নহে। পদার্থের কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় সকল অবস্থা সম্বন্ধে এই মতবাদ প্রযোজ্য।

পদার্থের গতির মতবাদ অনুযায়ী কোন বস্তু যে সকল 'অণু' দ্বারা গঠিত তাহাদের অবিরাম গতিই তাপশক্তির মূলকারণ। কোন বস্তু অধিকতর উষ্ণ হইলে বুঝিতে হইবে যে অণুগুলির গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। গতি বৃদ্ধির জন্য গতি-শক্তির বৃদ্ধি হয় বলিয়া গ্যাসীয় পদার্থের চাপও বৃদ্ধি পাইবে। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, কোন গ্যাসীয় পদার্থের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে উহার চাপও বৃদ্ধি পায়। কোন বস্তু শীতল হইলে উহার অণুগুলির গতিশক্তিও হ্রাস পায়। এই কারণে বলা যাইতে পারে যে অণুগুলির গতিই কোন বস্তুর তাপশক্তির প্রকৃত কারণ।

সুতরাং কোন বস্তুর তাপকে এবং ঐ বস্তুর অণুগুলির গতিকে এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

তাপ (Heat): কোন বস্তুর উষ্ণতা বা শীতলতার বাহ্যিক কারণ হইল তাপ। কোন বস্তুর আকার বা আয়তনের মত তাপের কোন আকার বা আয়তন নাই। গন্ধ, বর্ণ প্রভৃতি দ্বারাও তাপকে বুঝিবার উপায় নাই। কোন বস্তুর মাধ্যমে বুঝিতে হয়। আসলে উষ্ণ বা শীতল বস্তু বলিয়া কিছুই নাই। একই বস্তুতে তাপশক্তি প্রবেশ করিলে বস্তুটি উষ্ণ হয়, আবার তাপশক্তি বাহির হইয়া আসিলে বস্তুটি শীতল হয়।

তাপ এক প্রকার শক্তি যাহা গ্রহণে বস্তু উষ্ণ হয় এবং বর্জনে বস্তু শীতল হয়।

তাপমাত্রা (Temperature): বরফে হাত দিলে শীতল বোধ হয়, আবার ফুটন্ত জলে হাত দিলে উষ্ণ বোধ হয়। কোন বস্তু শীতল কি উষ্ণ এই অনুভূতিকে বস্তুর তাপমাত্রা বলা হয়। সুতরাং তাপমাত্রা হইল বস্তুর তাপীয় অবস্থার পরিমাপ। একটি লোহার বলকে উত্তপ্ত করিয়া যদি এক বালতি শীতল জলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে যে বাল্‌তির শীতল জল পূর্বের তুলনায় বেশী উষ্ণ হইয়াছে। কিন্তু বলটি পূর্বের তুলনায় শীতল হইয়াছে, কারণ উত্তপ্ত বল শীতল জলে কিছু পরিমাণ তাপ বর্জন করিয়া শীতল হইয়াছে এবং শীতল জল ঐ তাপ গ্রহণ করিয়া পূর্বাপেক্ষা বেশী উষ্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ তাপ অধিক উষ্ণতা বিশিষ্ট বস্তু হইতে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতা বিশিষ্ট বস্তুর দিকে প্রবাহিত হয়। যে বস্তু অধিক উষ্ণ তাহার তাপমাত্রা অধিক বলা হয়। সুতরাং তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকিলেও উহারা এক নহে। তাপ উহার কারণ এবং তাপমাত্রা উহার ফল।

তাপমাত্রা বস্তুর এমন এক জাতীয় অবস্থা যাহা বস্তুটি অন্য বস্তু হইতে তাপ গ্রহণ করিবে কিংবা অন্য বস্তুকে তাপ প্রদান করিবে তাহা নির্ধারণ করে।

তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য:

(১) তাপ একপ্রকার শক্তি, কিন্তু তাপমাত্রা বস্তুর এক বিশেষ তাপীয় অবস্থা।

(২) সাধারণতঃ যখন কোন বস্তু তাপ গ্রহণ করে তখন উহার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, আবার তাপ বর্জন করিলে উহার তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সুতরাং তাপ হইল কারণ এবং তাপমাত্রা উহার ফল।

(৩) জলের প্রবাহ সর্বদা উচ্চ হইতে নিম্নস্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ জল-প্রবাহ জলের তলের উপর নির্ভর করে, জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। সেইরূপ তাপের প্রবাহ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে, তাপের পরিমাণের উপরে করে না। যেমন এক বাল্‌তি উষ্ণ জলের তাপমাত্রা এক চামচ ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা অপেক্ষা কম হইলেও মোট তাপের পরিমাণ বাল্‌তির জলেরই বেশী। চামচের জল এবং বাল্‌তির জল একত্রে মিশ্রিত করিলে চামচের জল বাল্‌তির জলকে তাপ প্রদান করিবে। সুতরাং জল ও তাপের সম্পর্ক হইতে দেখা যায় যে, কিছু পরিমাণ জলের সহিত উহার তলের যেইরূপ পার্থক্য,—তাপের সহিত তাপমাত্রারও সেইরূপ পার্থক্য।

(৪) দুইটি বস্তুর তাপমাত্রা এক হইলেও উহাদের তাপের পরিমাণ বিভিন্ন হইতে পারে। আবার দুইটি বস্তুতে সমপরিমাণ তাপ থাকিলেও উহাদের তাপমাত্রা সমান নাও হইতে পারে।

তাপমানযন্ত্র (Thermometer) : স্পর্শানুভূতি দ্বারা কোন বস্তুর তাপীয় অবস্থা বা তাপমাত্রা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। কোন বস্তু গরম কিংবা ঠাণ্ডা তাহা স্পর্শ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিচার করা হয়। কোন লোক তাহার ডান হাত গরম জলে এবং বাম হাত ঠাণ্ডা জলে রাখিল। পরে উভয় হাতই তুলিয়া উষ্ণ জলে রাখিল। এই জল ডান হাতে ঠাণ্ডা এবং বাম হাতে গরম বলিয়া বোধ হইবে। একটুকরা কাঠ ও একটি ধাতুখণ্ডের তাপমাত্রা এক হওয়া সত্ত্বেও হাত দিয়া স্পর্শ করিলে ধাতু খণ্ডটিকে কাঠের টুকরা অপেক্ষা বেশী ঠাণ্ডা মনে হইবে। সুতরাং স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাপমাত্রার বিচার নির্ভুল ভাবে করা সম্ভব নহে। তাপমাত্রার সূক্ষ্ম পরিমাপও স্পর্শ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে করা যায় না। ইহার জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন।

যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুর তাপমাত্রা নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায়, তাহাকে তাপমান যন্ত্র বলে।

তাপমান যন্ত্র নানাপ্রকার হইতে পারে। অল্প তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য যে তাপমান যন্ত্র ব্যবহার হয়, উহাতে পারদ ব্যবহার করে বলিয়া ইহাকে পারদ তাপমান যন্ত্র বলা হয়। একটি সমান ব্যাসের সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট শক্ত কাঁচনলের একপ্রান্তে একটি চোঙাকৃতি কুণ্ড থাকে। কুণ্ডটি পারদ দ্বারা পূর্ণ থাকে। পারদপূর্ণ নলটির গায়ে দাগ কাটা থাকে। কুণ্ড মধ্যস্থিত পারদের প্রসারণের দ্বারা তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়।

স্থিরাঙ্ক : তাপমাত্রা পরিমাপ করিবার জন্য কোন স্কেল তৈয়ারী করিতে হইলে দুইটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পারদ কাঁচনলের যে দুইটি স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়ায় প্রথমে তাহা নির্ধারণ করিতে হয়। এই দুইটি নির্ধারিত স্থানকে তাপমান যন্ত্রের স্থিরাঙ্ক বলা হয়। সুতরাং স্থিরাঙ্ক বলিতে নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে বুঝায়।

নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা হিমাঙ্ক : বিশুদ্ধ বরফ যে উষ্ণতায় গলে বা জল যে উষ্ণতায় জমিয়া বরফ হয় তাহাকে নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা হিমাঙ্ক বলে।

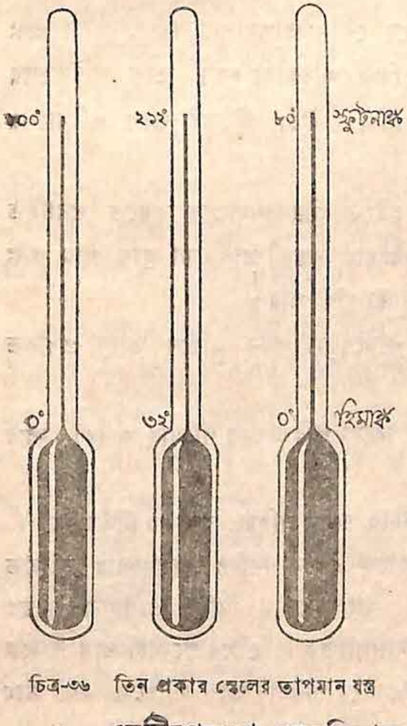
উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক : স্বাভাবিক বায়ুর চাপে (76 সে. মিটার) বিশুদ্ধ জল যে তাপমাত্রায় ফুটিতে থাকে তাহাকে উর্ধ্বস্থিরাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক বলা হয়।

তাপমাত্রার স্কেল : স্থিরাঙ্ক দুইটি নির্ণয় করিবার পর উহাদের মধ্যবর্তী স্থানকে কয়েকটি সমান অংশে বিভক্ত করিয়া স্কেল তৈয়ারী করা হয়। স্থিরাঙ্ক দুইটির মধ্যবর্তী তাপমাত্রার ব্যবধানকে প্রাথমিক অন্তর বলা হয়। স্কেল অনুসারে তাপমান যন্ত্র সাধারণত তিন রকমের। (চিত্র ৩৬) যথা,—

(১) সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস
(২) ফারেণহাইট
(৩) রোমার

তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য আমাদের দেশে প্রধানত সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস এবং ফারেণহাইট স্কেলের প্রচলন আছে।

ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলে রোমার তাপমান স্কেলের প্রচলন আছে।



চিত্র-৩৬ তিন প্রকার স্কেলের তাপমান যন্ত্র

(১) **সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস :** এই স্কেল অনুযায়ী নিম্নস্থিরাঙ্ককে 0 ডিগ্রী এবং উর্ধ্বস্থিরাঙ্ককে 100 ডিগ্রী ধরিয়া মধ্যবর্তী অংশকে সমান 100

ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা এক ডিগ্রী সেলসিয়াস বলা হয়। সুইডিস জ্যোতির্বিদ অ্যানড্রেস সেলসিয়াস এই থার্মোমিটার নির্মাণ করেন বলিয়া আজকাল সেন্টিগ্রেড না বলিয়া সেলসিয়াস বলা হয়।

(২) **ফারেণহাইট :** এই স্কেল অনুযায়ী নিম্নস্থিরাঙ্ককে 32 ডিগ্রী এবং উর্ধ্বস্থিরাঙ্ককে 212 ডিগ্রী ধরিয়া মধ্যবর্তী অংশকে সমান 180 ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রী ফারেণহাইট বলা হয়।

(৩) **রোমার :** এই স্কেল অনুযায়ী নিম্নস্থিরাঙ্ককে 0 ডিগ্রী এবং উর্ধ্বস্থিরাঙ্ককে 80 ডিগ্রী ধরিয়া মধ্যবর্তী অংশকে সমান 80 ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রী রোমার বলা হয়।

তাপের পরিমাণ নির্ণয় যে সকল কারণের উপর নির্ভরশীল (Factors determining the quantities of heat.) :

তাপ-শক্তি পরিমাপ করা যায়। যে কোন তাপমাত্রায় কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় সকল প্রকার পদার্থ এই তাপশক্তির অধিকারী হয়। তাপ পরিমাপের বিভিন্ন এককের একটি একক হইল ক্যালরি। ইহা হইতেই তাপ পরিমাপের বিষয়ের নাম ক্যালরিমিতি হইয়াছে।

তাপ সর্বদা উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু হইতে নিম্নতাপমাত্রার বস্তুতে প্রবাহিত হয়। তাপ বর্জনের ফলে উচ্চ তাপমাত্রার বস্তুর তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং তাপগ্রহণে নিম্নতাপমাত্রার বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

কোন বস্তু কি পরিমাণ তাপ গ্রহণ করিবে বা বর্জন করিবে তাহা প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

(১) বস্তুর ভর, (২) বস্তুর তাপমাত্রা পরিবর্তনের পরিমাণ ও (৩) বস্তুর আপেক্ষিক তাপ।

(১) বস্তুর তাপশক্তির পরিমাণ উহার ভরের পরিমাণের উপর নির্ভর করে :

যে বস্তুর ভর যত বেশী হইবে, উহাকে কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তুলিতে তত বেশী তাপের প্রয়োজন হইবে। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপ বস্তুটির ভরের সমানুপাতিক। যেমন পনেরো গ্রাম জলকে ঘরের তাপমাত্রা হইতে স্ফুটনাঙ্কে তুলিতে যে পরিমাণ তাপ লাগিবে, এক গ্রাম জলকে ঘরের তাপমাত্রা হইতে স্ফুটনাঙ্কে তুলিতে তাহার পনেরো ভাগের এক ভাগ তাপের প্রয়োজন হইবে।

একটি পরীক্ষানলে খানিকটা জল লইয়া একটি বুনসেন দীপে উত্তপ্ত করিলে অল্প সময়ে জল গরম হইবে। কিন্তু এক বীকার জল যদি ঐ বুনসেন দীপে উত্তপ্ত করা হয়, তাহা হইলে গরম হইতে অনেক বেশী সময় লাগিবে। বেশী সময় উত্তপ্ত করিবার অর্থ বেশী পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করা। আবার কোন বস্তুর তাপমাত্রা নির্দিষ্ট পরিমাণে কমিলে উহা যত পরিমাণ তাপ হারাইবে, তাহা উহার ভরের সমানুপাতিক হইবে। অধিক বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে ঠাণ্ডা হইতে কম ভরের বস্তু অপেক্ষা অধিক তাপ বর্জন করিবে। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর মোট তাপশক্তি উহার ভরের আনুপাতিক।

(২) বস্তুর মোট তাপশক্তির পরিমাণ উহার তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। একই পদার্থের দুইটি সমান ভরের বস্তুর তাপমাত্রা বিভিন্ন হইলে কম তাপমাত্রার বস্তুটিতে বেশী তাপমাত্রার বস্তুটি অপেক্ষা কম তাপ থাকিবে।

ঘরের তাপমাত্রায় উত্তপ্ত একটি সীসার বলকে একটি বড় মোমের টুকরার উপরে রাখিলে উহা মোমের গায়ের উপরই থাকিবে। কিন্তু সীসার বলটিকে উত্তপ্ত করিয়া যদি মোমের উপর রাখা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে বলটি মোম গলাইয়া মোমের ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে। কারণ বলটির তাপমাত্রা বেশী বলিয়া ইহাতে পূর্বের তুলনায় বেশী তাপ আছে। ঠাণ্ডা হইয়া মোমের তাপমাত্রায় আসিতে যে পরিমাণ তাপ বর্জন করিবে, মোম ঐ পরিমাণ তাপ গ্রহণ করিয়া গলিবে এবং মোমের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং কোন বস্তুর মোট তাপশক্তির পরিমাণ উহার তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির আনুপাতিক হইবে।

যেমন, কোন বস্তুর তাপমাত্রা যদি 30° সেলসিয়াস হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 50° সেলসিয়াস হয় অর্থাৎ তাপমাত্রা 20° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায়; আবার ঐ বস্তুর তাপমাত্রা যদি 30° সেলসিয়াস হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 70° সেলসিয়াস হয় অর্থাৎ 40° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে প্রথম ক্ষেত্রের তাপের দুইগুণ বেশী তাপ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইবে।

(৩) বস্তুর মোট তাপশক্তির পরিমাণ উহার পদার্থগত আপেক্ষিক তাপের উপর নির্ভর করে।

একই ভরের বিভিন্ন পদার্থ একই তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে বা তাপমাত্রা হ্রাসে সমপরিমাণ তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে না। বস্তুর তাপ গ্রহণ বা বর্জন করিবার ক্ষমতা শুধু বস্তুর ভর বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের উপর নির্ভর করে না, উহা

বস্তুর আর একটি বিশেষ ধর্মের উপর নির্ভর করে। পদার্থের এই ধর্মকে আপেক্ষিক তাপ বলে। পদার্থের এই ধর্মের জন্যই একই পরিমাণ তাপ একই ভরের বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে।

সমান ভরের সীসা, টিন, তামা ও লোহার বল সমান তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিয়া একই সঙ্গে তুলিয়া একটি বড় পুরু মোমের টুকরার উপর রাখা হইলে দেখা যাইবে যে. বিভিন্ন বল বিভিন্ন পরিমাণ মোম গলাইয়া বিভিন্ন গভীরতা পর্যন্ত মোমের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বলগুলির ভর এবং তাপমাত্রা হ্রাস প্রতি ক্ষেত্রে এক হইলেও ইহারা বিভিন্ন পরিমাণ তাপ বর্জন করিয়াছে। কারণ বলগুলি বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা তৈয়ারী বলিয়া উহাদের পদার্থগত আপেক্ষিক তাপ বিভিন্ন। স্নতরাং বিভিন্ন বস্তুর তাপ গ্রহণ এবং তাপ বর্জন করিবার ক্ষমতা উহাদের আপেক্ষিক তাপের উপর নির্ভর করে।

তাপের একক : তাপ পরিমাপ যোগ্য। স্নতরাং ইহার একক প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে তাপের ভিন্ন ভিন্ন একক ব্যবহৃত হয়।

ক্যালরি : এক গ্রাম বিশুদ্ধ জলের তাপমাত্রা 1° সেলসিয়াস বৃদ্ধি করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন সেই পরিমাণ তাপকে ক্যালরি বলে। ইহা সি. জি. এস পদ্ধতির একটি একক।

বৃটিশ থার্মাল একক : এক পাউণ্ড বিশুদ্ধ জলের তাপমাত্রা 1° ফারেণ-হাইট বৃদ্ধি করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন সেই পরিমাণ তাপকে এক বৃটিশ থার্মাল একক বলে। ইহা এফ. পি. এস পদ্ধতির একটি একক। ইহাকে পাউণ্ড ফারেণহাইট এককও বলা হয়।

মিশ্র একক : এক পাউণ্ড বিশুদ্ধ জলের তাপমাত্রা 1° সেলসিয়াস বৃদ্ধি করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন সেই পরিমাণ তাপকে এক পাউণ্ড ক্যালরি বলে। ইহা সি. জি, এস এবং এফ. পি. এস পদ্ধতির একটি মিশ্র একক। এই একক ইংলণ্ডে বেশী প্রচলিত।

তাপের বড় একক : এক কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ জলের তাপমাত্রা 1° সেলসিয়াস বৃদ্ধি করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন সেই পরিমাণ তাপকে কিলোক্যালরি একক বলে। ইহা সি, জি. এস পদ্ধতির একটি বড় একক।

1 কিলোক্যালরি = 1000 ক্যালরি।

থার্ম : 100,000 পাউণ্ড জলের তাপমাত্রা 1° ফারেণহাইট বৃদ্ধি করিতে

যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন সেই পরিমাণ তাপকে থার্ম বলে। ইহা এফ. পি. এস পদ্ধতির একটি বড় একক। 1 থার্ম=100,000 বৃটিশ থার্মাল একক।

তাপ একপ্রকার শক্তি (Heat is a form of energy):

তাপ একপ্রকারের শক্তি। তাপ শক্তিকে বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। আবার বিভিন্ন শক্তি হইতে তাপশক্তি পাওয়া যায়।

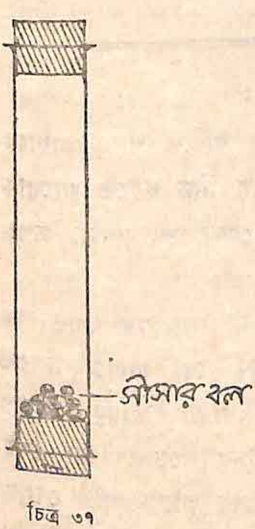
তড়িৎ প্রবাহ যখন বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেণ্টের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় তখন আলো ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়। ইহা তড়িৎ শক্তির তাপ বা আলোক শক্তিতে রূপান্তরের উদাহরণ।

অনেক দূর দৌড়াইলে বা কামারশালায় অনেকক্ষণ হাতুড়ী দ্বারা লোহা পিটাইলে দেহ উত্তপ্ত হয়। ইহা গতিশক্তির তাপশক্তিতে রূপান্তরের উদাহরণ। স্টীমের সাহায্যে ইঞ্জিন চালনা করা হয়। ইহাও তাপশক্তির যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের আরেকটি উদাহরণ।

কার্যের সহিত তাপশক্তির সম্পর্ক (Relationship with work):

তাপশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে পরিবর্তিত হইয়া কার্য করে। আবার কার্য দ্বারা তাপ উৎপন্ন হয়।

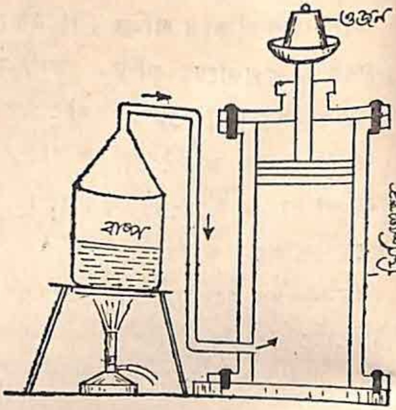
একটি লম্বা কাঁচের চোঙের মধ্যে কয়েকটি সীসার বল রাখিয়া চোঙের দুই মুখ কর্ক দ্বারা বন্ধ করা হইল। একটি তাপমান যন্ত্র দ্বারা সীসার বলগুলির প্রাথমিক তাপমাত্রা দেখা হইল। এইবার চোঙটিকে উল্টাইয়া উপরের দিক নিচে এবং নিচের দিক উপরে খুব দ্রুত কয়েকবার এই প্রক্রিয়া করিয়া তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে সীসার বলগুলির তাপমাত্রা পরিমাপ করিলে দেখা যাইবে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থাৎ তাপশক্তির সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষেত্রে কার্য দ্বারা তাপশক্তির সৃষ্টি হইল (চিত্র-৩৭)।



চিত্র ৩৭

আবার তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া কার্য করা হয়। একটি পুরু ধাতুর তৈয়ারী সিলিণ্ডারে স্টীম নিরুদ্ধ একটি পিস্টন আছে। পিস্টনটি পার্শ্বনলের মুখের উপর পর্যন্ত নামিতে পারে। পিস্টনটির উপর একটি ওজন রাখা আছে। পার্শ্বনল

একটি স্ফুটন-পাত্রের সহিত যুক্ত। ঐ স্ফুটন-পাত্র হইতে স্টীম আনিয়া সিলিণ্ডারের পিস্টনকে চাপ দিয়া উহাকে উপরে তোলে। পিস্টন এবং পিস্টনের উপর রাখা ওজনকে পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে উপরে তুলিয়া স্টীম দ্বারা কার্য করা হয়। এই কার্য আসলে স্টীমের তাপশক্তিই করিয়া থাকে (চিত্র ৩৮)।



চিত্র ৩৮

ইহা হইতে দেখা যায় যে, তাপশক্তির সাহায্যে যেমন কার্য করা সম্ভব, আবার কার্য দ্বারা তাপশক্তি সৃষ্টিও সম্ভব। স্টীম ইঞ্জিন, পেট্রল ইঞ্জিন প্রভৃতি যন্ত্র তাপশক্তির সাহায্যে কার্য করিয়া থাকে। সুতরাং কার্যের সহিত তাপশক্তির ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

আলোক

আলোকের উৎস (**Source of light**):

যে বস্তু প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম আলোক প্রদান করিতে পারে তাহাকে আলোকের উৎস বলে। ইহাদের মধ্যে যে সকল বস্তু নিজ হইতে আলোক বিকীর্ণ করিতে পারে তাহাদের স্বপ্রভ বস্তু বলে। যেমন সূর্য, নক্ষত্র, জ্বলন্ত বাতি, বৈদ্যুতিক বাতি ইত্যাদি।

যে সকল বস্তু আলোক বিকিরণ করিতে পারে না কিন্তু অন্য স্বপ্রভ বস্তু হইতে আলোক গ্রহণ করিয়া সেই আলোক বিকীর্ণ করে, তাহাদের নিষ্প্রভ বা অপ্রভ বস্তু বলে। যেমন চাঁদ, টেবিল, চেয়ার, বই, পাথর ইত্যাদি। চাঁদের নিজস্ব কোন আলোক নাই। সূর্যের আলো চাঁদের উপর পড়ে এবং চাঁদ সেই আলোর কিছু অংশ বিকীরণ করে। দিনের বেলার সূর্যের আলো, রাত্রি বেলায় জ্বলন্ত বাতির আলো, টেবিল, চেয়ার, বই, পাথর ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক পরিদৃশ্যমান বস্তুর উপর পড়িলে উহারা দৃষ্টির গোচরে আসে।

আলোক মাধ্যম ঃ আলো যে মাধ্যমের মধ্য দিয়া চলাচল করিতে পারে তাহাকে আলোক মাধ্যম বলা হয়।

যে মাধ্যমের সকল অংশের মধ্য দিয়া আলো সমান গতিতে চলাচল করিতে পারে তাহাকে সমসত্ত মাধ্যম বলা হয়। যেমন জল, কাঁচ, বায়ু প্রভৃতি। যে মাধ্যমের সকল অংশের মধ্য দিয়া আলো সমান গতিতে চলাচল করিতে পারে না তাহাকে অসমসত্ব মাধ্যম বলা হয়। যেমন ঘষা কাঁচ, তৈলাক্ত কাগজ প্রভৃতি।

যে সমসত্ব মাধ্যমের মধ্য দিয়া আলো অতি সহজে চলাচল করিতে পারে তাহাকে স্বচ্ছ মাধ্যম বলে। যেমন বায়ু, অগভীর জল, কাঁচ ইত্যাদি। স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্য দিয়া কোন বস্তুকে স্পষ্টরূপে দেখা যায়। যে মাধ্যমের মধ্য দিয়া আলো মোটেই চলাচল করিতে পারে না তাহাকে অস্বচ্ছ মাধ্যম বলে! যেমন লোহা, পাথর, মাটি, কাঠ ইত্যাদি।

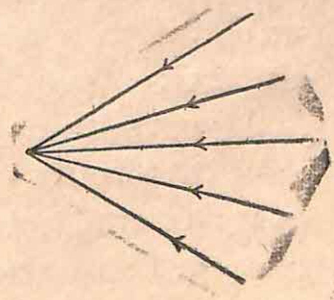
বস্তুর স্বচ্ছতা এবং অস্বচ্ছতা কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তুর বেধের উপর নির্ভর করে। ধাতু অস্বচ্ছ কিন্তু পাতলা ধাতুর পাতের মধ্য দিয়া কিছু আলো যাইতে পারে। জল স্বচ্ছ পদার্থ কিন্তু গভীর জলে কোন আলো গিয়া পৌছায় না।

আলোক রশ্মি (Ray of light) :

স্বপ্রভ বস্তুর প্রতিটি বিন্দু আলোর উৎস। বাধা না পাইলে প্রতিবিন্দু হইতে আলো চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়। সমসত্ব মাধ্যমের মধ্য দিয়া আলো সরল রেখায় চলাচল করে। সুতরাং আলোর চলার একটি পথকে আলোক রশ্মি বলা হয়। অর্থাৎ একটি আলোক রশ্মি হইল আলোর একটি সরলরেখা। আলোর পথকে সরলরেখা দ্বারা এবং তীরচিহ্ন দ্বারা আলোর গতির অভিমুখ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। আলোক রশ্মির কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। কতকগুলি আলোক রশ্মির সমষ্টিকে রশ্মিগুচ্ছ বলা হয়। উৎস যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, উহা হইতে সর্বদা রশ্মিগুচ্ছ বিকীর্ণ হইবে। রশ্মিগুচ্ছের বাস্তব অস্তিত্ব আছে।

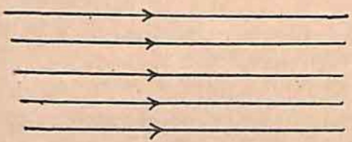
রশ্মিগুচ্ছ তিন রকমের হইতে পারে :—

(১) **অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ :** কোন আলোক উৎস হইতে আগত রশ্মিগুলি একটি বিন্দুতে মিলিত হইলে রশ্মিগুচ্ছকে অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ বলা হয়। এইরূপ অভিসারী রশ্মিগুচ্ছে উৎস হইতে রশ্মিগুলির পরস্পর ব্যবধান কমিতে থাকে (চিত্র ৩৯)।



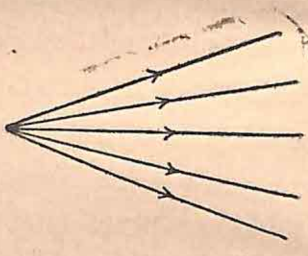
চিত্র ৩৯—অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ

(২) **সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ:** কোন আলোক উৎস হইতে আগত রশ্মিগুলি পরস্পর সমান্তরাল হইলে রশ্মিগুচ্ছকে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ বলা হয়। সকল নক্ষত্র হইতে আগত আলোক রশ্মিগুলিকে সর্বদা পরস্পরের সহিত সমান্তরাল বলিয়া ধরা হয়। ইহারা হইল প্রাকৃতিক সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ। লেন্স বা দর্পণ দ্বারা কৃত্রিমভাবে সমান্তরাল আলোক রশ্মি উৎপন্ন করা যায় (চিত্র ৪০)।



চিত্র ৪০—সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ

(৩) **অপসারী রশ্মিগুচ্ছ:** কোন আলোক উৎস হইতে আগত রশ্মিগুলি শঙ্কুর আকারে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িলে রশ্মিগুচ্ছকে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ বলা হয়। অপসারী রশ্মিগুচ্ছে রশ্মিগুলির মধ্যের ব্যবধান ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে (চিত্র ৪১)।



চিত্র ৪১—অপসারী রশ্মিগুচ্ছ

আলোকের প্রতিফলন (Reflection of light):

কোন সমসত্ব মাধ্যমে আলোক সরলরেখায় চলে। আলো এক মাধ্যমে চলিতে চলিতে যদি অন্য কোন মাধ্যমের সম্মুখীন হয়, তাহা হইলে আলোকরশ্মির সরলরেখ পথের দিক পরিবর্তন হয়। সাধারণত: আলোর এক অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে ও আংশিকভাবে মাধ্যম কর্তৃক শোষিত হয় এবং অপর অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমের তল হইতে পুনরায় সরলরেখ পথে প্রথম মাধ্যমে ফিরিয়া আসে। ইহাকে আলোর প্রতিফলন বলে। আপতিত আলোর কত অংশ প্রতিফলিত হইবে তাহা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

১) আপতিত আলো প্রতিফলকের উপর কত কোণে আপতিত হইল।

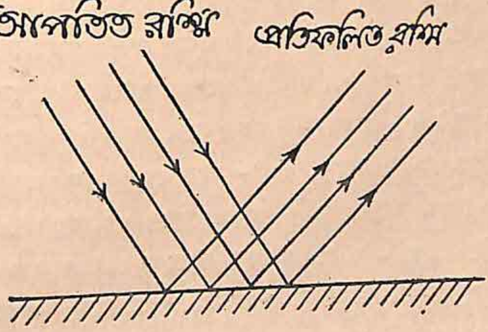
২) কোন মাধ্যম হইতে আসিয়া কোন্ মাধ্যম কর্তৃক প্রতিফলিত হইল।

বায়ু হইতে সরাসরি লম্বভাবে আলো কাঁচের উপর পড়িলে প্রায় শতকরা 4·5 ভাগ আলো প্রতিফলিত হয়। আপতিত রশ্মি প্রতিফলক তলে যত নত হইয়া পড়িবে তত বেশী আলো প্রতিফলিত হইবে। বায়ু হইতে সমতল দর্পণে আলো লম্বভাবে পড়িলে শতকরা প্রায় 80 ভাগ আলো প্রতিফলিত হয়।

প্রতিফলক তলের প্রকৃতি অনুযায়ী আলোর প্রতিফলন দুই প্রকার হয় :

১) নিয়মিত প্রতিফলন, ২) বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন

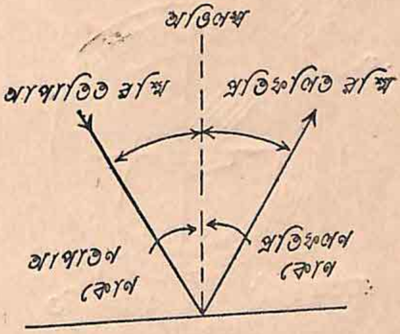
(১) **নিয়মিত প্রতিফলন :** আলোকরশ্মি যদি কোন মাধ্যমের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে দর্পণ বা ঐ জাতীয় কোন মসৃণ সমতলে আপতিত হয়



চিত্র ৪২—নিয়মিত প্রতিফলন

তাহা হইলে আপতিত আলোর সব অংশই প্রতিফলক হইতে পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরিয়া আসে। এইরূপ প্রতিফলক হইতে আলোর প্রতিফলন কয়েকটি নিয়মাধীনে ঘটে বলিয়া ইহাকে নিয়মিত প্রতিফলন বলে (চিত্র ৪২)।

প্রতিফলকে যে রশ্মি আপতিত হয় তাহাকে আপতিত রশ্মি বলা হয়। প্রতিফলক হইতে যে রশ্মি পুনরায় ফিরিয়া যায় তাহাকে প্রতিফলিত রশ্মি বলা হয়। প্রতিফলকের যে বিন্দুতে আলোক রশ্মি আপতিত হয় তাহাকে আপতন বিন্দু বলা হয়। আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত লম্বকে অভিলম্ব বলা হয়। আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সহিত যে কোণ তৈরী করে তাহাকে আপতন কোণ এবং প্রতিফলিত রশ্মির অভিলম্বের সহিত যে কোণ তৈরী করে তাহাকে প্রতিফলন কোণ বলা হয় (চিত্র ৪৩)।



চিত্র ৪৩

নিয়মিত প্রতিফলনের সূত্র (Laws of regular reflection) :

নিয়মিত প্রতিফলন দুইটি সূত্র অনুযায়ী ঘটিয়া থাকে।

(১) আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকিবে।

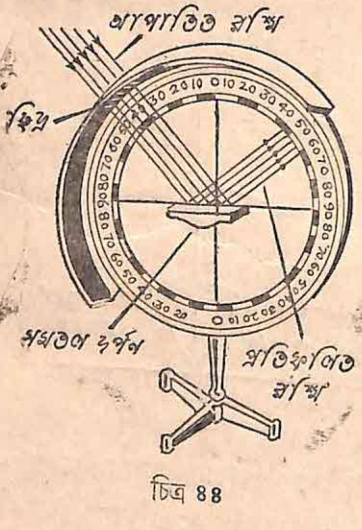
(২) আপতন কোণ প্রতিফলিত কোণের সমান হইবে।

প্রতিফলনের সূত্রাবলীর পরীক্ষা :

হার্টলের আলোক চক্র পদ্ধতি :—

একটি দণ্ডের উপর একটি ধাতব গোলাকার চক্র খাড়াভাবে বসানো আছে। এই চক্রকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগে 0° হইতে 90° ডিগ্রীতে অংশাঙ্কণ করা আছে। চক্রকে উহার কেন্দ্রস্থ অনুভূমিক অক্ষের চতুর্দিকে লম্ব তলে আবর্তিত করা যায়। 90°—90° রেখার সহিত মিলাইয়া একটি অনুভূমিক পাতলা সমতল দর্পণ চক্রের কেন্দ্রে রাখা হয়। এইভাবে দর্পনের তল অনুভূমিক হয় এবং চক্রের তল উল্লম্ব হয়। সুতরাং উহারা পরস্পর সমকোণে অবস্থিত থাকে 0°—0° রেখা দর্পণের কেন্দ্রকে অভিলম্বভাবে অতিক্রম করে। চক্রের পরিধি বরাবর প্রায় অর্ধেক ঘিরিয়া একটি প্রশস্ত ধাতব পর্দা আছে এবং উহার গায়ে একটি সরু ছিদ্র আছে এই ছিদ্র দিয়া আলোকরশ্মি প্রবেশ করে এবং চক্রের তলে আপতিত হয়।

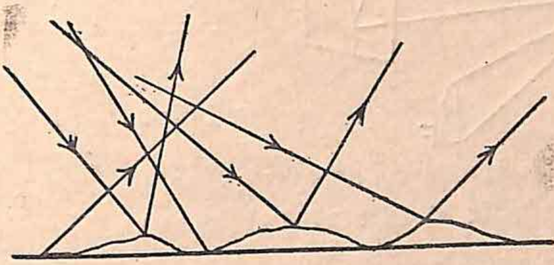
ছিদ্র দিয়া আলোক রশ্মি চক্রের গা বাহিয়া দর্পণের কেন্দ্রস্থলে আপতিত হইয়া প্রতিফলিত হয়। দেখা যায় প্রতিফলিত রশ্মিও চক্রের গা বাহিয়া যায়। সুতরাং আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও অভিলম্ব একই চক্রের তলে অবস্থিত হয়। ইহা প্রথম সূত্র প্রমাণ করে (চিত্র ৪৪)।



চিত্র ৪৪

আপতিত রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্ব 0°– 0° রেখার সহিত সমান কোণ উৎপন্ন করে। চক্রের পরিধির স্কেল হইতে উহাদের পরিমাপ করা যায়। চক্রকে সামান্য ঘুরাইয়া যে কোন কোণে আলোক-রশ্মিকে আপতিত করিয়া আপতন কোণ ছোট-বড় করা যায়। প্রতি ক্ষেত্রে আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সমান হয়। উহা দ্বিতীয় সূত্র প্রমাণ করে।

বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন : আলোক রশ্মি অমসৃণ তলে যেমন সাদা কাগজ, ঘষা কাঁচ, ঘরের দেওয়ালে আপতিত হইলে উহারা একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রতিফলিত না হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। আপতিত রশ্মিগুচ্ছের সহিত প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছের কোন মিল থাকে না। অমসৃণ প্রতিফলক তল



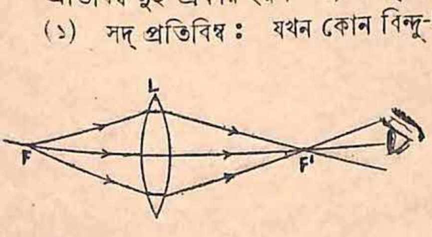
চিত্র ৪৫

বিভিন্ন দিকে আনত অসংখ্য ক্ষুদ্র তল বিশিষ্ট হয়। সুতরাং অমসৃণ তলের বিভিন্ন বিন্দুতে অভিলম্ব বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন অভিমুখী হইবে। এককভাবে প্রত্যক রশ্মি নিয়মিত প্রতিফলনের সূত্র মানিয়া চলিলেও সমগ্রভাবে আলোক রশ্মিগুচ্ছ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে। এই ঘটনাকে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন বলে। আলোক রশ্মির বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের সাহায্যেই সাধারণতঃ কোন বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায় (চিত্র ৪৫)।

প্রতিবিম্ব : কোনও বস্তু হইতে আলোক রশ্মি কোথাও বাধা না পাইয়া যখন সরাসরি চোখে আসিয়া পড়ে, তখন ঐ বস্তুটিকে দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ বস্তুটির অবস্থান ও আকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা হয়। কিন্তু বস্তুটি হইতে আলোক রশ্মি যদি সরাসরি চোখে না আসিয়া প্রতিফলন বা প্রতিসরণের ফলে দিক পরিবর্তন করিয়া আসে তাহা হইলেও বস্তুটির আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তখন বস্তুটি অন্যত্র আছে বলিয়া মনে হয়। এই অন্যস্থানে যাহা দেখা যায় তাহাই হইল বস্তুটির প্রতিবিম্ব।

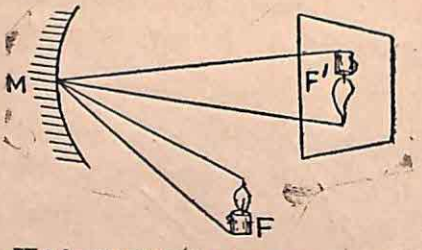
আয়নার সামনে দাঁড়াইলে দেহের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিবিম্ব দুই প্রকার হয়। ১) সদ্ প্রতিবিম্ব, ২) অসদ্ প্রতিবিম্ব,

(১) সদ্ প্রতিবিম্ব : যখন কোন বিন্দু-প্রভব হইতে নির্গত রশ্মিগুচ্ছ কোন তলে প্রতিফলন বা প্রতিসরণের ফলে দিক পরিবর্তন করিয়া অন্য কোন বিন্দুতে মিলিত হয়, তখন এই দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর সদ্‌বিম্ব বলা হয় (চিত্র ৪৬)।



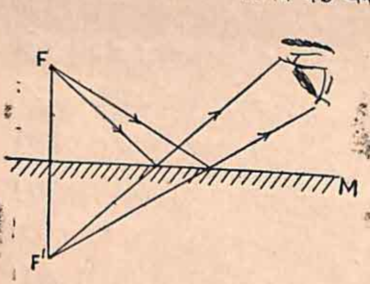
চিত্র ৪৬—প্রতিসরণের ফলে সদ্‌বিম্ব

F বিন্দু প্রভব হইতে নির্গত রশ্মিগুচ্ছ L উত্তল লেন্সে প্রতিসৃত হইয়া F´ বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। সুতরাং F´ বিন্দূ হইল F এর সদ্‌বিম্ব। F´ বিন্দুতে একটি পর্দা রাখিলে পর্দায় প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে। অবতল দর্পণে সদ্‌-প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। M অবতল দর্পণে প্রতিফলনের ফলে F এর সদ্‌বিম্ব F´ গঠিত হইয়াছে (চিত্র ৪৭)।



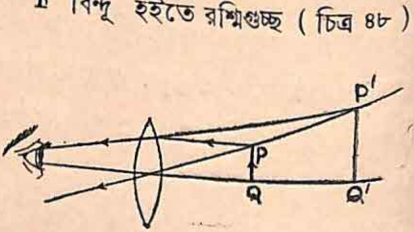
চিত্র ৪৭—অবতল দর্পণে প্রতিফলনের ফলে সদ্‌বিম্ব

(২) অসদ্ প্রতিবিম্ব : কোন বিন্দূ-প্রভব হইতে নির্গত অপসারী রশ্মিগুচ্ছ যদি প্রতিফলন বা প্রতিসরণের জন্য এমনভাবে দিক্ পরিবর্তন করে যে তাহারা এক বিন্দুতে মিলিত হইবার পরিবর্তে অন্য কোনও বিন্দু হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর অসদ্‌প্রতিবিম্ব বলা হয়।



চিত্র ৪৮—প্রতিফলনের ফলে অসদ্‌বিম্ব

M দর্পণের সামনে F একটি বিন্দূপ্রভব। F বিন্দূ হইতে রশ্মিগুচ্ছ (চিত্র ৪৮) দর্পণের উপর প্রতিফলিত হইয়া চোখে পড়িতেছে। চোখে মনে হইবে যে প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ F´ বিন্দু হইতে আসিতেছে। সুতরাং F´ বিন্দূ F বিন্দুর অসদ্ প্রতিবিম্ব। F বিন্দূতে কোন পর্দা রাখিলে কোন প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে না। প্রতিসরণের ফলেও অসদ্ প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। PQ বস্তুর P^1Q^1 একটি বর্ধিত অসদ্ প্রতিবিম্ব (চিত্র ৪৯)।

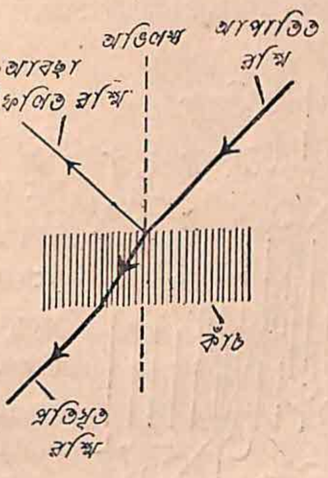


চিত্র ৪৯—প্রতিসরণের ফলে প্রতিবিম্ব

আলোকের প্রতিসরণ (Refraction of light) :

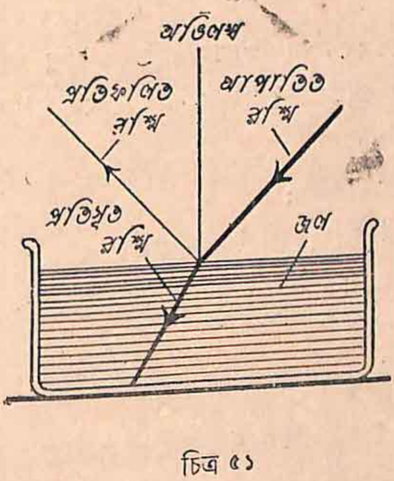
একটি জলপূর্ণ চৌবাচ্চার তলদেশে তাকাইলে চৌবাচ্চাকে তত গভীর মনে হয় না। একটি লাঠির কিছু অংশ জলে ডুবাইলে জলের সহিত স্পর্শতলে লাঠিটি

বাঁকিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সকল ঘটনা হইতে বোঝা যায় যে আলোক রশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্যে দিয়া সরলরেখায় গমন করিয়া অন্য স্বচ্ছ



চিত্র ৫০

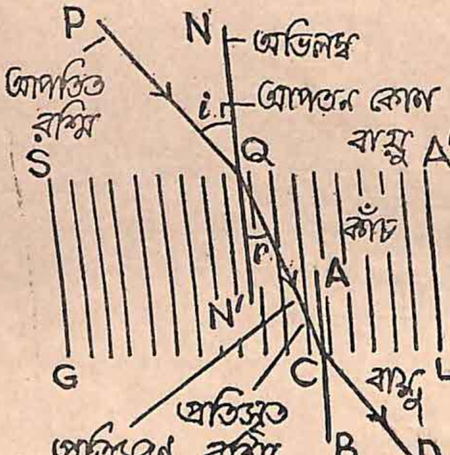
মাধ্যমে তির্যকভাবে আপতিত হইলে দুই মাধ্যমের বিভাগ তলে ঐ আলোক রশ্মির গতির অভিমুখ নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিবর্তিত হয় এবং দ্বিতীয় মাধ্যমে



চিত্র ৫১

ইহা সরলরেখায় চলে। আলোকরশ্মির গতির অভিমুখের এই পরিবর্তনকে আলোকের প্রতিসরণ বলে।

প্রথম মাধ্যমে আলোকরশ্মির গতিপথকে আপতিত রশ্মি বলে। যে বিন্দুতে আপতিত রশ্মি দুই মাধ্যমের বিভাগ তলকে স্পর্শ করে তাহাকে আপতন বিন্দু এবং দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোক রশ্মির গতিপথকে প্রতিসৃত রশ্মি বলে।



চিত্র ৫২

GLA¹ S একটি কাঁচের ফলক। A^1S বায়ু এবং কাঁচ এই দুই স্বচ্ছ মাধ্যমের বিভাগতল। আলোক রশ্মি PQ বায়ু মাধ্যমে সরল পথে আসিয়া A^1 S বিভাগ তলে Q বিন্দুতে তির্যকভাবে আপতিত হয় এবং কাঁচ মাধ্যমে ভিন্ন QC সরল পথে চলিয়া যায়। মনে করা যাউক Q বিন্দুতে NQN^1 অভিলম্ব। এক্ষেত্রে P Q আপতিত রশ্মি এবং QC প্রতিসৃত রশ্মি। আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সহিত যে কোণে নত তাহাকে আপতন কোণ বলা হয়। এক্ষেত্রে PQN হইল আপতন কোণ। আবার প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের সহিত যে কোণে নত তাহাকে প্রতিসরণ কোণ বলে। এক্ষেত্রে N^1QC হইল প্রতিসরণ কোণ (চিত্র ৫২)।

প্রতিসরণের সূত্রাবলী :

১। **আপতিত রশ্মি প্রতিসৃত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভাগতলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকিবে।**

দুইটি নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর ক্ষেত্রে আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত ধ্রুবক হইবে।

দ্বিতীয় সূত্রের আবিষ্কারক Willebrod Snell এর নামানুসারে দ্বিতীয় সূত্রকে স্নেলের সূত্র বলা হয়। কখনও কখনও ইহাকে সাইনের সূত্রও বলা হয়।

প্রতিসরাঙ্ক : আপতন কোণ $\angle i$, প্রতিসরণ কোণ $\angle r$ হইলে,

$$\frac{\text{Sin}}{\text{Sin } r} = \mu \text{ (মিউ)} = \text{ধ্রুবক।}$$

এই ধ্রুবককে প্রতিসরাঙ্ক বলে।

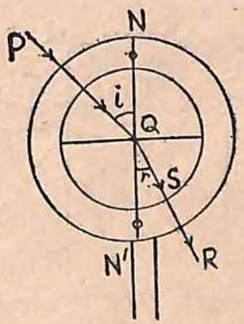
বায়ু মাধ্যম হইতে কাঁচ মাধ্যমে আলোক রশ্মি প্রতিসৃত হইলে আপতন কোণের সাইনের ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাতকে বায়ু মাধ্যমের তুলনায় বা সাপেক্ষে কাঁচ মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক বলে। ইহাকে-

$$\text{বায়ু}\mu\text{কাঁচ} = \frac{\text{Sin } i}{\text{Sin } r} \text{ এইরূপে প্রকাশ করা হয়।}$$

এই প্রতিসরাঙ্ককে আপেক্ষিক প্রতিসরাঙ্ক বলে।

প্রতিসরণের সূত্রাবলীর পরীক্ষা :

হার্টলের আলোক চক্র পদ্ধতি : একটি দণ্ডের উপর একটি ধাতব গোলাকার চক্র বসানো আছে। এই চক্রকে সমান চারিভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগ 0° হইতে 90° ডিগ্রীতে অংশাঙ্কন করা আছে। চক্রকে উহার কেন্দ্রস্থ অনুভূমিক অক্ষের চতুর্দিকে লম্বতলে আবর্তিত করা যায়। চক্রের কেন্দ্রস্থলে একটি অর্ধ-বৃত্তাকার কাঁচফলক এমন ভাবে আটকানো আছে যে ফলকের অনুভূমিক তল 90°—90° রেখার সহিত মিলিয়া যায়। এবং 0°—0° রেখা ফলকের কেন্দ্রের মধ্য দিয়া যায়। সুতরাং 0°—0° রেখা কাঁচ ফললের অনুভূমিক তলের উপর অভিলম্ব (চিত্র ৫৩)।



চিত্র ৫৩

প্রশস্ত ধাতব পর্দার ছিদ্র দিয়া যদি কোন আলোক রশ্মি PQ পথে চক্রের তল বরাবর আসিয়া কাঁচ ফলকের উপর Q বিন্দুতে আপতিত হয় তাহা হইলে ঐ রশ্মি কাঁচের মধ্য দিয়া প্রতিসৃত হইবে। প্রতিসৃত রশ্মি Q S পথে গেল এবং আবার যখন কাঁচ হইতে বাহির হইয়া আসিবে তখন আর প্রতিসৃত না হইয়া SR পথে সোজা চলিয়া যাইবে। সুতরাং PQ আপতিত রশ্মি এবং QSR উহার প্রতিসৃত রশ্মি। S বিন্দুতে আলোক রশ্মির প্রতিসরণ না হইবার কারণ হইল QS রেখা অর্ধবৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ হওয়ায় QS বরাবর নির্গত রশ্মি S বিন্দুতে অভিলম্ব-

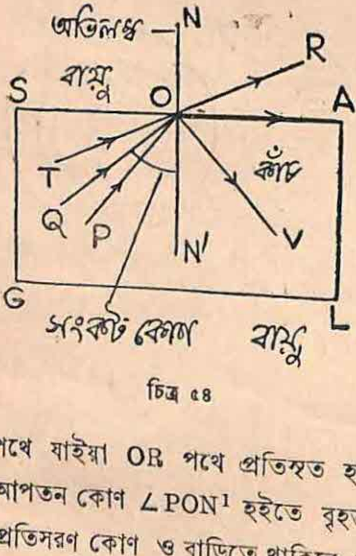
ভাবে আপতিত হয়। সুতরাং S বিন্দুতে আলোক রশ্মির আর কোন প্রতিসরণ হয় না। চক্রের স্কেল হইতে PQN কোণ এবং RQN^1 কোণ পরিমাপ করা যাইবে।

চক্রটিকে ঘুরাইলে PQ আলোক রশ্মির স্থান পরিবর্তন হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিস্থত রশ্মির ও স্থান পরিবর্তন হইবে। প্রত্যেক বার চক্রের স্কেল হইতে আপতন কোণ এবং প্রতিসরণ কোণ পরিমাপ করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেকবার $\frac{\text{Sin PQN}}{\text{Sin RQN}^1}$ এর মান ধ্রুবক। ইহা দ্বিতীয় সূত্র প্রমাণ করে।

আবার আপতিত রশ্মি, প্রতিস্থত রশ্মি এবং অভিলম্ব চক্রের তলে অবস্থিত হওয়ায় প্রথম সূত্র প্রমাণিত হয়।

আলোকের আভ্যন্তরীণ পূর্ণপ্রতিফলন (Total internal reflection of light) ঃ

আলোক রশ্মি যখন ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রতিস্থত হয় তখন প্রতিস্থৃত রশ্মি অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায় অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হয়। আপতন কোণকে বাড়াইতে থাকিলে প্রতিসরণ কোণও বাড়িতে থাকে (চিত্র ৫৪)।



চিত্র ৫৪

বায়ু মাধ্যমে GLAS কাঁচফলক বসানো আছে। SA বায়ু ও কাঁচ এই দুই মাধ্যমের বিভেদ-তল। কাঁচের মধ্যে P বিন্দু হইতে একটি আলোক রশ্মি PO পথে যাইয়া OR পথে প্রতিস্থত হয়। সুতরাং প্রতিসরণ কোণ ∠NOR আপতন কোণ $\angle PON^1$ হইতে বৃহত্তর। আপতন কোণ বাড়াইতে থাকিলে প্রতিসরণ কোণ ও বাড়িতে থাকিবে যতক্ষণ না আপতন কোণের একটি নির্দিষ্ট মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ 90° হয়। অর্থাৎ এই অবস্থায় প্রতিস্থত রশ্মি SA তল ঘেঁষিয়া যায়। মনে করা যাউক QO আপতিত রশ্মির জন্য প্রতিস্থত রশ্মি SA বিভেদ-তল ঘেঁষিয়া যায় এবং ইহার জন্য যে আপতন কোণ হইল তাহা QON^1 কোণের সমান এই আপতন কোণকে সংকট কোণ বলা হয়ঃ

আলোক রশ্মি ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে যাইবার সময় যে আপতন কোণের জন্য আলোক রশ্মির প্রতিসরণ কোণ 90° হয় অর্থাৎ প্রতিসৃত আলোক রশ্মি স্পর্শতল ঘেঁষিয়া প্রতিসৃত হয় তাহাকে সংকট কোণ বলে।

আপতন কোণ সংকট কোণ অপেক্ষা অতি সামান্য বাড়াইলে দেখা যায় যে আলোক রশ্মি আর বায়ু মাধ্যমে প্রতিসৃত না হইয়া আলোক রশ্মির সমস্ত অংশই প্রতিফলনের নিয়মানুসারে কাঁচ হইতে কাঁচের মাধ্যমের মধ্যেই পূর্ণ ভাবে OV পথে প্রতিফলিত হয়। কারণ প্রতিসরণ 90 ডিগ্রীর বেশী হওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আপতন কোণ TON^1 প্রতিফলন কোণ VON^1 এর সমান। এখানে কাঁচ ও বায়ু মাধ্যমের বিভেদ-তল SA পূর্ণ প্রতিফলকের কাজ করিতেছে। ইহাকেই আলোকের আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলে।

পূর্ণ প্রতিফলনের সর্ত ঃ

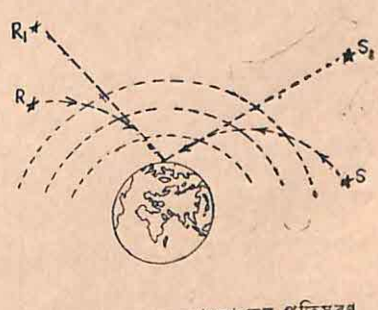
১) আলোক রশ্মিকে ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে যাইতে হইবে।

২) আপতন কোণ সংকট কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইতে হইবে।

প্রতিসরণ এবং পূর্ণ প্রতিফলনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা। (**Explanation of some natural phenomena on the basis of refraction and total refraction) :**

প্রতিসরণের কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা :

১) বায়ুমণ্ডলে আলোকের প্রতিসরণ : সূর্য দিগন্তের নীচে থাকিলেও উহাকে দেখা যায়। অস্তগামী সূর্যকে গোলাকৃতি না দেখাইয়া ডিম্বাকৃতি দেখায়। সূর্যাস্তের কিছু পরে সূর্য দিগন্তের নীচে থাকিলেও সূর্যকে দেখিতে পাওয়া যায়। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উপরের দিকে বায়ুর ঘনাঙ্ক ও প্রতিসরাঙ্ক ক্রমশ কমিতে থাকে। দিগন্তের সূর্য হইতে নির্গত আলোক রশ্মি নীচ হইতে উপরের দিকে লঘুতর মাধ্যম হইতে ঘনতর মাধ্যমের মধ্য দিয়া আসে। সুতরাং উহা বিভিন্ন ঘনাঙ্কের স্তরের মধ্য দিয়া প্রতিসৃত হইয়া অভিলম্বের দিকে ক্রমশঃ বাঁকিতে থাকে। শেষবারের প্রতি সৃত



চিত্র ৫৫—বায়ুমণ্ডলে আলোকের প্রতিসরণ

রশ্মি যে রেখায় দর্শকের চোখে আসিয়া পৌছায় সেই রেখার পিছনের দিকের বর্ধিত অংশে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখে। সুতরাং সূর্য দিগন্তের নীচে থাকিলেও উহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য যখন দিগন্তের কাছাকাছি আসে তখন উহার উল্লম্ব ব্যাসের নিম্নবিন্দু উচ্চ বিন্দু অপেক্ষা বেশী উঁচুতে উঠে কিন্তু অনুভূমিক ব্যাসের দুই প্রান্তের দুই বিন্দু একই পরিমাণে প্রতিসৃত হয়। তখন উহার দৈর্ঘ্য কম বলিয়া মনে হয় এবং উহার ফলে সূর্যকে ডিম্বাকৃতি দেখায়। R উদয় কালের সূর্য, R_1 উহার প্রতিবিম্ব, এবং S অস্তশেষের সূর্য, S_1 উহার প্রতিবিম্ব (চিত্র ৫৫)।

(২) তারার ঝিকিমিকি : উত্তপ্ত বস্তুর চতুর্দিকে বিভিন্ন ঘনাঙ্কের ও প্রতিসরাঙ্কের বায়ু স্তর থাকে। এই ঘনাঙ্ক ও প্রতিসারঙ্ক অনবরত পরিবর্তিত হয়। এইরূপ পরিবর্তনশীল ঘনাঙ্ক বিশিষ্ট বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া আলোক রশ্মি আসিলে উহা কাঁপিতে থাকে। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা নানা কারণে সর্বদা পরিবর্তিত হয় ফলে উহার বিভিন্ন স্তরের ঘনাঙ্ক ও প্রতিসরাঙ্ক সর্বদাই পরিবর্তিত হয়। বহুদূরের নক্ষত্র হইতে আলোকরশ্মি বায়ু মণ্ডলের মধ্যে দিয়া আসিবার সময় প্রতিসরাঙ্কের পরিবর্তনের জন্য আঁকাবাঁকা পথে দর্শকের চোখে পৌছায়। ইহার ফলে দর্শক কখনও কম আলো, কখনও বেশী আলো দেখে। এই কারণে তারাগুলি ঝিকমিক করে।

পূর্ণ প্রতিফলনের কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা :

মরুভূমিতে সূর্যতাপে বালি খুব উত্তপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বায়ুস্তরও উত্তপ্ত হয়। উহার আয়তন বৃদ্ধি পায়, ঘনাঙ্ক হ্রাস পায় কিন্তু উত্তপ্ত ভূ-পৃষ্ঠ হইতে যতই উপরে উঠা যায় ততই বায়ুস্তরের তাপমাত্রা হ্রাস পাইতে থাকে, ঘনাঙ্ক ও প্রতিসরাঙ্ক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং উপর হইতে নীচের দিকে বায়ুস্তরগুলি ক্রমশ লঘু হয়। ইহার ফলে দূরের কোন গাছের শীর্ষ হইতে আগত আলোক রশ্মি নীচের দিকে আসিবার সময় ক্রমশঃ ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে বায়ুস্তর অতিক্রম করে। প্রতি স্তরে প্রবেশ করিবার সময় প্রতিসরণের জন্য উহা অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং প্রত্যেক স্তরের আপতন কোণ পরবর্তী আপতন কোণ অপেক্ষা বড় হয়। এইরূপে কোনও একস্তরে আসিয়া আপতন কোণ সেই স্তর এবং পরবর্তী নিম্নস্তরের সংকট কোণ অপেক্ষা বেশী হইলে আলোক রশ্মি প্রতিসৃত না হইয়া আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া উপরের দিকে যায় এবং লঘুতর বায়ুস্তর হইতে ঘনতর বায়ুস্তরে প্রতিসৃত হয়। প্রত্যেক

স্তরে উহা অভিলম্বের দিকে বাঁকিয়া যায় এবং শেষে পথিকের চোখে আসিয়া পড়ে। গাছের প্রত্যেক বিন্দু হইতে আলোক রশ্মি এই বক্রপথ ধরিয়া পথিকের চোখে পৌছায় কিন্তু পথিকের চোখ আলোক রশ্মির বক্রপথ ধরিয়া গাছকে দেখে না। সর্বশেষ যে রেখায় আলোক রশ্মি চোখে প্রবেশ করে সেই রেখার পিছন দিকের বর্ধিত অংশে উজ্জ্বল বালুস্তরের নীচে গাছের উল্টা প্রতিবিম্ব দেখে।

আবার মরুভূমির বায়ুর তাপমাত্রা এবং সেইসঙ্গে বায়ুর ঘনাঙ্ক ও প্রতিসরাঙ্ক অনবরত পরিবর্তিত হয়। ইহার ফলে প্রতিবিম্ব কাঁপিতে থাকে। মরুভূমির তৃষ্ণার্ত পথিক কম্পমান প্রতিবিম্ব দেখিয়া দূরে জলাশয় আছে মনে করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত রশ্মিও দূরে সরিয়া যায়। পথিক তাহার দৃষ্টিভ্রম বুঝিতে পারে।

(২) শীত প্রধান দেশের মরীচিকাঃ অত্যন্ত শীতের দেশে যেমন মেরুপ্রদেশে ভূসংলগ্ন বায়ুস্তর প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য ঘন হয়। যতই উপরে উঠা যায় ততই বায়ুস্তর লঘু হয়। কোন দূরের জাহাজ হইতে আগত আলোকরশ্মি উর্ধ্বগামী হইলে উহা ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রতিসরণের ফলে অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায়। ইহার ফলে স্তরে স্তরে আপতন কোণ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এক স্তরে আলোক রশ্মির পূর্ণ প্রতিফলন হয়। আলোক রশ্মি তখন নিম্নগামী হইয়া দর্শকের চোখে পৌছায়। দর্শক শেষ রশ্মির পিছনের দিকে বর্ধিত অংশে জাহাজের উল্টা প্রতিবিম্ব দেখে। এই প্রতিবিম্ব কম্পমান হয় না।

আলোকের গতিবেগঃ শব্দের মত আলোর ও গতিবেগ আছে। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে শব্দের মত আলোকেরও সময় লাগে। বিশ্বে সম্ভবতঃ এই গতিবেগ হইতে অধিক গতিবেগ সম্পন্ন কোন শক্তি বা বস্তু জানা নাই।

প্রথমে ডেনামার্ক বিজ্ঞানী রোমার পরে ফিজো, কুকো, এস্. কুর্ণ, মাইকেলসন্ প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা আলোকের গতি নির্ণয় করেন। তাঁহাদের মতে আলোক এক স্থান হইতে অন্যস্থানে তির্যক তরঙ্গের আকারে বিস্তৃত হয়। আধুনিক গবেষণায় শূন্যে আলোর গতিবেগের হার প্রতি সেকেণ্ডে 299,774 কিলোমিটার বা 186285 মাইল।

মহাকাশে বিভিন্ন নক্ষত্রের দূরত্ব আলোকের গতিবেগের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়। আলোকের প্রতিসেকেণ্ডে 186000 মাইল গতিবেগ ধরিয়া এক

বৎসরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্বকে আলোক বর্ষ বলা হয়। জ্যোতির্বিদ্যায় ইহা হইল দূরত্ব পরিমাণের একক।

এক আলোক বর্ষ $= 365 \times 24 \times 3600 \times 186000$ মাইল।

$= 365 \times 24 \times 3600 \times 186000 \times 1.61$ কিলোমিটার।

লেন্স (Lens) : বহু প্রাচীন কাল হইতে লেন্সের ব্যবহারের কথা জানা যায়। 'আতসী কাঁচই' উহার প্রমাণ। সমান্তরাল সূর্য রশ্মিগুচ্ছকে উত্তল লেন্স দ্বারা একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রচুর তাপ উৎপন্ন করিবার বিষয় বহু পূর্ব হইতেই জানা ছিল। এই উত্তল লেন্সই হইল আতসী কাঁচ। বর্তমানে চশমা, ক্যামেরা, অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রে লেন্স ব্যবহার করা হয়।

কোন স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমের কোন ক্ষুদ্র অংশ যদি দুইটি গোলীয় বা একটি গোলিয় ও একটি সমতল তলদ্বারা সীমাবদ্ধ হয় তাহা হইলে মাধ্যমের সেই অংশকে লেন্স বলে।

উত্তল লেন্স (Convex Lens) : যে লেন্সের মধ্যভাগ মোটা এবং দুই প্রান্তের দিক ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে তাহাকে উত্তল লেন্স বলে।

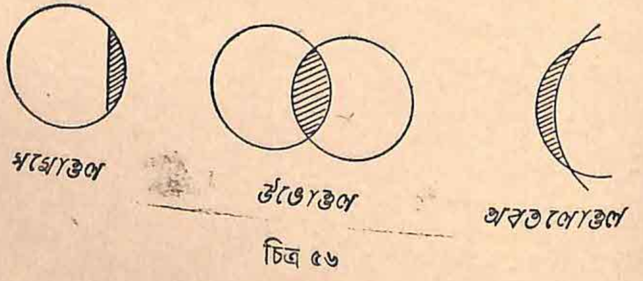
উত্তল লেন্সের দুই তলের আকৃতির উপর নির্ভর করিয়া উত্তল লেন্সকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) উভোত্তল লেন্স (২) সমোত্তল লেন্স (৩) অবতলোত্তল লেন্স।

(১) উভোত্তল লেন্স : যে লেন্সের উভয় পৃষ্ঠ উত্তল থাকে তাহাকে উভোত্তল লেন্স বলে।

(২) সমোত্তল লেন্স : যে লেন্সের একটি পৃষ্ঠ সমতল এবং অপর পৃষ্ঠ উত্তল তাহাকে সমোত্তল লেন্স বলে।

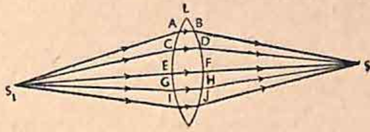
(৩) অবতলোত্তল লেন্স : যে লেন্সের একটি পৃষ্ঠই অবতল এবং অপর পৃষ্ঠ উত্তল তাহাকে অবতলোত্তল লেন্স বলে (চিত্র ৫৬)।



চিত্র ৫৬

উত্তল লেন্সের অভিসারী ক্রিয়া (Focussing action of a convex lens):

মনে করা যাউক কোন বস্তুবিন্দু S_1 হইতে S_1A আলোক রশ্মি উত্তল লেন্স L এর উপর A বিন্দুতে পড়িল। আলোক রশ্মিটি বায়ু মাধ্যম হইতে কাঁচ মাধ্যমে প্রবেশ করিবার ফলে উহা A বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্বের দিকে ঘেঁসিয়া AB পথে যাইবে। কারণ বায়ু অপেক্ষা কাঁচ ঘনতর মাধ্যম। B বিন্দুতে কাঁচ হইতে আবার বায়ুতে নির্গত হইবার সময় উহা অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া BS_2 পথে যাইবে। S_1 বিন্দু হইতে S_1C অন্য একটি আলোক রশ্মি লেন্সের C বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্বের উপর পূর্বের তুলনায় ক্ষুদ্রতর কোণে আপতিত হইবে এবং ফলে উহা কম বাঁকিবে। ঐ রশ্মি CD পথে যাইয়া D বিন্দু হইতে নির্গত হইবে। একই ভাবে লেন্সের মধ্যস্থলে আপতিত S_1E রশ্মি লেন্সের উপর অভিলম্ব ভাবে পড়িয়া প্রতিসৃত না হইয়া সোজা পথে চলিয়া যাইবে।এক্ষেত্রে S_1A, S_1C, S_1E সকল আলোক রশ্মিগুলি লেন্স কর্তৃক প্রতিসৃত হইয়া S_2 বিন্দুর মধ্য দিয়া যাইতেছে। লেন্সের পৃষ্ঠদ্বয় গোলকের অংশ হওয়ায় S_1 বিন্দু হইতে যে সকল আলোক্ রশ্মি উত্তল লেন্স L এর উপর পড়িবে উহারা লেন্স কর্তৃক প্রতিসৃত হইবে এবং প্রতিসৃত সকল রশ্মি একটি বিন্দু S_2 দিয়া যাইবে। ইহাকেই উত্তল লেন্সের অভিসারী ক্রিয়া বলা হয় (চিত্র ৫৭)।



চিত্র ৫৭

উত্তললেন্সের ফোকাস ও ফোকাস দূরত্ব: (Focus and Focal length of a convex lens)

প্রধান অক্ষ: লেন্সের দুইতল গোলীয় হইলে দুই বক্রতাকেন্দ্র সংযোগকারী সরল রেখাকে প্রধান অক্ষ বলে।

প্রধান অক্ষ লেন্সের দুই পৃষ্ঠকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাহাদের বক্রপৃষ্ঠের মেরু বলা হয়।

আলোক কেন্দ্র: কোন আলোক রশ্মি লেন্সের এক পৃষ্ঠে আপতিত হইয়া লেন্স কর্তৃক প্রতিসৃত হইয়া যদি বিপরীত পৃষ্ঠ হইতে আপতিত রশ্মির

সমান্তরালে নির্গত হয় তাহা হইলে লেন্সের মধ্যে এই রশ্মির গতিপথ প্রধান অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দুকে আলোক কেন্দ্র বলা হয়।

ফোকাস : যদি কোন সমান্তরাল রশ্মি বা রশ্মিগুচ্ছ উত্তল লেন্সের 'প্রধান অক্ষের' সমান্তরালে আসে এবং লেন্স কর্তৃক প্রতিসৃত হইয়া অভিসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয়। এই অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাহাকে প্রধান বা দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস বলা হয়। উত্তল লেন্সের প্রধান ফোকাস সদ্।

উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত কোন বিন্দু হইতে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ লেন্সের উপর আপতিত হইলে যদি উহারা প্রতিসরণের পর পরস্পর সমান্তরাল হয় সেই বিন্দুকে লেন্সের প্রথম প্রধান ফোকাস বলা হয়।

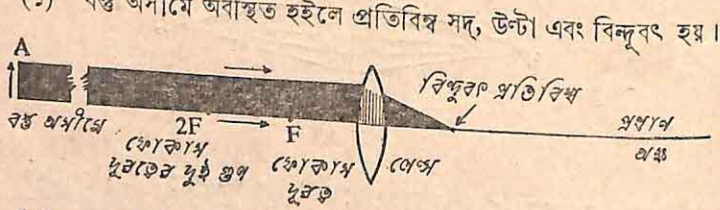
লেন্সের দুইটি প্রধান ফোকাস থাকিলেও সাধারণতঃ দ্বিতীয় প্রধান ফোকাসকে লেন্সের প্রধান ফোকাস বলা হয়।

ফোকাস দূরত্ব : লেন্সের আলোক কেন্দ্র হইতে ফোকাস এর দূরত্বকে ফোকাস দূরত্ব বলা হয়।

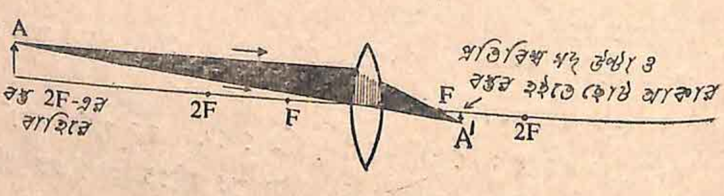
সদ্ ও অসদ্ প্রতিবিম্ব : কোন বস্তু হইতে নির্গত আলোক রশ্মি লেন্সের মধ্য দিয়া প্রতিসৃত হইয়া যদি প্রকৃতই কোন বিন্দুতে মিলিত হয় তাহা হইলে সেই বিন্দুকে বস্তুর সদ্ প্রতিবিম্ব বলা হয়। যদি রশ্মিগুলি প্রতিসৃত হইবার পর অন্য কোন বিন্দু হইতে আসে বলিয়া মনে হয় তাহা হইতে সেই বিন্দুকে বস্তুর অসদ্ প্রতিবিম্ব বলা হয়।

উত্তল লেন্সের দ্বারা বিভিন্ন দূরত্বে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবিম্ব গঠন :

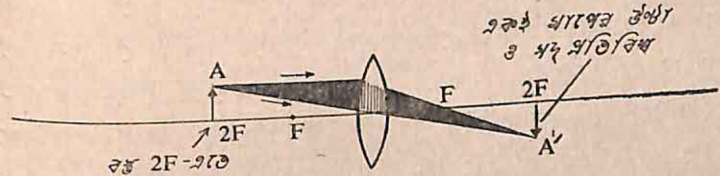
(১) বস্তু অসীমে অবস্থিত হইলে প্রতিবিম্ব সদ্, উল্টা এবং বিন্দুবৎ হয়।



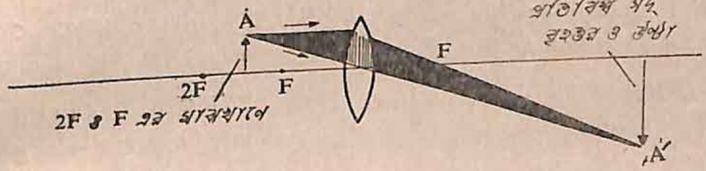
(২) বস্তু ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণের বাহিরে অবস্থিত হইলে প্রতিবিম্ব সদ্ উল্টা এবং বস্তু হইতে ক্ষুদ্রতর হয়। ক্যামেরায় উত্তল লেন্সকে এই অবস্থানে বসানো হয়।



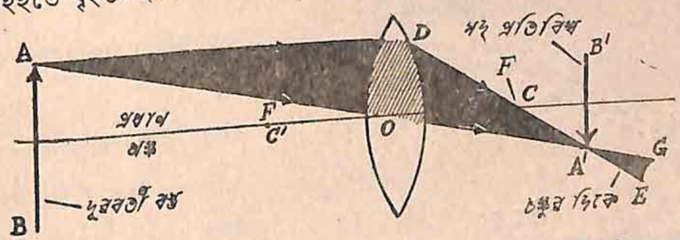
(৩) বস্তু ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরে অবস্থিত হইলে প্রতিবিম্ব সদ্, উল্টা এবং বস্তুর আকৃতির সমান হয়। ভৌম দূরবীক্ষণে এই অবস্থানে লেন্স বসানো হয়।



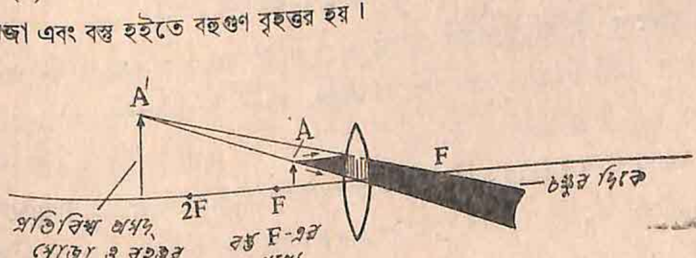
(৪) বস্তু ফোকাস এবং ফোকাসের দ্বিগুণ দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত হইলে প্রতিবিম্ব সদ্, উল্টা এবং বস্তু হইতে বৃহত্তর হয়।



(৫) বস্তু প্রধান ফোকাসে অবস্থিত হইলে প্রতিবিম্ব সদ্, উল্টা এবং বস্তু হইতে বৃহত্তর হয়।



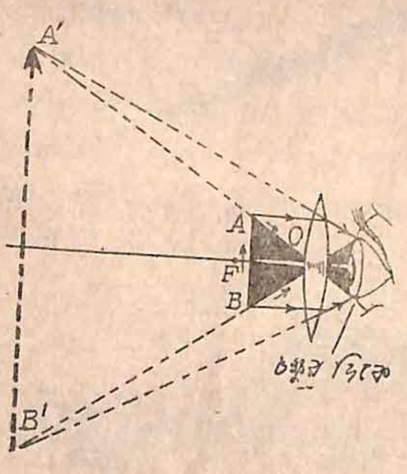
(৬) বস্তু ফোকাস এবং লেন্সের মধ্যে অবস্থিত হইলে প্রতিবিম্ব অসদ্' সোজা এবং বস্তু হইতে বহুগুণ বৃহত্তর হয়।



বিবর্ধক কাঁচ হিসাবে উত্তল লেন্স :

যে উত্তল লেন্সের সাহায্যে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখানো হয় তাহাকে বিবর্ধক কাঁচ বলা হয়। A B ক্ষুদ্র বস্তুকে একটি উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে রাখা হইল। A এবং B বিন্দু হইতে যে আলোক রশ্মিগুলি লেন্সের অক্ষের সমান্তরাল ভাবে লেন্সের উপর পড়িবে. উহারা ফোকাস বিন্দুর মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবে। আর যে রশ্মি লেন্সের আলোক কেন্দ্রে আপতিত হইবে ও উহা প্রতিস্থত না হইয়া সরাসরি নির্গত হইবে। এই রশ্মিগুলি পিছনে অবস্থিত A^1B^1 হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইবে। এইরূপে লেন্স A B বস্তুর সোজা, অসদ্, এবং বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব A^1B^1 গঠন করিবে (চিত্র ৩২)।

লেন্সের অপর পার্শ্বে চোখ রাখিলে A B বস্তুর পরিবর্তে বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব A^1B^1 দেখা যাইবে। বস্তু হইতে লেন্সের দূরত্ব নিয়ন্ত্রিত করিলে চোখ দ্বারা ঐ বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যাইবে। যাহা খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যায় না, এইরূপ ছোট জিনিষ যেমন ছোট অক্ষর, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদিকে বড় করিয়া দেখিবার জন্য এই বিবর্ধক কাঁচ ব্যবহৃত হয়। ইহা আসলে কম ফোকাস দূরত্ব বিশিষ্ট একটি উত্তল লেন্স (চিত্র ৩৪)।



চিত্র ৩৩

আলোকের বিচ্ছুরণ (Disperson of light) :

কোন কাঁচের প্রিজ্‌মের একটি প্রতিসরণ পৃষ্ঠের উপর সাদা আলো (যেমন সূর্যের আলো) ঐ পৃষ্ঠের সহিত হেলান ভাবে পড়িলে প্রিজ্‌ম কর্তৃক প্রতিসরণের পর উহা সাতটি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিতে বিশ্লিষ্ট হয়। ইহাই হইল আলোকের বিচ্ছুরণ।

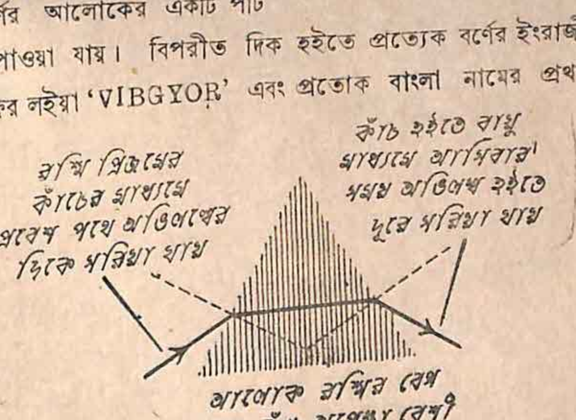
1666 খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন আলোক বিচ্ছুরণের ধর্ম আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন যে, সাদা আলো আসলে যৌগিক, ইহা সাতটি বিভিন্ন মূল বর্ণের আলোর সংমিশ্রণে গঠিত।

কোন মিশ্র আলোর বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইবার ঘটনাকে আলোক বিচ্ছুরণ বলা হয়। যৌগিক আলোর বিচ্ছুরণ সম্ভব কিন্তু এক বর্ণের আলোকের বিচ্ছুরণ সম্ভব নহে।

পরীক্ষা : একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়া সাদা আলোক (সূর্যরশ্মি বা অন্য কোন সাদা আলোক) প্রবেশ করাইয়া একটি প্রিজমের প্রতিসরক তলের উপর ফেলা হইলে সাদা আলোক প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়া দুইবার প্রতিসৃত হইয়া সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোকে বিশ্লেষিত হয় এবং বিশ্লিষ্ট আলোক রশ্মি বিভিন্ন কোণে প্রিজ্‌মের ভূমির দিকে বাঁকিয়া যায়। প্রিজ্‌মের পিছনে রাখা একটি সাদা পর্দায় পর্দার উপর হইতে নীচের দিকে লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, গাঢ় নীল, বেগুনী এই সাতটি বর্ণের আলোকের একটি পটি দেখিতে পাওয়া যায়। বিপরীত দিক হইতে প্রত্যেক বর্ণের ইংরাজী নামের প্রথম অক্ষর লইয়া 'VIBGYOR' এবং প্রত্যেক বাংলা নামের প্রথম অক্ষর



চিত্র ৩৪ বিবর্ধক কাঁচের সাহায্যে ছোট লেখা পড়িতে কষ্ট হয় না।



লইয়া 'বেনীআসহকলা' শব্দ দুইটির যে কোন একটিকে সাতটি বর্ণের নাম হজে মনে রাখিবার জন্য ব্যবহার করা যায়।

বর্ণালী (**Spectrum**) : আলোক বিচ্ছুরণের ফলে বিভিন্ন রংয়ের যে আলোক পটি পর্দার উপর দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে বর্ণালী বলা হয়। রামধনুতে সব রং স্পষ্ট না হইলেও উহাতে সাতটি বিভিন্ন প্রকারের রং দেখিতে পাওয়া যায়। রামধনু সাদা আলোর বিচ্ছুরণের একটি প্রাকৃতিক বর্ণালী।

রসায়ন



গবেষণারত কুরী দম্পতি। পলোনিয়াম্ ও রেডিয়াম্
আবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করেন—নিষ্ঠা, কঠোর
পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা অসম্ভবকে
সম্ভব করা যায়।

প্রথম অধ্যায়

পদার্থের অবস্থাভেদ

পৃথিবীতে আমরা অনেক রকম পদার্থ দেখিতে পাই। অর্থাৎ পৃথিবী পদার্থময়। বিভিন্ন পদার্থের বর্ণ, স্বাদ, গন্ধও বিভিন্ন।

যেমন কাঁচ একটি পদার্থ যাহা ভঙ্গুর, স্বচ্ছ। কাঠ একটি পদার্থ যাহা আগুনে পোড়ে এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা যায়। চিনি একটি পদার্থ যাহা জলে দ্রব হইয়া যায় ও ইহার স্বাদ মিষ্টি। বাতাসকে আমরা দেখিতে পাই না কিন্তু অনুভব করিতে পারি যখন ইহা প্রবাহিত হয়। শুধু তাই নয় কোন পদার্থ কঠিন কোনটি তরল আবার কোন কোন পদার্থ গ্যাসীয়। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ এই তিনের যে কোন অবস্থাতে দেখা যায়।

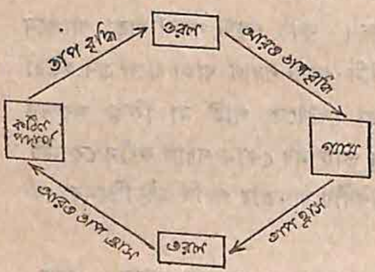
কঠিন পদার্থ : কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে। চাপ প্রয়োগ করিলে কঠিন পদার্থের কিছু পরিবর্তন হয়। কাঠ, ইট, লোহা, কাঁচ ইত্যাদি কঠিন পদার্থ।

তরল পদার্থ : তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আকার নাই। কিন্তু নির্দিষ্ট আয়তন আছে। যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। এক গ্লাস জল একটি থালায় ঢালিলে জল থালার আকার ধারণ করে, কিন্তু আয়তন একই থাকে। ইহা সর্বদাই নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। তরল পদার্থের উপরিভাগ সর্বদাই সমতল থাকে। জল ,তেল, দুধ ও পারদ ইত্যাদি তরল পদার্থ।

গ্যাসীয় পদার্থ : গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোন আকারও নাই আয়তনও নাই। গ্যাসীয় পদার্থ যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ও আয়তন লাভ করে। যেমন একটি ছোট বেলুন হইতে গ্যাস বাহির করিয়া বড় বেলুনে ঢুকাইলে গ্যাসের আকার ও আয়তন হইবে বড় বেলুনের মত। অর্থাৎ, ছোট বেলুনের গ্যাস দিয়া একটা বড় বেলুন ভরা যায়, কিন্তু একটি ছোট পাত্রের জল দিয়া বড় পাত্র ভরা যায় না। গ্যাসীয় পদার্থের সঙ্কোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা বেশী।

নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একটি গ্যাসীয় পদার্থের উপর যত চাপ দেওয়া যায় ততই উহার আয়তন কমিয়া যায় ; আবার চাপ কমাইয়া দিলে উহার আয়তন প্রসার লাভ করে। বায়ু, হাইড্রোজেন ইত্যাদি গ্যাসীয় পদার্থ।

পাদর্থের অবস্থান্তর : পদার্থের এই তিন প্রকার অবস্থা সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ একই পদার্থ তিনটি বিভিন্ন অবস্থাতেই থাকিতে পারে। যেমন বরফ, জল ও বাষ্প একই পদার্থ, একই উপাদানে গঠিত। কঠিন বরফকে উষ্ণ করিলে তরল অবস্থায় অর্থাৎ জলে পরিণত হয় এবং জলকে ফুটাইলে বাষ্পে পরিণত হয়। সকল ক্ষেত্রেই উত্তাপের সাহায্যে কঠিন হইতে তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণতি সম্ভব। মোট কথা পদার্থের এই অবস্থা তাপ ও চাপের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য, বিভিন্ন পদার্থের এই অবস্থান্তর ঘটাইতে বিভিন্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। জল যতটুকু উষ্ণ করিলে বাষ্পে পরিণত হয়, পারদকে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তর করিতে হইলে উহা অপেক্ষা অনেক বেশী উষ্ণ করিতে হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায় যে উত্তাপের সাহায্যে কঠিন অবস্থা হইতে সরাসরি গ্যাসীয় অবস্থায় যাওয়া যায়। যেমন কর্পূর, আয়োডিন ইত্যাদি। সকল বস্তুই যে উত্তাপের সাহায্যে কঠিন হইতে তরল হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কাঠকে খুব উত্তপ্ত করিলে অঙ্গারে পরিণত হইয়া যায়, তরলতা আসে না। এক্ষেত্রে কাঠ অন্য পদার্থে পরিণত হয়।



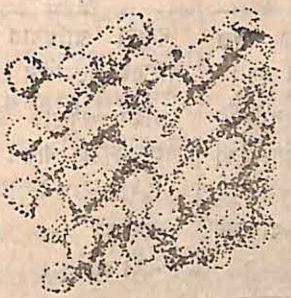
চিত্র ১

তাপের প্রভাবে একই পদার্থের কঠিন হইতে তরল ও তরল হইতে গ্যাসীয় অবস্থার পরিবর্তন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে পদার্থের এই বিভিন্ন তিনটি অবস্থা কিন্তু স্থায়ী নয়।

পদার্থের কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন প্রকার ভৌত অবস্থায় থাকার কারণ :

কঠিন পদার্থের মধ্যে অণুগুলি খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরে সম্মিলিত থাকে। তরল পদার্থের অণুগুলি থাকে দূরে দূরে অথবা শিথিল ভাবে। গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে অণুগুলি থাকে বেশ দূরে দূরে অর্থাৎ এলোমেলো ভাবে। উত্তাপ পাইলেই একটি অণু অপর অণু হইতে দূরে সরিয়া যায়। ফলে কঠিন পদার্থের বেলায় আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সরিয়া যাওয়া অণু-

গুলি আরও উত্তাপ পাইলে একে অপরের কাছ হইতে এলোমেলো ভাবে আরও



কঠিন পদার্থ



তরল পদার্থ



গ্যাসীয় পদার্থ

দূরে যাইতে চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত কঠিন পদার্থ গ্যাসীয় বা বায়বীয় পদার্থের রূপ ধারণ করে।

কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের তুলনা

কঠিন	তরল	গ্যাসীয়
(১) নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে।	নির্দিষ্ট আকার নাই। কিন্তু নির্দিষ্ট আয়তন আছে।	নির্দিষ্ট আকার ও নাই, আয়তন ও নাই।
(২) ঘনত্ব অনেক বেশী।	ঘনত্ব কম।	ঘনত্ব খুব কম।
(৩) ভঙ্গুরতা, নমনীয়তা, প্রসারশীলতা, কাঠিন্য গুণাবলীগুলি দেখা যায়।	ঐ সকল গুণাবলী নাই।	ঐ সকল গুণাবলী নাই।
(৪) আকার বা আয়তনের সহজে পরিবর্তন করা যায় না।	আকার বা আয়তনের সহজেই পরিবর্তন করা যায়।	আকার বা আয়তনের পরিবর্তন অতি সহজেই করা যায়।

কঠিন	তরল	গ্যাসীয়
(৫) ধরিয়া রাখিবার জন্য পাত্রের প্রয়োজন হয় না।	ধরিয়া রাখিবার জন্য পাত্রের প্রয়োজন হয়।	ধরিয়া রাখিবার জন্য পাত্রের প্রয়োজন হয়।
(৬) ছাড়িয়া দিলে কোন দিকে নাও যাইতে পারে।	ছাড়া অবস্থায় সর্বদাই নীচের দিকে গড়াইয়া যায়।	ছাড়া অবস্থায় উপরের দিকে উঠিয়া যায়।
(৭) সঙ্কোচন ও প্রসারণ নাই বলিলেই চলে।	সঙ্কোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা অল্প।	সঙ্কোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা অধিক।

পদার্থের ধর্ম ঃ চিনি একটি কঠিন পদার্থ ইহার স্বাদ মিষ্ট ও ইহা জলে দ্রব হইয়া যায়। শুধু তাই নয় চিনিকে পোড়াইলে কালো রঙের যে বস্তুটি পাওয়া যায় উহা অঙ্গার। এইরূপ সোনা কঠিন, উজ্জ্বল, হলুদবর্ণের ও নমনীয়। রূপা কঠিন, নমনীয় কিন্তু উজ্জ্বল সাদাবর্ণের। আবার জল একটি স্বচ্ছ তরল পদার্থ—ইহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চালনা করিলে জল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। এরূপ উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে যাহাদের আমরা পদার্থ বলি উহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব কতকগুলি ধর্ম বা গুণ আছে। অর্থাৎ প্রতিটি পদার্থ প্রতিটি পদার্থ হইতে পৃথক, পদার্থের এই বিশিষ্ট গুণকে বলা হয় পদার্থের ধর্ম।

পদার্থের ধর্ম জানার প্রয়োজনীয়তা ঃ কোন পদার্থকে জানিতে হইলে উহার ধর্ম-গুলির সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন ; যেমন, জলের কতকগুলি ধর্ম আছে যাহা হইতে সহজেই আমরা জল চিনিতে পারি। জল স্বচ্ছ, জলের হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে 0°C এবং 100°C। জলে খাদ্য লবণ, মিছরি, চিনি, ইত্যাদি দ্রব হইয়া থাকে, বিদ্যুৎ প্রবাহে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। এই সমস্ত এবং আরও অনেক ধর্মের দ্বারা আমরা জলের স্বরূপ চিনিতে পারি।

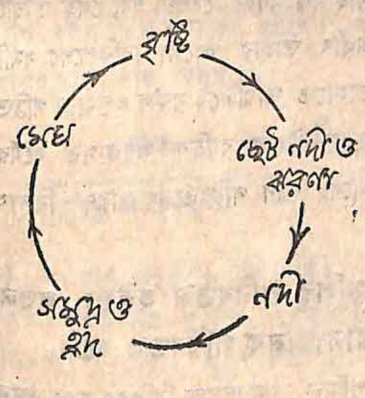
পদার্থের পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের ধর্ম-গুলিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। (১) **ভৌতধর্ম** (Physical properties), (২) **রাসায়নিক ধর্ম** (Chemical properties।

ভৌতধর্ম ঃ যে ধর্মে পদার্থের শুধু বাহিক অবস্থা বা বাহিক গুণের প্রকাশ পায় তাহাকে ভৌতধর্ম বলে। ভৌতধর্ম বলিতে নিম্নলিখিত বাহিক অবস্থা বা গুণগুলিকে বুঝায় ঃ (১) কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় অবস্থা, (২) বর্ণ,

(৩) স্বাদ, (৪) হিমাঙ্ক, গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক (৫) জলে বা অন্য তরল পদার্থে দ্রবনীয়তা, (৬) ঘনত্ব (৭) চৌম্বক শক্তি (৮) তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণের ক্ষমতা ইত্যাদি।

রাসায়নিক ধর্ম: যে ধর্মে পদার্থের গঠন এবং ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকে রাসায়নিক ধর্ম বলে। রাসায়নিক ধর্ম নির্ণয়ের জন্য সাধারণত (১) জল, (২) বায়ু, (৩) উত্তাপ, (৪) অ্যাসিড এবং ক্ষার নামক বিশেষ পদার্থ বা অন্যান্য পদার্থের সংযোগে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটে কিনা এবং পদার্থটির আভ্যন্তরীন গঠনের পরিবর্তন হয় কিনা পরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের ধর্ম বিভিন্ন।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন: আমাদের চারিদিকের বস্তু জগতে প্রতিনিয়ত অংসখ্য পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। পর্বতের উপরের কঠিন তুষার গলিয়া জল হইতেছে; নদী ও সমুদ্রের জল সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্প হইয়া মেঘ সৃষ্টি করিতেছে এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি হইতেছে; ছোট একটি আমের আঁটি হইতে একটি বিরাট আম গাছ হইতেছে এবং সেই গাছে ক্রমে আম হইতেছে; এইরূপ বহু পরিবর্তন প্রকৃতিতে আপনা আপনি হয়। পরিবর্তন প্রকৃতির একটি অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। আবার আমরা নিজেরাও অহরহ শক্তির সাহায্যে বস্তুর নানাপ্রকার পরিবর্তন সাধন করি। যেমন, রান্নাঘরে কয়লা, কাঠ কয়লা পুড়িয়া ছাই হইতেছে। মোটর-গাড়ীতে পেট্রোল পুড়িয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ ও আরও অনেক গ্যাসীয় পদার্থ হইতেছে। ফুটন্ত জলে চাউল ভাতে পরিণত হইতেছে। আবার সেই চাউল ভিন্ন প্রক্রিয়ায় চিড়া, মুড়ি, খৈ ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হইতেছে। অর্থাৎ এই রকম অসংখ্য পরিবর্তন বস্তুজগতের স্বাভাবিক ঘটনা।



চিত্র ২—জলচক্র

একটু লক্ষ্য করিলে করিলে দেখা যায়, বস্তুজগতে প্রতিনিয়ত যে অসংখ্য পরিবর্তন ঘটিতেছে উহারা সব একরকম নয়। সুতরাং বস্তুজগতে পরিবর্তন ঘটে দুইভাবে—এক রকম পরিবর্তনে পদার্থের গঠনে কোন পরিবর্তন হয় না।

কিন্তু অন্য রকম পরিবর্তনে পদার্থ সম্পূর্ণরূপে অন্য পদার্থে পরিবর্তিত হইয়া যায়। সেইজন্য বস্তুর এইসব পরিবর্তনকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়:—(১) ভৌত-পরিবর্তন (Physical change) এবং (২) রাসায়নিক পরিবর্তন (Chemical change)।

যে পরিবর্তনে পদার্থের শুধু বাহ্যিক পরিবর্তনই হয়, কিন্তু যে সকল অণু দ্বারা পদার্থটি গঠিত উহাদের কোন পরিবর্তন হয় না, তাহাকে ভৌত পরিবর্তন বলে।

উদাহরণ: (১) জল উত্তপ্ত করিলে বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পকে শীতল করিলেই আবার জল পাওয়া যাইবে। বরফ, জল ও বাষ্প এই তিন অবস্থার পরিবর্তনে অবস্থার প্রকারভেদ ঘটিয়াছে সত্য, অর্থাৎ জলের আয়তন, ঘনত্ব, স্বচ্ছতা ইত্যাদি গুণ লোপ পাইয়াছে, কিন্তু জল, বাষ্প ও বরফের অণুগুলি একই রহিয়াছে বস্তুতঃ, ইহাতে পদার্থের মূলগঠনের কোন পরিবর্তন হয় নাই। এক্ষেত্রে পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনের কারণ—তাপ।

(২) বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতরের সরু তারটি আলো বিকিরণ করিতে থাকে। যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, সেই তারটি তখন আর আলো দিতে সক্ষম হয় না, অর্থাৎ তাহার আলো বিকিরণের ধর্মটি আর থাকে না। এই যে পরিবর্তন তাহাতে তারটি যে সকল অণুদ্বারা গঠিত তাহাদের কোন্ পরিবর্তন হয় নাই; কেবল উহার বাহ্যিক অবস্থাগত ধর্মের ব্যতিক্রম হইয়াছে মাত্র। বৈদ্যুতিক বাল্বের এরূপ পরিবর্তনের কারণ—বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ সৃষ্ট তাপ।

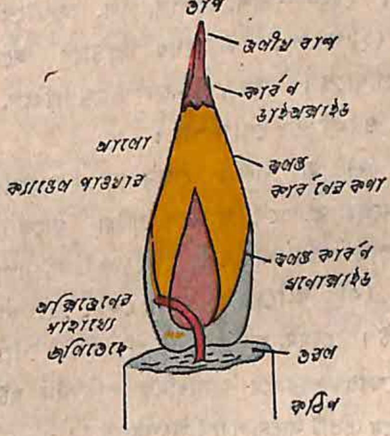
যে পরিবর্তনে পদার্থের অণুগুলির পরিবর্তন হইয়া নূতন পদার্থে রূপান্তরিত হয় তাহাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে।

উদাহরণ: (১) কেরোসিন তেল পুড়িয়া যখন আলো বিকিরণ করে তখন উহা মুখ্যতঃ দুইটি নূতন পদার্থে পরিণতি লাভ করে—কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও বাষ্প। সুতরাং কেরোসিন তেল পোড়ার সময় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

(২) একটু গন্ধক যদি আগুনে পোড়ানো হয় তবে উহা হইতে এক প্রকার ঝাঁঝালো গ্যাস পাওয়া যায়—উহার নাম সালফার-ডাই-অক্সাইড। এই গ্যাসটি গন্ধক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। কারণ সালফার-ডাই-অক্সাইড্ অণু, গন্ধক ও অক্সিজেনের পরমাণু দ্বারা গঠিত। সুতরাং গন্ধক পোড়ার সময় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

(৩) প্রজ্বলনের ফলে কঠিন মোম গলিয়া তরল মোমে পরিণত হয়। আবার তরল মোম অক্সিজেনের সাহায্যে জ্বলিয়া গ্যাসীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। মোমের এই কঠিন হইতে তরল, তরল হইতে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তর একটি ভৌত পরিবর্তন।

তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরল মোম অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করিয়া প্রথমে কার্বন মনো-ক্সাইড এবং পরে কার্বন-ডাই-অক্সাসাইড, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি নূতন যৌগ গঠন করে এবং সেই সঙ্গে আলোক শক্তির বিকিরণ ঘটে। ইহা একটি রাসায়নিক পরিবর্তন।



চিত্র ৩

দহন শেষে মোমবাতিটির কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না দেখিয়া পদার্থটির সম্পূর্ণ বিনাশ হইল মনে করা ভুল হইবে। কারণ এক্ষেত্রে সমগ্র পদার্থটির অন্যরূপে রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের তুলনা

ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
(১) পদার্থের অণুগুলির গঠন ঠিকই থাকে। কেবলমাত্র পদার্থের অবস্থার রূপান্তর ঘটে। কোন নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় না।	(১) পদার্থের অণুগুলির গঠন পরিবর্তিত হয়, ফলে ধর্মের আমূল পরিবর্তন হয়।
(২) এই পরিবর্তন অস্থায়ী, সহজেই পরিবর্তিত পদার্থকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায়।	(২) এই পরিবর্তন স্থায়ী এবং পরিবর্তিত পদার্থকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায় না।
(৩) এই পরিবর্তনে পদার্থের ওজন বাড়েও না কমেও না।	(৩) এই পরিবর্তনে পদার্থের ওজন হয় কমিবে অথবা বাড়িবে।
(৪) এই পরিবর্তনে তাপের কোন উদ্ভব বা শোষণ হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে	(৪) এই পরিবর্তনে তাপের উদ্ভব বা শোষণ হইবেই।

রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণ: কোন পদার্থের উপর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য কোন না কোন প্রকার প্ররোচনা বা কারণ দরকার হয়। যেমন—তাপ, সংস্পর্শ, চাপ, অণুঘটকের প্রভাব ইত্যাদি।

(১) **তাপ:** উত্তাপের প্রভাবে অনেক সময় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। যেমন, চিনিকে উত্তপ্ত করিলে, সাদা চিনি কালো অঙ্গারে পরিণত হয়, ও মিষ্ট স্বাদ লোপ পায়।

(২) **সংস্পর্শ:** কোন কোন পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন আর একটি পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে ঘটিয়া থাকে। যেমন, ফসফরাস, আয়োডিনের সংস্পর্শে আসা মাত্র জ্বলিয়া উঠে ও একটি সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ সৃষ্টি করে।

(৩) **আলো:** কোন কোন সময় আলোর প্রভাবে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। যেমন, হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণ গ্যাসের মিশ্রণ সূর্য্যালোকে ধরামাত্র বিস্ফোরণ সহকারে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নামে একটি নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে।

(৪) **বিদ্যুৎ:** জলের ভিতর বিদ্যুৎ চালনা করিলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। কোন কোন সময়ে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের প্রভাবে রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। যেমন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের প্রভাবে প্রায় 3000°C উষ্ণতায় মিলিত হইয়া নাইট্রিক-অক্সাইড উৎপন্ন করে।

(৫) **চাপ:** কোন কোন সময় চাপের প্রভাবে পদার্থগুলির মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। যেমন, ভুঁইপটকার উপর জোরে আঘাত করিলে বা ছুঁড়িয়া মারিলে শব্দ হয়। ভুঁই পটকার মধ্যে যে পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং সালফারের মিশ্রণ থাকে উহাদের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

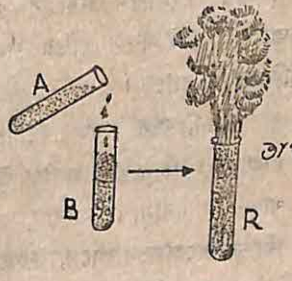
(৬) **শব্দ:** কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দের সাহায্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। যেমন, অ্যাসিটিলিন গ্যাসের মধ্যে বা অতি নিকটে প্রচণ্ড শব্দ করিলে গ্যাসটি বিশ্লিষ্ট হইয়া ছোট ছোট অঙ্গারের কণা ও হাইড্রোজেন গ্যাস সৃষ্টি করে।

(৭) **অনুঘটক:** কোন কোন ক্ষেত্রে অনুঘটকের সাহায্যে পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। পটাসিয়াম ক্লোরেটকে অতি সহজেই অল্প তাপে যেমন ম্যাঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড্ দ্বারা পটাসিয়াম ক্লোরাইড ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট করা যায়।

বিশেষ করিয়া দুইটি পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক মিলনের দ্বারা রাসায়নিক পরিবর্তন সৃষ্টি করিতে এইরূপ অনুঘটকের প্রয়োজন হয়। যেমন, সালফার

ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস ও অক্সিজেন গ্যাস উত্তপ্ত প্লাটিনামের সংস্পর্শে দ্রুত মিলিত হইয়া সালফার ট্রাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রে প্লাটিনাম অনুঘটক।

রাসায়নিক পরিবর্তনে তাপের বিনিময়ঃ প্রত্যেক রাসায়নিক পরিবর্তনেই তাপ বিনিময় হইয়া থাকে। কোন কোন পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় তাপ বাহির হইয়া আসে অথবা পদার্থগুলি তাপ গ্রহণ করে। **যে সকল রাসায়নিক পরিবর্তনে তাপের উদ্ভব হয় তাহাদিগকে তাপ উদগারী পরিবর্তন** (Exothermic change) বলে। অর্থাৎ তাপ উদগারী পরিবর্তনকে এইভাবে ও উল্লেখ করা যায় (চিত্র ৪)।

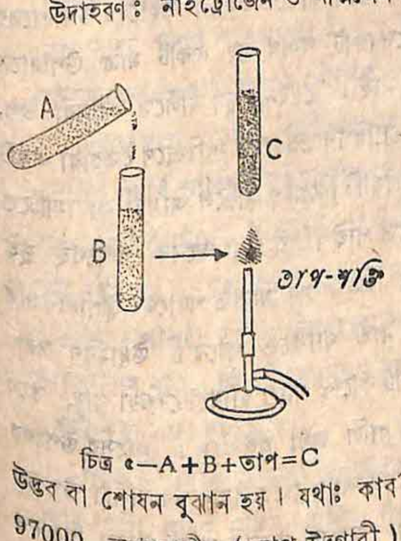


চিত্র ৪—A+B=R+তাপ

উদাহরণ : বায়ুতে কয়লা পোড়াইলে কয়লা কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ গ্যাসে ও ছাইয়ে পরিণত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে কয়লার এই পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন। কয়লার এই পরিবর্তনের সময় তাপের উদ্ভব হয়। অতএব কয়লার এই রাসায়নিক পরিবর্তন তাপ উদগারী পরিবর্তন।

পক্ষান্তরে যে সকল রাসায়নিক পরিবর্তনে তাপের শোষণ হয় উহাকে তাপ-গ্রাহী পরিবর্তন (Endothermic change) বলে।

উদাহরণ : নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন বিদ্যুৎ প্রভাবে প্রায় 3000°C উষ্ণতায় নাইট্রিক-অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। নাইট্রোজেনের ও অক্সিজেনের এই রাসায়নিক পরিবর্তনকে তাপ-গ্রাহী পরিবর্তন বলে (চিত্র ৫)।



চিত্র ৫—A+B+তাপ=C

কখন কখন ও এই জাতীয় রাসায়নিক পরিবর্তনকে সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করিবার সময় তাপের পরিমাণের সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ চিহ্ন সহ লিখিয়া যথাক্রমে তাপ উদ্ভব বা শোষন বুঝান হয়। যথাঃ কার্বন + অক্সিজেন = কার্বন-ডাই-অক্সাইড + 97000 ক্যালোরী (তাপ-উদগারী)। নাইট্রোজেন + অক্সিজেন = নাইট্রিক অক্সাইড − 43200 ক্যালোরী (তাপ-গ্রাহী)। কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন

হওয়ার সময় তাপের উদ্ভব হয় বলিয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে তাপ উদগারী যৌগ (Exothermic compound) বলে। সেইরূপ, নাইট্রিক-অক্সাইড উৎপন্ন হওয়ার সময় তাপের শোষণ হয় বলিয়া নাইট্রিক-অক্সাইডকে তাপ-গ্রাহী যৌগ (Endothermic compound) বলে।

পদার্থের শ্রেণী বিভাগ : পৃথিবীতে পদার্থ বা বস্তুর সংখ্যা অগনিত ও অজস্র। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি-ক্ষণে আমরা অসংখ্য রকম পদার্থের সংস্পর্শে আসি। এই সকল বিভিন্ন পদার্থ পরস্পর স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকের কতকগুলি নিজস্ব ধর্ম আছে।

যেমন, জল এবং কেরোসিন উভয়ই তরল কিন্তু কেরোসিন দাহ্য অথচ জল দাহ্য নয়। চিনি ও খাদ্য লবণ উভয়ই কঠিন ও দেখিতে একরূপ কিন্তু চিনি মিষ্টি খাদ্য-লবণ নোনা। আবার, অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগে, উহাদের আকার, আয়তন ইত্যাদিও এক নয়, কিন্তু তাহারা একই বস্তু হইতে উৎপন্ন। যেমন, রেল ও ট্রামের লাইন, জলের কলের পাইপ, কলমের নিব, জুতার পেরেক ইত্যাদি সবই বিভিন্ন পদার্থ কিন্তু একই উপাদান লৌহ দ্বারা তৈয়ারী, খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে যেমন রসগোল্লা ও সন্দেশ উহাদের স্বাদ এক নয়, কিন্তু তাহারা একই উপাদানে গঠিত বা একই বস্তু হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ ছানা ও চিনি।

অতএব, পদার্থের কোন শ্রেণীগত বিভাগ করিতে হইলে উহাদের উপাদানের কথাই প্রথমে ভাবিতে হইবে। প্রত্যেকটি পদার্থ যে একটি মাত্র উপাদানে গঠিত হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। যেমন, দুধ বলিতে আমরা জল, মাখন বা স্নেহদ্রব্য, শর্করা, প্রোটিন ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে তৈয়ারী একটি পদার্থ বুঝি। সেই রকম গঙ্গার কাদামাটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা কাদামাটিতে বহু রকমের কঠিন দ্রব্য এবং জল দেখিতে পাই। সুতরাং অনেক পদার্থেই দুই বা ততোধিক বস্তু একত্র মিশ্রিত থাকে। এই সকল মিশ্রিত পদার্থের উপাদানগুলি পদার্থটির সমস্ত অংশে সমান অনুপাতে নাও থাকিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে যদি কিছুটা নদীর জল একটি কাঁচের গ্লাসে রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যায় নীচের দিকে অনেকটা মাটি ও বালি জমা হইয়াছে। গ্লাসের উপরের অংশে জল ও মাটির অনুপাত নীচের অংশের অনুপাতের সমান নয় বলিয়া উপরের জল নীচের জল অপেক্ষা বেশী পরিষ্কার। আবার অনেক পদার্থ আছে, যাহাতে পদার্থটির যে কোন অংশে উপাদানগুলির অনুপাত একরকম। যেমন, দুধ, একটি

গ্লাসে রাখিলে উহার যে কোন অংশে জল বা প্রোটিন বা শর্করার অংশ একই দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে সমস্ত গ্লাসের দুধে একটি মাত্র উপাদান আছে, উহা কাহারও সহিত মিশ্রিত নয়, তাহাদের সমস্ত অংশই এক ভাবে গঠিত।

যে সকল মিশ্রিত পদার্থে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত বিভিন্ন অংশে অ-সমান তাহাদিগকে **অসমসত্ত্ব** পদার্থ (Heterogeneous sub-tance) বলে এবং যে সকল মিশ্রিত পদার্থের সর্বত্রই উপাদানগুলির আনুপাতিক হার সমান তাহাদিগকে **সমসত্ত্ব পদার্থ** (Homogeneous subtsance) বলে।

একটি মাত্র উপাদানে গঠিত পদার্থগুলিকে সাধারণতঃ বিশুদ্ধ পদার্থ বলা হয়। অন্য কোন পদার্থ উহাতে মিশ্রিত নাই বলিয়া বিশুদ্ধ পদার্থ মাত্রই সমসত্ত্ব শ্রেণীর।

এইরূপ বিশুদ্ধ পদার্থের সংখ্যা অগণিত। এই অগণিত বিশুদ্ধ পদার্থগুলিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সুবিধার জন্য দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে— মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ।

যে সকল পদার্থ হইতে বিশ্লেষণের ফলে উহা ব্যতীত নূতন ধর্ম বিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না তাহাদিগকে মৌলিক পদার্থ বা মৌল বলে।

উদাহরণ: স্বর্ণ, লৌহ, গন্ধক, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক, ইহাদের বিশ্লেষণের ফলে কোন নূতন পদার্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু জলকে বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। এই কারণে জলকে মৌলিক পদার্থ বলা যায় না। কিন্তু হাইড্রোজেন হইতে শত চেষ্টা করিয়াও আর কোন নূতন পদার্থ পাওয়া যায় না। সেইজন্য মৌলিক পদার্থের সংজ্ঞা অনুসারে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে মৌলিক পদার্থ বা মৌল বলা হয়।

বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা 105; জড় জগতের সমস্ত বস্তুই মোটামুটি ঐ 105টি মৌলিক পদার্থের দুই বা ততোধিক সংখ্যা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় নব্বইটি মৌলিক পদার্থ প্রাকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পদার্থ প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় এই মৌলিক পদার্থগুলি কৃত্রিমভাবে তৈরী করা সম্ভব হইয়াছে।

পরমাণু বিজ্ঞানীরা এযাবৎ নেপচুনিয়াম, প্লুটনিয়াম, আমেরিকাম ইত্যাদি প্রায় দশটির অধিক কৃত্রিম মৌলিক পদার্থ তৈয়ারী করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

প্রাকৃতিতে মৌলের অবস্থান : বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক মৌলিক পদার্থের মধ্যে প্রায় 2 টি মৌলিক পদার্থ পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্যান্য মৌলের পরিমাণ পৃথিবীতে কম। পৃথিবীর কেন্দ্রে যথেষ্ঠ পরিমাণ লৌহ ও নিকেল আছে। উহার চারিদিক গভীর সিলিকেট পাথরে আবৃত। পৃথিবীর উপরের প্রায় 15 মাইল স্তরকে ভূ-পৃষ্ট বলা হয়। ভূ-পৃষ্টের প্রায় অর্ধেক অংশই অক্সিজেন, এক চতুর্থাংশ সিলিকন এবং বাকী অন্যান্য মৌল দ্বারা গঠিত।



পূর্বে ধারণা ছিল পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নি দ্বারা গঠিত।

সূর্যের চারিপার্শ্বের বায়ুমণ্ডলে কতকগুলি মৌলের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। হাইড্রোজেন তাহার মধ্যে অন্যতম। মানুষের দেহেও অনেকগুলি মৌল আছে। বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের দেহে ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ গন্ধক, আইয়োডিন, কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌলের পরিমাণ শতকরা চারিভাগ। ইহা ছাড়া ক্যালসিয়াম মৌলের পরিমাণ প্রায় 1·5%।



চিত্র ৬

সমস্ত বস্তুজগতের শ্রেণী বিভাগ এইভাবে করা হইয়াছে—

পদার্থের অবস্থাভেদ

- জড়জগৎ
  - সমসত্ত্ব পদার্থ [লৌহ, নাইট্রোজেন, আর্সেনিক, জল, বায়ু, লবণ, অ্যাসিড ইত্যাদি]
    - মিশ্র পদার্থ [বায়ু]
    - বিশুদ্ধ পদার্থ [লৌহ, নাইট্রোজেন, আর্সেনিক জল, লবণ, অ্যাসিড]
      - মৌলিক পদার্থ [লৌহ, নাইট্রোজেন, আর্সেনিক]
        - ধাতু [লৌহ]
        - ধাতু-কল্প [আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি]
        - অধাতু [নাইট্রোজেন]
      - যৌগিক পদার্থ [জল, লবণ, অ্যাসিড]
  - অ-সমসত্ত্ব পদার্থ [মাটি]

যে সকল মৌলিক পদার্থের ভিতর ধাতু ও অধাতুর উভয় শ্রেণীর ধর্ম কিছু কিছু পাওয়া যায় তাহাদের ধাতু-কল্প বলে।

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের তুলনা

মৌলিক পদার্থ	যৌগিক পদার্থ
(১) কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় থাকে।	(১) কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় থাকে।
(২) ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজন করিলেও পদার্থের গুণাবলীর কোন পরিবর্তন হয় না।	(২) বিভাজন করিলে ক্ষুদ্রতর মৌলিক পদার্থে বিভক্ত হয় যাহাদের গুণাবলী পূর্বেকার পদার্থ হইতে ভিন্ন।
(৩) মৌলিক পদার্থের সংখ্যা পৃথিবীতে কম।	(৩) যৌগিক পদার্থের সংখ্যা অসংখ্য।
(৪) ক্ষুদ্রতম কণাকে পরমাণু বলে।	(৪) ক্ষুদ্রতম কণাকে অণু বলে। অণু বিভক্ত করিলে দুই বা ততোধিক পরমাণু পাওয়া যায়।
(৫) কয়েকটি একাধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক মিলনে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়।	(৫) একটি যৌগিক পদার্থের বিভাজনে দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়।

ভৌত ধর্মের পার্থক্য

ধাতু (Metal)	অ-ধাতু (Non-metal)
(১) ধাতু স্বাভাবিক অবস্থায় কঠিন উজ্জ্বল এবং আলোক প্রতিফলনে সক্ষম। ধাতুর উজ্জ্বল্যকে বলা হয় ধাতব উজ্জ্বল্য (metallic lustre)	অ-ধাতু স্বাভাবিক অবস্থায় কঠিন বা গ্যাসীয় এবং অণুজ্জ্বল ও অলোক প্রতিফলনে অক্ষম।
ব্যতিক্রম: মার্কারি স্বাভাবিক অবস্থায় তরল এবং সোনা ও অ্যালুমিনিয়াম ছাড়া চূর্ণ অবস্থায় কোন ধাতুই উজ্জল নয়।	ব্যতিক্রম: ব্রোমিন অ-ধাতু স্বাভাবিক অবস্থায় তরল। আয়োডিন এবং গ্রাফাইট জাতীয় কার্বন উজ্জল এবং হীরকজাতীয় কার্বন আলোক প্রতিফলনে সক্ষম।
(২) ধাতুর ঘনত্ব (density) সাধারণত বেশী অর্থাৎ ধাতু ভারী পদার্থ। ব্যতিক্রনঃ লিথিয়াম, সোডিয়াম পটাসিয়াম ইত্যাদি ধাতু, জলের চেয়েও হালকা।	অ-ধাতুর ঘনত্ব সাধারণত কম সমস্ত অ-ধাতুর মধ্যে উচ্চতম ঘনত্ব। আয়োডিনের (4·9)।
(৩) ধাতু শক্ত, সুদৃঢ় (high tenacity), নমনীয় (malleable) এবং প্রসারশীল বস্তু। ধাতুর উপরে আঘাত করিলে একপ্রকার শব্দ হয়—যাহাকে বলা হয় ধাতব শব্দ (metallic sound)। ধাতু পিটাইয়া তার বা অতি পাতলা পাতে পরিণত করা যায়। সোনা সব চেয়ে সম্প্রসারণশীল। ব্যতিক্রমঃ বিসমাথ ও অ্যান্টিমণি ধাতু হইয়াও ভঙ্গুর বলিয়া ইহাদের চূর্ণ করা যায়।	অ-ধাতু শিথিল, নরম, অনমনীয় ও ও অপ্রসারশীল। কঠিন অ-ধাতু ভঙ্গুর। তাই সালফার, কার্বন, ইত্যাদি চূর্ণ তৈরী করা যায়। শক্ত অ-ধাতুর উপরে আঘাত করিলে কোন শব্দ হয় না।
(৪) ধাতু তাপ ও তড়িৎতের উত্তম পরিবাহী (good conductor)। রূপা সর্বোৎকৃষ্ট এবং তামা পরবর্তী উৎকৃষ্ট তাপ ও তড়িৎ-পরিবাহী ধাতু। ব্যতিক্রম: মার্কারির তাপ ও তড়িৎ পরিবহণের ক্ষমতা কম।	অ-ধাতু তাপ ও তড়িৎ পরিবহণে অক্ষম (non-conductor)। ব্যতিক্রম: হাইড্রোজেন এবং গ্রাফাইট জাতীয় কার্বন যথাক্রমে তাপ ও তড়িৎ পরিবহণে সক্ষম।

রাসায়নিক ধর্মের পার্থক্য

ধাতু (Metal)	অ-ধাতু (Non-metal)
(১) ধাতু পজেটিভ তড়িৎধর্মী (electropositive)। ব্যাতিক্রম: হাইড্রোজেন অধাতু হইলেও পজেটিভ তড়িৎধর্মী।	অ-ধাতু নেগেটিভ তড়িৎ ধর্মী (electro-negative)।
(২) ধাতুর অক্সাইড (CuO, Fe_2O_3, CaO) ধর্মে ক্ষারকীয়। ব্যাতিক্রমঃ কিন্তু জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম, লেড ইত্যাদির অক্সাইড (ZnO, Al_2O_3, PbO) উভয়ধর্মী।	অ-ধাতুর অক্সাইড (SO_2, CO_2, P_2O_5) সাধারণত অ্যাসিড ধর্মী। ব্যাতিক্রম: জল, কার্বন-মনোকসাইড, নাইট্রিক-অক্সাইড (H_2O, CO, NO) ইত্যাদি নিরপেক্ষ অক্সাইড।
(৩) ধাতু সাধানতঃ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) ও সালফিউরিক অ্যাসিডে (H_2SO_4) (দ্রবীভূত হয় এবং হাইড্রোজেন (H_2) প্রতিস্থাপন করে।	অ-ধাতুর মৌলিক পদার্থ হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডে (HCl, H_2SO_4) সাধারণ তাপাঙ্কে দ্রবীভূত হয় না বা বিক্রিয়া ঘটায় না।
(৪) ধাতু হ্যালোজেনের সঙ্গে হ্যালাইড যৌগ গঠন করে। হ্যালাইড সাধারণত জলের সংস্পর্শে স্থায়ী থাকে। কিন্তু $FeCl_3$, $AlCl_3$ জলে আর্দ্র বিশ্লেষিত হইয়া যায়। সাধারণত ধাতব হ্যালাইড অণুদ্বায়ী, কিন্তু স্ট্যানিক ও অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ($SnCl_4$; $AlCl_3$) উদ্বায়ী!	সাধারণত (O, Cl) ছাড়া অ-ধাতু হ্যালাইড গঠন করে। অ-ধাতব মৌলিক পদার্থের হ্যালাইড যৌগের জলের সংস্পর্শে আদ্র-বিশ্লেষণ ঘটে। যেমন, PCl_3। ব্যতিক্রম: কিন্তু কার্বনের হ্যালাইড যেমন, কার্বন-টেট্রা-ক্লোরাইড জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না।
(৫) ধাতু সাধারণত হাইড্রোজেনের সঙ্গে যে কয়েকটি ধাতব যৌগ গঠন করে সেই যৌগগুলি অনুদ্বায়ী (non-volatile). যেমন NaH, CaH_2 ইত্যাদি।	অ-ধাতু হাইড্রোজেনের সঙ্গে যৌগ গঠন করে এবং এরূপ যৌগগুলি উদ্বায়ী (volatile) যেমন, NH_3, CH_4 ইত্যাদি।

যে সকল পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে, দুই বা ততোধিক সরল বা মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় তাহাদিগকে যৌগিক পদার্থ বলে।

প্রকৃতিতে অগণিত যৌগিক পদার্থ আছে এবং বিজ্ঞানীরা তাহাদের পরীক্ষাগারে প্রতিদিন নানারকমে মৌলিক পদার্থগুলিকে রাসায়নিক ভাবে যুক্ত করিয়া নূতন নূতন যৌগিক পদার্থ গঠন করিতেছেন।

উদাহরণ : জল, চিনি, খাদ্যলবণ, কাপড় কাচার সোডা, তেল ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ। চিনিকে বিশ্লেষণ করিলে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন পাওয়া যায়। বিদ্যুৎপ্রবাহ জলকে বিশ্লেষণ করে; ফলে দুইটি মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের মিলনেই যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই মিলন শুধুমাত্র সংমিশ্রণ নয়; ইহাতে মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে গভীরতর রাসায়নিক সংযোগ থাকে। সেইজন্য যৌগিক পদার্থের মধ্যে অবস্থিত উপাদানগুলি অর্থাৎ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থগুলিকে সহজে পৃথক করা যায় না।

যৌগিক পদার্থের গঠনে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বগুলি :

(১) যৌগিক পদার্থ গঠিত হয় একাধিক মৌলিক পদার্থের পারস্পরিক সংযোগে। যেমন—খাদ্যলবণ, দুইটি মৌলিক পদার্থ সোডিয়াম ও ক্লোরিণ দ্বারা গঠিত।

(২) নির্দিষ্ট কোন যৌগিক পদার্থে মৌলিক পদার্থগুলির উপাদান ও পরিমাণ সর্বদাই নির্দিষ্ট। যেমন—জলের ভিতর বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করিলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক যে দুইটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় উহাদের পরিমাণের অনুপাত 1 : ৪

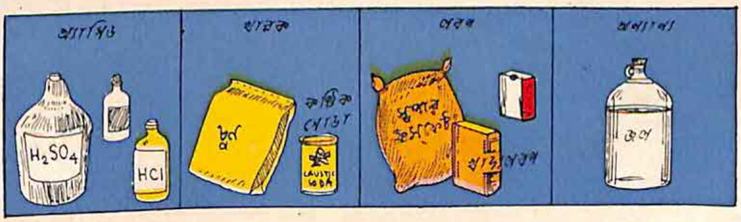
অন্যভাবে বলিতে পারা যায় যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুইটি মৌলিক পদার্থের 1 : ৪ এইরূপ নির্দিষ্ট অনুপাতে রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা যে মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হয় উহার নাম জল।

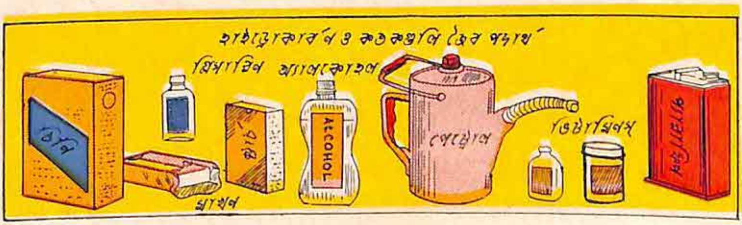
চিনির বেলায়ও এই কথা সত্য, চিনিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে নির্দিষ্ট অনুপাতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনেই সৃষ্টি হয় চিনি।

(৩) মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত হইলেও যৌগিক পদার্থের ধর্ম সেই মৌলিক পদার্থ হইতে আলাদা।

যেমন—চিনি, মিষ্টি, কিন্তু চিনি যে তিনটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত যথা—কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা তৈরী তাহার মধ্যে একটিরও মিষ্টত্ব নাই।





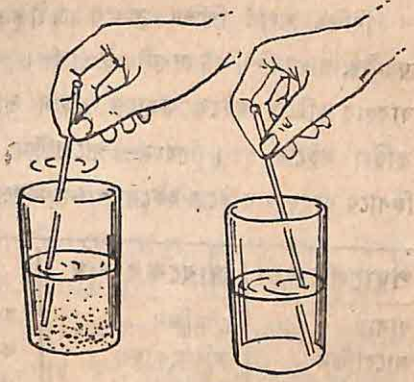


কয়েকটি মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের উদাহরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্রবণ

একটু চিনি যদি জলে মিশান হয় তবে উহা অদৃশ্য হইয়া যায়। জলের তলায় কিছুই পড়িয়া থাকে না। কিন্তু স্বাদ হইতে চিনির অস্তিত্ব জানা যাইবে। চিনি ও জলের উহা একটি মিশ্র পদার্থ; সাধারণতঃ আমরা উহাকে চিনির জল বলি। এই চিনির জলের সর্বত্রই মিষ্টত্বের তীব্রতা একই।



জলে চিনি মিশান হইয়াছে ও জলে চিনি দ্রবীভূত হইতেছে।

চিনির পরিবর্তে একটু তুঁতে জলে মিশাইয়া দিলে, জলে তুঁতে দ্রবীভূত হইয়া যায় ও তুঁতে গোলা জলের রং হয় নীল। উহাও মিশ্র পদার্থ এবং উহার যে কোন অংশে তুঁতের পরিমাণ সমান। অর্থাৎ মিশ্রণগুলি সব সমসত্ত্ব।

দুই বা ততোধিক বস্তু যখন সমসত্ত্ব মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি করে তখন উহাকে দ্রবণ বা দ্রব (solution) বলে।

উল্লেখিত চিনির জলের বেলায়, চিনি দ্রবীভূত হইয়াছে এবং জল চিনিকে দ্রবীভূত করিয়াছে। যে দ্রবীভূত হয় তাহাকে বলে **দ্রাব (solute)** এবং যে দ্রবীভূত করে তাহার নাম **দ্রাবক (solvent)**। অর্থাৎ চিনি দ্রাব, জল দ্রাবক।

দ্রাব + দ্রাবক = দ্রবণ

দ্রাব কঠিন, তরল অথবা গ্যাসীয় পদার্থ হইতে পারে।

দ্রবণ	দ্রাব	দ্রাবক
চিনির জল	চিনি (কঠিন)	জল
স্পিরিট	অ্যালকোহল (তরল)	জল
সোডা-ওয়াটার	কার্বন-ডাই অক্সাইড (গ্যাসীয়)	জল

সচরাচর যদিও জল দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য তরল পদার্থও দ্রাবক হিসাবে কাজ করে। গন্ধক চূর্ণ করিয়া জলে মিশাইলেও দ্রবীভূত হয় না। অর্থাৎ বলা হয় গন্ধক জলে **অদ্রবনীয় (insoluble)**। কিছুক্ষণ ইতস্তত: ঘুরিয়া গন্ধক-চূর্ণের কণাগুলি নিজেদের ভার বশতঃ জলের তলায় আসিয়া সঞ্চিত হয়।

বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়। যেমন—মোম কেরোসিনে দ্রবনীয়, গালা স্পিরিটে দ্রবনীয় ইত্যাদি। এমন বহু কঠিন পদার্থ আছে যাহা ব্যবহার করিতে হইলে উহাকে কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত করিয়া উহার দ্রবণ করিয়া লইতে হয়। যেমন—আয়োডিন কোন কাটা ঘায়ে জীবাণুনাশক হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে অ্যালকোহলে দ্রবীভূত করিয়া লইতে হয়।

পদার্থের নাম	দ্রাবকের নাম	দ্রবণের ব্যবহার
রাবার	বেনজিন	রবারের টায়ারের ছিদ্র বন্ধ করিতে।
আয়োডিন	অ্যালকোহল	কাটা ঘায়ে জীবাণু নাশক হিসাবে।
পিগমেণ্ট	তিষির তেল	তেল রং তৈরী করিতে।
তেল রং	টারপেনটাইন্	তেল রং দূর করিতে অথবা ঘন তেল রংকে পাতলা করিতে।
গালা	অ্যালকোহল	ভার্নিস অথবা ল্যাকার জাতীয় রং তৈরী করিতে।
সেলুলুজ	অ্যামাইল-অ্যাসিটেট্	গাড়ীর রং, নোখের রং ইত্যাদি তৈর করিতে।

এইক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কোন কাপড়ে আলকাতরা বা তৈল জাতীয় কোন দাগ দূর করিতে হইলে কার্বন-টেট্রা-ক্লোরাইড নামক রাসায়নিক পদার্থের সাহায্য লওয়া হয়। সেইরূপ কাপড়ের ময়লা ও দাগ দূর করিতে বিনা জলে বস্ত্র ধৌতকারীরা (Dry cleaners) ট্রাইক্লোরো-ইথিলিন ব্যবহার করে। দ্রাবকের বিশেষত্ব বর্তমান বলিয়া কার্বন-টেট্রা-ক্লোরাইড ও ট্রাইক্লোরো-ইথিলিন এক জাতীয় দ্রাবক।

দ্রবণের বিশেষত্ব :

১। যে কোন দ্রবণই একটি সমসত্ব মিশ্র পদার্থ।

২। দ্রবণের ভিতর উপাদানগুলির ধর্ম ও গুণের সচরাচর কোন পরিবর্তন হয় না।

৩। কোন কোন দ্রবণ তৈরীর করার সময় তাপের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়। যেমন, জলের মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইলে প্রচুর তাপের সৃষ্টি হয় বলিয়া দ্রবণ গরম হইয়া উঠে। ঠিক সেইরূপ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড জলে দ্রবীভূত করিলে তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

৪। তরল দ্রবণের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবক একটি পদার্থের যতটা পরিমাণ দ্রবীভূত করিতে পারে তাহাও নির্দিষ্ট। যেমন— 100°C তাপাংকে 100 গ্রাম জলে মাত্র 36 গ্রাম খাদ্যলবণ দ্রবীভূত করা সম্ভব। এইরূপ অবস্থায় দ্রবণটিকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে।

৫। কোনও কঠিন দ্রাব এক নির্দিষ্ট দ্রাবকে দ্রবীভূত করিলে সেই দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক উপরোক্ত দ্রাবকের স্ফুটনাঙ্ক অপেক্ষা অধিক হয়।

দ্রবণের ধর্মের পরীক্ষা : থার্মোমিটার দিয়া দেখ জলের স্ফুটনাঙ্ক কত। একটু খাদ্য লবণ কিছুটা জলের মধ্যে দ্রবীভূত কর, এবং সেই দ্রবণের তাপাংক লক্ষ্য কর। ইহার পর আরও লবণ দাও, এবং স্ফুটনাঙ্ক লক্ষ্য কর। দেখিবে দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক ক্রমশঃই উর্দ্ধগামী, এবং প্রতিক্ষেত্রেই ইহা দ্রাবকের স্ফুটনাঙ্ক অপেক্ষা অধিক।

দ্রবণের শ্রেণীভাগ :

১। **কঠিন ও তরল পদার্থের দ্রবণ :** যেমন—জলের মধ্যে চিনি, খাদ্য লবণ ইত্যাদি কঠিন পদার্থ মিশ্রিত করিয়া এরূপ দ্রবণ তৈরী করা যায়।

২। **তরল পদার্থের দ্রবণ :** দুইটি তরল পদার্থের দ্রবণ যথা স্পিরিট বা কোহল, নাইট্রিক অ্যাসিড, গ্লিসারিণ ইত্যাদি যে কোন পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহাদের দ্রবণ তৈরী করা যায়।

৩। **তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের দ্রবণ :** যথা—কার্বন-ডাই-অক্সাইড নামক গ্যাসীয় পদার্থ জলে দ্রবীভূত করিয়া সোডা ওয়াটার তৈরী হয়।

৪। **গ্যাসীয় পদার্থের দ্রবণ :** দুইটি গ্যাসীয় পদার্থের দ্রবণ যথা— বায়ু, ইহা নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের দ্রবণ।

৫। **কঠিন পদার্থের দ্রবণ :** দুইটি বা ততোধিক কঠিন পদার্থের দ্রবণ যেমন রৌপ্যমুদ্রা—ইহা রূপা তামা ও নিকেল এই তিনটি কঠিন পদার্থের সমসত্ব মিশ্রণ বা দ্রবণ।

৬। **কঠিন ও গ্যাসীয় পদার্থের দ্রবণ :** কোন কোন ধাতব পদার্থ বিশেষতঃ প্যালাডিয়াম, প্লাটিনাম, লৌহ ইত্যাদি হাইড্রোজেন গ্যাসকে শোষণ

করিয়া লইতে পারে। ধাতুর এই প্রকার গ্যাস-শোষণ কার্য্যকে অন্তর্ধৃতি বলে। প্রকৃত পক্ষে এই অন্তর্ধৃতিতে হাইড্রোজেন কঠিন ধাতুতে দ্রবীভূত হইয়া থাকে, এবং উহাকে উত্তপ্ত করিলেই ধাতু হইতে পুনরায় হাইড্রোজেন বাহির হইয়া আসে। অতএব অন্তর্ধৃত অবস্থায় হাইড্রোজেন ও প্যালাডিয়ামকে দ্রবণ বলা যাইতে পারে।

পরীক্ষাগারে বিশেষ করিয়া যে সমস্ত বোতলে অ্যাসিড থাকে তাহাদের গায়ে কনসেনট্রেটেড বা ডাইলিউট কথাটি লেখা থাকে। ইহাও এক শ্রেণীর দ্রবণ। **দ্রবণে দ্রাবের পরিমাণ অল্প হইলে তাহাকে বলা হয় লঘু দ্রবণ বা ডাইলিউট সলিউশান্ এবং দ্রাবের পরিমাণ বেশী হইলে তাহাকে বলা হয় ঘন দ্রবণ বা কনসেনট্রেটেড সলিউশান্।**

যেমন—লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড বলিতে নাইট্রিক অ্যাসিড ও জলের দ্রবণ বুঝায় উপরন্তু জলের পরিমাণ বেশী ও নাইট্রিক অ্যাসিডের পরিমাণ কম বলিয়া ইহাকে লঘু অ্যাসিড বলে। ঠিক সেইরূপ জলের পরিমাণ কম ও অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী হইলে তাহাকে ঘন বা গাঢ় অ্যাসিড বলে।

দ্রাব্যতা বা দ্রবনীয়তা : সব পদার্থ জলে বা অন্য কোন দ্রাবকে সম-পরিমাণে দ্রবীভূত হয় না। কোন্ পদার্থ কত পরিমাণে জলে বা অন্য কোন্ দ্রাবকে দ্রবীভূত হইবে তাহা নির্ভর করে (ক) দ্রাবের ধর্ম্ম, (খ) দ্রাবকের ধর্ম্ম এবং (গ) দ্রবণের উষ্ণতার উপর।

পরীক্ষা : একটি পাত্রে খানিকটা জল লইয়া উহাতে অল্প অল্প পরিমাণে পটাসিয়াম নাইট্রেট্ চূর্ণ দিতে থাক। প্রথমে উহা দেওয়া মাত্রই দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। পরে আর এত দ্রুত দ্রবীভূত হইবে না। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, উহা আর দ্রবীভূত না হইয়া নীচে জমা হইতেছে। ঐ জলটুকুর পক্ষে যতটা পটাসিয়াম নাইট্রেট্ দ্রবীভূত করা সম্ভব তাহা করিয়াছে। এই রকম দ্রবণকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে। একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায়, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবক একটি পদার্থের যতটা পরিমাণ দ্রবীভূত করিতে পারে তাহাও নির্দিষ্ট **নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে সর্ব্বাধিক পরিমাণ দ্রাব যখন দ্রবীভূত থাকে তখনই দ্রবণটিকে সম্পৃক্ত বলে।**

এইরূপ সম্পৃক্ত দ্রবণকে যদি আরও উত্তপ্ত করা যায় তবে উহা আরও খানিকটা পটাসিয়াম নাইট্রেট্‌কে দ্রবীভূত করিবে। অর্থাৎ উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে

সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ জলে যে পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত হইবে তাহাও বৃদ্ধি পায়। আবার উত্তাপ কমাইলে দ্রবণীয়তা কমিয়া যায়।

কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সর্বাধিক যে পরিমাণ পদার্থকে 100 গ্রাম ওজনের দ্রাবক দ্রবীভূত করিতে পারে, সেই নির্দিষ্ট উষ্ণতায় গ্রাম হিসাবে উক্ত পরিমাণকে ঐ পদার্থের দ্রাব্যতা বলা হয়। যেমন 90°C উষ্ণতায় জলে লবণের দ্রাব্যতা 40 গ্রাম। ইহা হইতে বুঝা যায়, 90°C উষ্ণতায় 100 গ্রাম জলে 40 গ্রাম লবণ দ্রবীভূত করিয়া সম্পৃক্ত দ্রবণ হইতে পারে। বিভিন্ন পদার্থের দ্রাব্যতা অবশ্যই বিভিন্ন। পদার্থের দ্রাব্যতা নির্ণয় করা মোটেই কঠিন নয়।

দ্রাব্যতা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিষয়ঃ

১। দ্রবণ অসম্পৃক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ কোন পদার্থের লঘু দ্রবণে আরও অতিরিক্ত দ্রাব মিশান সম্ভব। যেমন—এক বা দুই চামচ চিনি খানিকটা জলে দিয়া নাড়া মাত্রই উহা দ্রবীভূত হইয়া যায়। চিনি ও জলের এই দ্রবণটিকে লঘু দ্রবণ বলা হয়। এই লঘু দ্রবণে আরও চিনি দিলে উহাও দ্রবীভূত হইয়া যায়। অতএব দ্রবণটি অসম্পৃক্তও বটে।

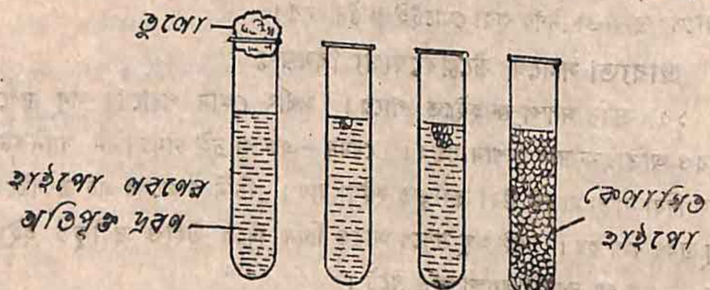
কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট ওজনের দ্রাবকে যে পরিমাণ দ্রাব থাকিলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে তদপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রাব যদি দ্রবণে থাকে তবে দ্রবণটিকে অসম্পৃক্ত দ্রবণ (unsaturated) বলে।

২। যে কোন পদার্থের দ্রাব্যতা, দ্রাবকের উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। সাধারণতঃ দ্রাবকের উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের দ্রাব্যতা বাড়িয়া যায় এবং তাপ কমিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দ্রাব্যতা হ্রাস পায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন—উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পটাসিয়াম নাইট্রেটের দ্রাব্যতা বাড়িয়া যায়। কিন্তু সোডিয়াম সালফেটের ক্ষেত্রে উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার দ্রাব্যতা প্রথমে বৃদ্ধি পায় তারপরে কমিয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে 35°C উষ্ণতায় 100 গ্রাম জলে সোডিয়াম সালফেটের দ্রাব্যতা 50 গ্রাম। কিন্তু 100 গ্রাম জলে 100°C উষ্ণতায় সোডিয়াম সালফেটের দ্রাব্যতা মাত্র 43 গ্রাম।

৩। দ্রাবটি যখন কঠীন পদার্থ না হইয়া গ্যাসীয় পদার্থ হয় তখন উষ্ণতা-

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার দ্রাব্যতা না বাড়িয়া কমিয়া যায়। যেমন—বাতাস জলে কিয়ৎ পরিমাণ দ্রবীভূত হয় এবং জল গরম করিলে সেই বাতাস জল হইতে বাহির হইয়া আসিতে থাকে।

৪। দ্রবণ অতিপৃক্ত (super-saturated) হইতে পারে। কোন কোন সময় সম্পৃক্ত দ্রবণকে এক উষ্ণতা হইতে নিম্নতর উষ্ণতায় লইয়া আসিলে যে পরিমাণে দ্রাব বাহির হইয়া আসার কথা তাহা আসে না। অর্থাৎ **নিম্নতর উষ্ণতায় ততটা দ্রাব দ্রবণে থাকার কথা তাহা হইতে অধিকতর পরিমাণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিলে সেই দ্রবণকে অতিপৃক্ত**



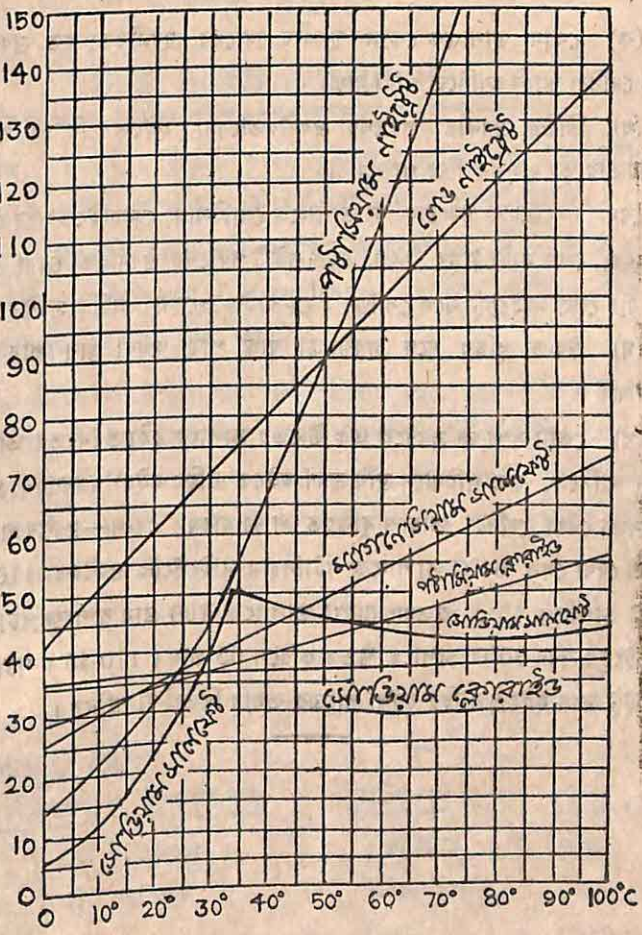
হাইপোর অতিপৃক্ত দ্রবণে অল্প হাইপো দিলে সম্পূর্ণ হাইপো কেলাসিত হইয়া যায় ও থিতাইয়া পড়ে ইহা চতুর্থ পরীক্ষানলে দেখানো হইয়াছে।

দ্রবণ বলে। অতিপৃক্ত দ্রবণ খুব অস্থায়ী ধরণের হয়। একটু নাড়াচাড়া করিলে বা দ্রাবপদার্থের একটুখানি উহাতে দিলেই পরিমাণের অতিরিক্ত দ্রাবটুকু থিতাইয়া পড়ে বা কেলাসিত হইয়া বাহির হইয়া আসে এবং দ্রবণটি সম্পৃক্ত হইয়া যায়।

"দ্রাব্যতা" বা দ্রবণীয়তা রেখা ঃ

যে কোন পদার্থের দ্রাব্যতা দ্রাবকের উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। যেমন– স্বাভাবিক তাপাংকে 100 গ্রাম জলে যত কপার সালফেট দ্রবীভূত হয়, দ্রবণের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিলে কপার সালফেট অধিকতর পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটে। যেমন—100 গ্রাম জলে 35°C উষ্ণতায় যত সোডিয়াম সালফেট দ্রবীভূত হয় 80°C উষ্ণতায় অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিলে অপেক্ষাকৃত অনেক কম সোডিয়াম সালফেট দ্রবীভূত হয়।

উষ্ণতা ও দ্রাব্যতাকে স্থানাঙ্ক ধরিয়া যদি আমরা একটি চিত্র অঙ্কন করি তাহা হইলে পদার্থের দ্রাব্যতার এই পরিবর্তন সহজে বুঝা যাইবে।



দ্রবণীয়তা রেখা

কোন পদার্থের দ্রবণ তৈরীর তাপাংক অনুভূমিক অক্ষ এবং দ্রবণীয়তাকে উল্লম্ব অক্ষরূপে নির্দিষ্ট করিয়া বিভিন্ন তাপাংকে প্রাপ্ত দ্রবণীয়তার সংখ্যাগুলি একটি গ্রাফ কাগজে চিহ্নত করিয়া ঐ সংখ্যাগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করিলে একটি রেখা বা গ্রাফ পাওয়া যায়। সেই রেখা বা গ্রাফকে দ্রাব্যতা বা দ্রবণীয়তা রেখা বা সলিউবিলিটি কার্ভ বলে:

দ্রাব্যতা বা দ্রবণীয়তা রেখার প্রয়োজনীয়তা ঃ

(ক) কোন্ তাপাংকে কোন্ দ্রবনীয় পদার্থের দ্রবনীয়তা কত, দ্রবনীয়তা রেখা দেখিয়া তাহা জানিতে পারা যায়।

(খ) বিভিন্ন দ্রবনীয় পদার্থের দ্রবনীয়তারেখা হইতে বিভিন্ন পদার্থের দ্রবণীয়তার তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়।

যেমন,—100°C উষ্ণতায় বা তাপাংকে সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবনীয়তা 39, এবং লেড নাইট্রেটের 140, এরূপ দুইটি পদার্থের দ্রবনীয়তা রেখা হইতে বলা যায় লেড নাইট্রেট্ জলে সোডিয়াম ক্লোরাইড অপেক্ষা অধিক দ্রবণীয়।

(গ) উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পায় অথবা হ্রাস পায় উহাও জানা যায়।

(ঘ) কোন সম্পৃক্ত দ্রবণকে এক উচ্চতর তাপাংক হইতে নিম্নতর তাপাংকে লইয়া আসিলে, কত পরিমাণে দ্রাব দ্রবণ হইতে বাহির হইয়া থিতাইয়া পড়িবে দ্রবণীয়তা রেখা দেখিয়া তাহাও বুঝিতে পারা যায়। যেমন—দ্রবণীয়তা রেখা হইতে দেখা গেল 60°C তাপাংকে পটাসিয়াম নাইট্রেটের দ্রবণীয়তা 110 এবং 30°C তাপাংকে 45 ; সুতরাং 60°C তাপাংকে 100 গ্রাম সম্পৃক্ত পটাসিয়াম নাইট্রেটের দ্রবণ 30°C তাপাঙ্কে শীতল করিলে 65 গ্রাম (110-45) পটাসিয়াম নাইট্রেট্ দ্রবণ হইতে বাহির হইয়া পাত্রের তলায় থিতাইয়া পড়িবে।

তৃতীয় অধ্যায়

চিহ্ন, সঙ্কেত ও সমীকরণ

রাসায়নিক পরিবর্তন বা বিক্রিয়া সহজে বোধগম্য করার জন্য কতকগুলি চিহ্ন ও সঙ্কেতের সাহায্যে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থগুলিকে প্রকাশ করা হয়।

চিহ্ন ঃ মৌলিক পদার্থের নামের সংক্ষেপকে চিহ্ন বলে। সুইডিস বিজ্ঞানী **বার্জেলিয়াস** (**Berzelius**) মৌলিক পদার্থের চিহ্ন লিখিবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করেন।

সাধারণতঃ নামের আদ্যাক্ষরের দ্বারা মৌল চিহ্নিত হয়; যেমন হাইড্রোজেন H, অক্সিজেন O, কার্বন C ইত্যাদি। একই আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট বিভিন্ন মৌল থাকিলে, উহাদের চিহ্ন নির্ধারণ করিতে প্রথম অক্ষরটির সহিত নামের আর একটি অক্ষর যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ ঐ জাতীয় মৌলগুলির মধ্যে একটিকে শুধু প্রথম অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা যায় যেমন—

নাইট্রোজেন	...	Nitrogen	...	N
নিকেল	...	Nickel	...	Ni

(ক) অনেকক্ষেত্রেই মৌলিক পদার্থের চিহ্ন উহাদের ল্যাটিন নাম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে; যেমন—

বাংলা চলিত নাম		ইংরাজী নাম		ল্যাটিন নাম		চিহ্ন
তাম্র	...	Copper	...	Cuprum	...	Cu
রৌপ্য	...	Silver	...	Argentum	...	Ag

(খ) কতকগুলি মৌলিক পদার্থকে নামের প্রথম অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যেমন—

হাইড্রোজেন	...	Hydrogen	H	ফসফরাস	...Phosphorus	...	P
অক্সিজেন	...	Oxygen	O	ফ্লোরিণ	...Fluorine	...	F
নাইট্রোজেন	...	Nitrogen	N	আয়োডিন	...Iodine	...	I

(গ) কতকগুলি মৌলিক পদার্থকে নামের প্রথম অক্ষর এবং দ্বিতীয় অক্ষর ভিন্ন অন্য একটি অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যেমন—

ক্লোরিণ ... Chlorine ... Cl ; ম্যাগনেসিয়াম ... Magnesium ... Mg

মৌলিক পদার্থের আণবিক সঙ্কেত লিখিবার নিয়ম :

শুধু যদি চিহ্নটি লেখা যায় তবে একটি মাত্র পরামাণু বুঝায়। কিন্তু একাধিক পরমাণু বুঝাইতে হইলে চিহ্নটির নীচে ডান দিকে সেই রাশিটি লিখিতে হয়। P_4 লিখিলে ফসফরাসের চারিটি পরমাণু, H_2 হাইড্রোজেনের দুইটি পরমাণু বুঝায়। মৌলিক পদার্থের অনুগুলি এক বা একাধিক পরমাণু সমবায়ে গঠিত। যথা, H_2 বলিতে দ্বিপরমাণুক হাইড্রোজেন অণুকে বুঝায়। H_2 হাইড্রোজেন অণুর সংকেত। অতএব **চিহ্নের ও সংখ্যার সমন্বয়কে সংকেত বলে।** সেইরকম, ফসফরাস্ অণুর সংকেত লিখিবার সময় P_4 লিখিতে হয়; অতএব বলা যায়, কোন মৌলিক পদার্থের একটি অণুতে যত সংখ্যক পরমাণু থাকে উহাকে তাহার পরমাণুকত্ব (atomicity) বলে।

মনে রাখা দরকার যে একাধিক পরমাণু যদি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে অর্থাৎ অণু গঠন না করিয়া পরমাণু অবস্থার থাকে তাহা হইলে পরমাণুর সংখ্যাটি চিহ্নটির আগে বসাইতে হয়। যেমন, চারিটি হাইড্রোজেন পরমাণু লিখিতে 4H ও 2টি হাইড্রোজেন অণু লিখিতে $2H_2$ লিখিতে হইবে। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে হাইড্রোজেন দ্বিপরমাণুক।

পদার্থ বিদ্‌গণ পরীক্ষার সাহায্যে হাইড্রোজেন অণুর দ্বি-পরমাণুকত্ব নিশ্চিত-রূপে প্রমাণ করিয়াছেন। হাইড্রোজেনের মত অক্সিজেন অণুও দ্বি-পরমাণুক। সাধারণ অবস্থায় গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থসমূহ প্রায়ই দ্বি-পরমণুাক; যেমন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিণ ইত্যাদি।

চিহ্নের আদিক (qualitative) ও মাত্রিক (quantitative) অর্থ :

(১) একটি মাত্র মৌলিক পদার্থকেই বুঝায়।

(২) একটি মাত্র মৌলিক পদার্থের একটি মাত্র পরমাণু বোঝা যায়।

(৩) মৌলিক পদার্থটির পারমাণবিক ওজনের আপেক্ষিক পরিমাণ বুঝায়। যেমন, C বলিতে বুঝায় একটি কার্বন পরমাণু এবং আপেক্ষিক ওজন হিসাবে 12 ভাগ কার্বন। সেইরূপ, H বলিতে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও 1 ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন বুঝা যাইবে।

কতকগুলি মৌলিক পদার্থের চিহ্ন ও উহাদের পরমাণুকত্ব (atomicity) :

রাসায়নিক বিক্রিয়া ও সমীকরণ বুঝিবার সুবিধার জন্য ধাতু ও কার্বনের ন্যায়

কঠিন, তরল ও নিষক্রিয় মৌলিক পদার্থের অণুগুলিকে এক-পরমাণুক ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। যথা: Na, K, Hg, He, Mg, Fe, C ইত্যাদি।

যৌগিক পদার্থের সঙ্কেত: যৌগিক পদার্থগুলিকে তাহাদের নামের পরিবর্তে কতকগুলি চিহ্নের সমন্বয়ে অর্থাৎ সঙ্কেতে প্রকাশ করা যায়। যৌগিক পদার্থগুলি একাধিক মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। এই সব গঠনকারী মৌলিক পদার্থের চিহ্নের সাহায্যে যৌগিক পদার্থটির সঙ্কেত প্রকাশ করা হয়। যেমন, খাদ্য লবণ সোডিয়াম (Na) এবং ক্লোরিণ (Cl) এই দুই মৌলিক পদার্থের সংযোগে তৈয়ারী। অতএব এই লবণের সংকেত NaCl। যে সমস্ত পরমাণু দ্বারা যৌগিক পদার্থটির অণু গঠিত তাহারও নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। লবণের অণুতে একটি সোডিয়াম পরমাণু ও একটি ক্লোরিণ পরমাণু একত্র যুক্ত থাকে। আবার কাপড় কাঁচার সোডার প্রতিটি অণুতে দুইটি সোডিয়াম, একটি কার্বন ও তিনটি অক্সিজেন থাকে। অতএব সোডার সঙ্কেত Na_2CO_3 হইবে। সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্কেত H_2SO_4। ইহার প্রতিটি অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন, একটি সালফার ও চারিটি অক্সিজেন পরমাণু আছে। দেখা যাইতেছে প্রতিটি চিহ্নের নীচে ডানদিকের রাশি দ্বারা সঙ্কেতের মধ্যে সেই সেই পরমাণুর সংখ্যা নির্দেশ করা হয়। কেবল সঙ্কেতটি লিখিলে যৌগিক পদার্থের একটি মাত্র অণু বুঝায়। একাধিক অণু বুঝাইতে হইলে সঙ্কেতটির পূর্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি লিখিতে হয়। যেমন, 7টি সালফিউরিক অ্যাসিডের অণুর সঙ্কেত $7H_2SO_4$। জলের সঙ্কেত H_2O কিন্তু তাহা বলিয়া এক গ্লাস H_2O দাও বলিলে ভুল হইবে, কারণ এক গ্লাস জলে অসংখ্য জলের অণু আছে।

সঙ্কেতে বিভিন্ন চিহ্নগুলিকে সাজানোর রীতি: জল যদি OH_2; সালফিউরিক অ্যাসিড যদি O_4H_2S অথবা SH_2O_4 লেখা হয় তাহাতে অর্থের কোন ব্যতিক্রম হয় না। অতএব ঐ ভাবে লিখিলে কোন ভুল হয় না। কিন্তু জলের সঙ্কেত H_2O এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের H_2SO_4 লেখার রীতি প্রচলিত। সাধারণতঃ সঙ্কেতে বিভিন্ন চিহ্নগুলি সাজানোর সময় এই নিয়মগুলি অণুসরণ করা হয়।

(ক) যে যৌগিক পদার্থের অণু শুধু ধাতু ও অধাতুর দ্বারা গঠিত সে অণুর সঙ্কেতে ধাতুজাতীয় মৌলিক পদার্থের চিহ্ন আগে লিখিতে হয়। খাদ্য লবণের সঙ্কেত লিখিতে NaCl, লেখা হয় ও Na ধাতু বলিয়া আগে বসে হাইড্রোজেন

অ-ধাতু হইয়াও ধাতুর মত ধর্ম বলিয়া জলের সঙ্কেত, H_2O, হাইড্রোজেনের চিহ্ন আগে বসে।

(খ) অ-ধাতুর দ্বারা গঠিত যৌগিক পদাথের অণুর সঙ্কেত লিখিবার সময় যে মৌলিক পদার্থটি অপরটির তুলনায় অধিকতর অপরা-বিদ্যুৎবাহী সেই মৌলিক পদার্থের চিহ্নটি পরে বসে। যথা, নাইট্রিক-অক্সাইড অণুর সঙ্কেত NO, কারণ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, অপেক্ষা অধিকতর অপরা-বিদ্যুৎবাহী।

(গ) দুইটি অ-ধাতু দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থের মধ্যে যদি একটি অ-ধাতু স্বাভাবিক অবস্থায় কঠিন হয় তবে ইহার চিহ্ন আগে বসে। যথা; কার্বন-ডাই-অক্সাইড লিখিতে C আগে বসে, যেমন, CO_2 ।

সঙ্কেতের আদিক ও মাত্রিক অর্থ :

(১) পদার্থটির অণুর মধ্যে কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থ বর্তমান।

(২) কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থের কয়টি করিয়া পরমাণু দ্বারা পদার্থটি সংগঠিত।

(৩) পদার্থটির আণবিক ওজন ; যেমন—জলের আণবিক সঙ্কেত H_2O, দ্বারা বোঝায় যে ওজনগত ভাবে 18 অংশ ($2 \times 1 + 16 = 18$) জলের কথা বলা হইতেছে।

(৪) যৌগিক পদাথটির বিভিন্ন উপাদান তথা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের শতাংশ ওজন। যথা—জলের আণবিক ওজন 18 এবং এই 18 অংশের মধ্যে ওজনগত 2 অংশ মাত্র হাইড্রোজেন এবং বাকী 16 অংশ অক্সিজেন।

পদার্থের আণবিক সঙ্কেত হইতে কি জানা যায় না :

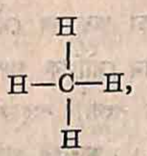
(১) কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় অবস্থা বোঝা যায় না।

(২) বর্ণ বা অন্যান্য ভৌত বা রাসায়নিক ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না।

(৩) বিভিন্ন পরমাণুগুলি পরস্পর যুক্ত বোঝায় কিন্তু কি ভাবে যুক্ত হইয়াছে অথবা যুক্ত হইবার পর পরমাণু গুলির অবস্থিতি কিরূপ তাহা বোঝা যায় না। এক কথায় অণুর আভ্যন্তরীণ গঠন জানা সম্ভব নয়।

সংযুক্তি সঙ্কেত : পদার্থের অণুর যে সঙ্কেত দ্বারা বিভিন্ন পরমাণু কিভাবে যুক্ত হইয়াছে বোঝা যায় তাহার নাম পদার্থের সংযুক্তি সংকেত (Structural formulae) বা রৈখিক (Graphical formulae) সঙ্কেত।

যেমন,



মিথেন

H—O—H

জল

[রেখাগুলিকে বাহু (bonds) বলে। বস্তুত: পরমাণুগুলির কোন বাহু থাকিতে পারে না, বুঝিবার স্থবিধার জন্য কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র]

যোজ্যতা (Valency) :

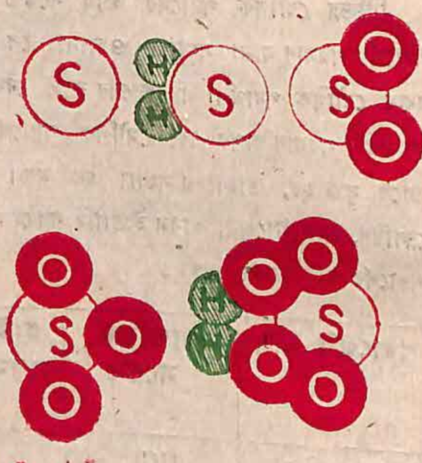
বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের অণুর সঙ্কেত হইতে বোঝা যায় যে মৌলিক পদার্থের পরমাণু নানা সংখ্যায় ও নানাভাবে সংযুক্ত হইয়া গড়িয়া তোলে বিভিন্ন রকম যৌগিক পদার্থ। বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায়, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের যে সকল পরমাণু অপর একটি মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর সহিত পৃথকভাবে যুক্ত হয়, তাহাদের সংখ্যা এক নয়। যেমন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিণ, নাইট্রোজেন, কার্বন ইত্যাদি সকলের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। যথা :

পদার্থের নাম	আণবিক সঙ্কেত	হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা	অপর মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সংখ্যা
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	HCl	1	1
জল	H_2O	2	1
অ্যামোনিয়া	H_3N	3	1
মিথেন	H_4C	4	1

প্রথমত দেখা যাইতেছে হাইড্রোজেনের সংযুক্ত ক্ষমতা কোন ক্ষেত্রেই একের বেশী নয়, অতএব যোজ্যতা সবচেয়ে কম। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির হাইড্রোজেনের সহিত সংযুক্ত হওয়ার শক্তি বিভিন্ন। ইহাই পরমাণুর যোজ্যতা বা Valency (ল্যাটিন শব্দ Valentia হইতে উদ্ভূত অর্থ-শক্তি)। যোজ্যতা জানা থাকিলে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের আণবিক সঙ্কেত লিখিতে স্থবিধা হয়।

শুধু অল্প কয়েকটি মৌলিক পদার্থ ছাড়া অন্য সব মৌলিক পদার্থের এক একটি নির্দিষ্ট যোজ্যতা আছে। অর্থাৎ কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে অন্য কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কত সংখ্যায় সংযুক্ত হইয়া কোন্ যৌগিক পদার্থের অণু গঠন করিবে তাহাও সুনির্দিষ্ট। অতএব হাইড্রোজেনের ভিত্তিতে বলা যায় ক্লোরিণের রাসায়নিক সংযোগের ক্ষমতা 1, অর্থাৎ যোজ্যতা 1 বা একযোজী। ঠিক সেইরূপ, অক্সিজেন দুইযোজী, নাইট্রোজেন তিন যোজী ও কার্বন চতুর্যোজী। এইভাবে অসংখ্য যৌগিক পদার্থের গঠন বিশ্লেষণ করিয়া জানা গিয়াছে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা এক হইতে আট পর্যন্ত হইতে পারে। যেমন,

চিহ্ন	যোজ্যতা
H, Cl	1
Mg, O	2
N, Al	3
C, Si	4
Cr	6
Mn	7
Os	8



উপরের চিত্রে সালফারের যোজ্যতা H_2S এর বেলায় 2 ও SO_2-এর বেলায় 4।
নীচের চিত্রে সালফারের যোজ্যতা SO_3 ও H_2SO_4-এর বেলায় 6।

আবার, হিলিয়াম, নিয়ন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ অন্য কোন পদার্থের সহিত রাসায়নিক সংযোগে অংশ গ্রহণ করে না। ইহাদের কোন যোজন-ক্ষমতা নাই; অর্থাৎ, ইহারা শূন্যযোজী।

আবার কতকগুলি মৌলিক পদার্থ যেমন, সোনা (Au), সীসা (Pb), সোডিয়াম (Na) ইত্যাদি হাইড্রোজেনের সহিত সোজাসুজি যুক্ত হয় না। এই সব ক্ষেত্রে ইহাদের যোজ্যতা অন্য কোন মৌলিক পদার্থের সহিত সংযোগ হইতে

নিরূপণ করা হয়। যথা :—

			পরমাণুর সংখ্যা		পরমাণুর সংখ্যা
সোডিয়াম ক্লোরাইড ···	$NaCl$	···	1	···	1
লেড ক্লোরাইড ···	$PbCl_2$	···	2	···	1
অরিক ক্লোরাইড ···	$AuCl_3$	···	3	···	1

উপরের যৌগিক পদার্থগুলির আণবিক সঙ্কেতে দেখা যাইতেছে সোডিয়াম লেড ও সোনার একটি পরমাণু যথাক্রমে একটি, দুইটি বা তিনটি ক্লোরিণ পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়াছে। ক্লোরিণের যোজ্যতা এক; অতএব তিনটি ক্লোরিণ পরমাণু তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হইতে পারে। অতএব সোনা যদি হাইড্রোজেনের সহিত রাসায়নিক ভাবে সংযুক্ত হইত, তবে একটি সোনার পরমাণু তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হইত। সুতরাং সোনার যোজ্যতা 3 অর্থাৎ ত্রিযোজী। এইবার সংক্ষেপে যোজ্যতা সম্বন্ধে বলা যায় যে, **কোন মৌলিক পদার্থের অন্য কোন মৌলিক পদার্থের সহিত রাসায়নিক সংযোগের ক্ষমতাকে সেই মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা বলে। মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর সহিত বা একটি পরমাণুর দ্বারা যত সংখ্যক হাইড্রোজেন বা ক্লোরিন পরমাণু যথাক্রমে যুক্ত বা প্রতিস্থাপিত হয় তাহার দ্বারা ঐ মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা নিরূপণ করা হয়।**

আবার দেখা যায় কতকগুলি মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা নির্দিষ্ট নয় অর্থাৎ যোজ্যতা একাধিক। যেমন, নাইট্রোজেন, তামা, ফসফরাসের ইত্যাদির যোজ্যতা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন। ইহাদের যোজ্যতা পরিবর্তনশীল (variable)।

			পরমাণুর সংখ্যা		পরমাণুর সংখ্যা
ফেরাস ক্লোরাইড	—	$FeCl_2$	— 1	—	2
ফেরিক ক্লোরাইড	—	$FeCl_3$	— 1	—	3

এইক্ষেত্রে লোহার যোজ্যতা দেখা যাইতেছে যথাক্রমে 2 ও 3।

অনেক সময় দেখা যায় কতকগুলি যৌগিক পদার্থের অণুর ভিতর কতকগুলি পরমাণু একত্র সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে যুক্ত থাকে। যেমন, সালফেট (SO_4) এইরূপ একটি সঙ্ঘবদ্ধ পরমাণুপুঞ্জ।

পরমাণুপুঞ্জের কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই। অর্থাৎ সর্বদাই অন্য আরেকটি পরমাণুর সহিত যুক্ত থাকিয়া যৌগিক পদার্থ রূপে থাকে। এক কথায় বলা যায়

বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন পরমাণুর সমাবেশ হইলেও ইহারা মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মত ব্যবহার করে। এইরকম পরমাণুপুঞ্জকে **যৌগমূলক** (radical) বলে। প্রত্যেক যৌগমূলকেরই পরমাণুর মত যোজ্যতা আছে। যেমন, পটাসিয়াম সালফেটের আণবিক সঙ্কেত K_2SO_4, হইতে বুঝা যায় SO_4 যৌগ মূলক দুইটি এক যোজী পটাসিয়াম পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়াছে। অতএব SO_4 যৌগমূলক দুই যোজী। বিভিন্ন যৌগমূলকের ধর্ম হইতে জানা যায় NH_4 অ্যামোনিয়াম, যৌগমূলকটি ধাতু ও হাইড্রোজেনে মত ব্যবহার করে অর্থাৎ ধণাত্মক, বাকী যৌগমূলকগুলি ঋণাত্মক।

রাসায়নিক সমীকরণ ঃ যখনই কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, তখনই কোন না কোন পদার্থ অংশ গ্রহণ করিয়া নূতন বস্তুতে পরিণত হয়। **যে সকল পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে তাহাদের বিক্রিয়ক (Reactants) বলে এবং বিক্রিয়ার ফলে যে সকল পদার্থ নূতন গঠিত হয়, তাহাদের বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ (products) বলে।**

যেমন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলে জল উৎপন্ন হয়। এই-ক্ষেত্রে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে বলিয়া উহারা বিক্রিয়ক এবং জল রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নূতন বস্তু বলিয়া জল বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ। বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ মাত্রকেই যৌগিক বা মৌলিক হইতে হইবে। অতএব তাহাদের সকলকেই চিহ্ন ও সঙ্কেতের সাহায্যে বুঝান যাইতে পারে।

সমীকরণের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকাশ ঃ

যাহারা রাসায়নিক পরিবর্তনে অর্থাৎ বিক্রিয়ায় অংশ নেয় তাহাদিগকে বামদিকে এবং যে সকল নূতন গঠিত পদার্থ বা বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ পাওয়া যায় তাহাদিগকে ডানদিকে লিখিয়া, মাঝখানে একটি সমীকরণ চিহ্ন (=) বা তীর চিহ্ন (→) দিয়া উহাদের যুক্ত করা হয়। একাধিক বিক্রিয়ক বা বিক্রয়ালব্ধ পদার্থ থাকিলে উহাদের (+) চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ মনে করিতে পার এইক্ষেত্রে (+) চিহ্নের অর্থ "এবং" ; সমীকরণ চিহ্নের (=) অর্থ "রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা"।

উদাহরণ ঃ জিঙ্ক, সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া করিয়া জিঙ্ক সালফেট এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়াটি প্রকাশ করিতে

গেলে জিঙ্ক ও সালফিউরিক অ্যাসিড বিক্রিয়ক বলিয়া উহাদের বামদিকে ও জিঙ্ক সালফেট এবং হাইড্রোজেন বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ বলিয়া উহাদের ডানদিকে লিখিতে হয়।

Zinc + Sulphuric acid = Zinc Sulphate + Hydrogen.

বিক্রিয়াটি চিহ্ন ও সঙ্কেতের দ্বারা এই ভাবে প্রকাশ করিতে হয়—

$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$.

এইভাবে চিহ্ন ও সঙ্কেতের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রকাশ করার পদ্ধতিকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে।

রাসায়নিক সমীকরণ গঠনকালের কয়েকটি নিয়ম :

১। যে সমস্ত পদার্থ বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে এবং যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাদের সবগুলি জানা প্রয়োজন এবং তাহাদের প্রত্যেকটির চিহ্ন বা সঙ্কেত জানিতে হইবে।

২। সমীকরণ প্রকাশ করিতে প্রত্যেকটি বস্তুকে উহার অণুর সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে। পরমাণুর দ্বারা প্রকাশ করা হয় না।

সমীকরণ চিহ্নের উভয় দিকে যে কোন প্রকারের পরমাণুর (অণুর মধ্যস্থিত) সংখ্যা এক হওয়া প্রয়োজন। এইজন্য প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন সংখ্যক অণুর সমাবেশ করিতে হইবে।

যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংযোগে জলের উৎপত্তি। ইহা প্রকাশ করিতে আমরা লিখিতে পারি—$H_2 + O = H_2O$.

ইহাতে রাসায়নিক বিক্রিয়াটি বুঝা যায় বটে, কিন্তু ইহা নিয়মানুগত নহে। কারণ, এইখানে অক্সিজেনকে অণুর সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করা হয় নাই। পরমাণুর সাহায্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। আবার, $H_2 + O_2 = 2H_2O$;

এইবার সবগুলি বস্তুই নিজ নিজ অণুতে লেখা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমীকরণটি নির্ভুল নহে। কেন না, দুইদিকে হাইড্রোজেন পরমাণুর সমষ্টি এক নহে।

এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটির সঙ্গত সমীকরণ হইবে—$2H_2 + O_2 = 2H_2O$.

ইহাতে সমীকরণ পদ্ধতির সব নিয়মই প্রতিপালিত হইয়াছে।

রাসায়নিক সমীকরণের সমতা করণ :

রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় পদার্থের অণুগুলি বদলাইয়া নূতন অণুর সৃষ্টি

হয়। কিন্তু যে সমস্ত পরমাণুর দ্বারা পদার্থটি গঠিত তাহাদের বিনাশ বা বিলোপ হয় না। কেবল নূতন রকমে ঐ পরমাণুগুলি সজ্জিত হইয়া নূতন অণুর সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গিয়াছে রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে বিভিন্ন পদার্থের অণুর মধ্যে যত সংখ্যক পরমাণু থাকে বিক্রিয়ার পরেও নূতন পদার্থের মধ্যে ঠিক তত সংখ্যক পরমাণু বর্তমান থাকে। অতএব বিক্রিয়ার আগে রাসায়নিক পদার্থের মোট যে ওজন থাকে, বিক্রিয়ার পরেও নূতন রাসায়নিক পদার্থের ওজন সেইরূপই থাকে। যেমন, সোডিয়াম-হাইড্রকসাইড (কষ্টিক সোডা) ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে যে খাদ্য লবণ ও জল তৈরী হয় সেই বিক্রিয়াটির সমীকরণ এইরূপ—$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$.

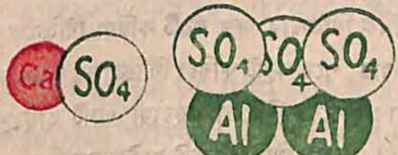
এই বিক্রিয়াতে দেখা যাইতেছে বিক্রিয়ার আগে (বামদিকে) $Na + O + Cl + H + H$,মোট পাঁচটি পরমাণু। বিক্রিয়ার পরে (ডানদিকে) অর্থাৎ লবণ ও জলের অণুতে $Na + Cl + H + H + O$ মোট পাঁচটি পরমাণু। অতএব বিক্রিয়ার আগে ও পরে পরমাণুর প্রকৃতি ও সংখ্যা সমান। শুধু তাই নয়, হিসাব করিলে দেখা যায় ওজনও উভয় দিকে সমান।

$$Na + O + Cl + H + H + = Na + Cl + H + H + O$$
$$23 + 16 + 35{\cdot}5 + 1 + 1 = 23 + 35{\cdot}5 + 1 + 1 + 16$$
$$76{\cdot}5 = 76{\cdot}5$$

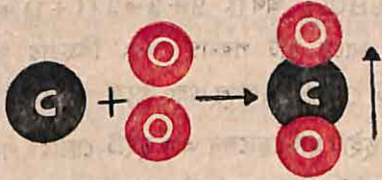
সেইজন্য বস্তুর বিনাশ নাই বা পরমাণুর ধ্বংস নাই এই সত্যতা বজায় রাখিবার জন্য **প্রয়োজনানুসারে সমীকরণে বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন সংখ্যক অণুর সমাবেশ করিতে হয়। এই পদ্ধতিকে সমীকরণের সমতাকরণ** (balancing) বলে।

অ্যালুমিনিয়াম ধাতু অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইড সৃষ্টি করে। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের অণুতে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু দুইটি অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। সমীকরণটি যদি লেখা যায়, $Al + O_2 = Al_2O_3$ কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কারণ অক্সিজেন অণুতে সর্বদাই দুইটি পরমাণু থাকে। অতএব অক্সিজেনের পরমাণু দুইদিকে সমান সংখ্যক করার জন্য বামদিকে 3 দিয়া ও ডানদিকে 2 দিয়া গুণ করিতে হইবে। এখন সমীকরণটি দাঁড়ায়, $Al + 3O_2 = 2Al_2O_3$। কিন্তু ইহাতে ডানদিকে অ্যালুমিনিয়ামের পরমাণুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে 4টি। অতএব বামদিকে অ্যালুমিনিয়ামের পরমাণু বাড়াইতে হইবে ও 4 দিয়া গুণ করিতে হইবে।

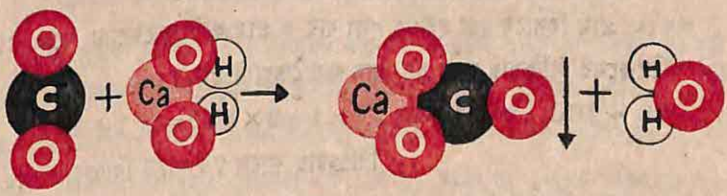
$4Al + 3O_2 = 2Al_2O_3$; ইহাই সমীকরণের সমতাকরণ ও সঠিক সমীকরণ লিখিবার পদ্ধতি।



১নং চিত্রে SO_4 পরমাণুপু-ঞ্জর যোজ্যতা দেখানো হইয়াছে 2।



২নং চিত্রে $C + O_2 = CO_2$। উভয় দিকে পরমাণুর সংখ্যা সমান (চিত্রে বল রূপে দেখানো হইয়াছে)।



৩নং চিত্রে $CO_2 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 + H_2O$.
উভয় দিকে পরমাণুর সংখ্যা সমান।

সমীকরণের আদিক ও মাত্রিক অর্থ :

রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায় :

(১) বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা :—
$H_2 + Cl_2 = 2HCl$; এই বিক্রিয়ায় জানা যায় যে হাইড্রোজেন অণু ও ক্লোরিণ

অণু সংযুক্ত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অণু গঠন করে। $2H_2+O_2=2H_2O$; এই সমীকরণ হইতে জানা যায় যে হাইড্রোজেন অণু অক্সিজেন অণুর সহিত যুক্ত হইয়া জলের অণু গঠন করে।

(২) রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য কয়টি করিয়া বিক্রিয়ক অণুর প্রয়োজন এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরে কয়টি করিয়া বিক্রিয়ালব্ধ নূতন অণু তৈরী হয় তাহাও জানা যায়। যথা: উপরের বিক্রিয়া অনুয়ায়ী একটি হাইড্রোজেন (H_2) অণু, একটি ক্লোরিণ (Cl_2) অণু মিলিয়া দুইটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) অণু গঠন করে। সেইরূপ 2 অণু হাইড্রোজেন এবং 1 অণু অক্সিজেন 2 অণু জল গঠন করে।

(৩) বিক্রিয়ার আগে ও পরে মোট পরমাণুর ও অণুর সংখ্যা জানা যায়। যথা: $H_2+Cl_2=2HCl$; অর্থাৎ $2+2=2\,(1+1)$ অর্থাৎ. আগে ছিল 4টি পরমাণু, পরেও আছে 4টি পরমাণু এবং বিক্রয়ার আগে ছিল দুইটি হাইড্রোজেন ও দুইটি ক্লোরিণ পরমাণু এবং পরে গঠিত দুইটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অণুর মধ্যেও দুইটি হাইড্রোজেন এবং দুইটি ক্লোরিণ পরমাণু রহিয়াছে।

(৪) বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের ওজন জানা যায়।

জল তৈরীর বিক্রিয়ার সমীকরণ: $2H_2+O_2=2H_2O$;

অর্থাৎ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পারমাণবিক ওজন অনুযায়ী:

$$2(2\times 1)+16\times 2=2(2+16)$$

(বিক্রিয়ার আগে) 36 = 36 (বিক্রিয়ার পরে)

অর্থাৎ, গ্রাম হিসাবে ধরা হইলে বলা যায় 4 গ্রাম হাইড্রোজেনের সঙ্গে 32 গ্রাম অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলে 36 গ্রাম জল তৈয়ারী হইবে।

$H_2+Cl_2=2HCl$; এই বিক্রিয়ায়: $2\times 1+2\times 35{\cdot}5=2(1+35{\cdot}5)$

বিক্রিয়ার আগে 73 = 73 বিক্রিয়ার পরে।

(৫) রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে ও পরের পদার্থ যদি গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে তবে সমীকরণ হইতে আয়তনের হিসাবও জানা যায়। যথা:

H_2	$+\ Cl_2$	$=\ 2HCl$
এক আয়তন	এক আয়তন	দুই আয়তন

অর্থাৎ, এক অণু পরিমাণ গ্যাসীয় দ্রব্যের জন্য আয়তনের পরিমাণ যদি এক ধরা হয়, তাহা হইলে দুই অণুর জন্য আয়তন পরিমাণ হইবে দুই, ইত্যাদি। আয়তনের পরিমাণ সি. সি হিসাবে ধরা হইলে উল্লিখিত সমীকরণ দেখিয়া বলা

যায়। এক সি. সি. হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক সি. সি. ক্লোরিণের মিলনে দুই সি. সি. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস তৈয়ারী হইবে অথবা দুই আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেনের সংযোগে দুই আয়তন বাষ্প উৎপন্ন হইবে

রাসায়নিক সমীকরণ হইতে কি জানা যায় না ঃ

(১) বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থগুলির ভৌতিক অবস্থা কি তাহা জানা যায় না।

(২) বিক্রিয়া তাপ উদ্‌গারী না তাপ শোষক (Exothermic or Endothermic) তাহা বুঝা যায় না।

(৩) বিক্রিয়ার গতি এবং সময় কোন কিছুরই আভাস পাওয়া যায় না।

(৪) বিক্রিয়ার চাপ, তাপ বা অনুঘটকের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাহাও বুঝা যায় না।

(৫) বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের রাসায়নিক গুণাবলী জানা যায় না।

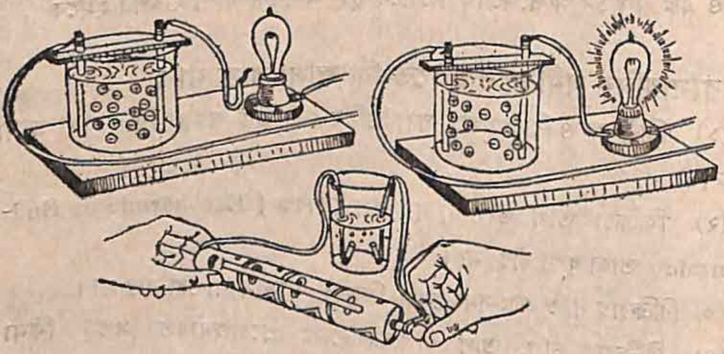
চতুর্থ অধ্যায়

তড়িৎ বিশ্লেষণ

সমস্ত বস্তুর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলাচল করিতে পারে না ইহা আমরা আমাদের ব্যবহারীক জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জানি। লোহা, সোনা, তামা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, অথবা অ্যাসিড বা লবণের জলীয় দ্রবণ অনায়াসে তড়িৎ পরিবহণ করিতে পারে। ইহাদিগকে তড়িৎ-পরিবাহী (conductors) বলে। সাধারণ অঙ্গার, গন্ধক, কাঠ বা রবার ইত্যাদির ভিতর দিয়া কখনও বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলাচল সম্ভব নয়। ইহাদের তড়িৎ অ-পরিবাহী (bad conductors) বলে। তড়িৎ পরিবহণে সক্ষম ও তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে পদার্থগুলিকে এইভাবে বিভক্ত করা চলে।

তড়িৎ-পরিবাহী ঃ যে সকল বস্তু বিদ্যুৎ পরিবহণ করিতে পারে, কিন্তু তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা তাহাদের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না তাহাদের তড়িৎ পরিবাহী বলে। ধাতুগুলি এই পর্যায়ে পড়ে।

তড়িৎ বিশ্লেষ্য ঃ কোন কোন বস্তুর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-পরিবহনকালে, বস্তুগুলি বিয়োজিত হইয়া যায়, এবং নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে। অ্যাসিড,



হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের দ্রবণের মধ্য দিয়া তড়িৎ চালাইলে আলো জ্বলিয়া উঠে।

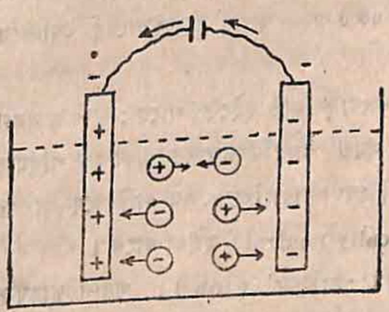
ক্ষার এবং লবণ জাতীয় পদার্থের দ্রবণ এই পর্যায়ে পড়ে। ইহারা সকলেই যৌগিক পদার্থ। সমস্ত দ্রবণীয় যৌগিক পদার্থের অবশ্য বিদ্যুৎ-পরিবহণ করার ক্ষমতা নাই যেমন—অ্যালকোহল, চিনি ইত্যাদি। যে সকল যৌগিক পদার্থ বিদ্যুৎ-পরিবাহী, তাহারাও কঠিন অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করিতে পারে না। কেবলমাত্র গলিত অবস্থায় অথবা কোন কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় উহারা তড়িৎ-পরিবাহী হইয়া থাকে।

যেমন, লবণের কঠিন দানার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-চালনা সম্ভব নয়। কিন্তু লবণের গলিত অবস্থায় অথবা উহার জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়া স্বচ্ছন্দে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলিতে পারে। শুষ্ক হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসীয় বা তরল উভয় অবস্থাতেই তড়িৎ পরিবহন করিতে পারে না। জল অতি অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ পরিবহন করিতে পারে, কিন্তু শুষ্ক হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ও জলের মিশ্রণ, অর্থাৎ দ্রবণ অতি সহজেই বিদ্যুৎ পরিবহন করে এবং তড়িৎ পরিচালনার ফলে বিয়োজিত হইয়া ক্লোরিণ ও হাইড্রোজেনে পরিণত হয়।

যে সকল তরল বা গলিত পদার্থ বিদ্যুৎ-প্রবাহে বিয়োজিত হয় তাহাদের তড়িৎ-বিশ্লেষ্য বা ইলেকট্রোলাইট বলে।

এই সকল তরল পদার্থ কোন বস্তুর দ্রবণ, নতুবা উহার গলিত-অবস্থা হইতে পারে। **বিদ্যুৎ সাহায্যে পদার্থের বিয়োজনকে তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis) বলে।**

ক্যাথোড, অ্যানোড ও তড়িৎ-দ্বার : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তড়িৎ-বিশ্লেষণের জন্য অ্যাসিড, ক্ষার বা লবণের দ্রবণ ব্যবহৃত হয়। এই সকল দ্রবণকে একটি পাত্রে রাখিয়া উহার দুই প্রান্তে দুইটি ধাতুর পাত আংশিক ডুবাইয়া রাখা হয়। এই পাত দুইটি তারের সাহায্যে একটি ব্যাটারীর পজিটিভ এবং নেগেটিভ মেরুর সহিত যোগ করিয়া দিলে, লবণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই দুইটি ধাতুর পাতকে **তড়িৎ দ্বার** (electrodes) বলে। যে পাতটি পজিটিভ মেরুর সহিত সংযুক্ত তাহাকে **অ্যানোড** (anode) এবং অপরটি যাহা নেগেটিভ মেরুর সহিত সংযুক্ত তাহাকে **ক্যাথোড** (cathode) বলে। অতএব বিদ্যুৎ অ্যানোড-দ্বারে দ্রবণে প্রবেশ করে এবং ক্যাথোড দ্বারের সাহায্যে নির্গত হয়। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণের ভিতরের পদার্থটি বিয়োজিত হইয়া যাইতেছে এবং এই বিয়োজন ক্রিয়া কেবলমাত্র তড়িৎ-দ্বারের নিকটেই হইয়া থাকে, সম্পূর্ণ দ্রবণের ভিতর হয় না (চিত্র ৭)।



চিত্র ৭

অ্যানোড ও ক্যাথোড হিসাবে সাধারণতঃ তামা ও প্ল্যাটিনামের ব্যবহার বেশী। প্রয়োজন অনুসারে নিকেল, লৌহ, গ্যাস কার্বন, গ্রাফাইট ইত্যাদি বিদ্যুৎ-পরিবাহক পদার্থও ব্যবহৃত হয়।

অর্দ্ধ-তড়িৎ-পরিবাহী (Semi-conductor) : কতকগুলি বস্তু স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যুৎ-অপরিবাহী কিন্তু উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ-পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও শেষ পর্য্যন্ত তড়িৎ-পরিবাহী বস্তুতে পরিণত হয়। যেমন, জার্মেনিয়াম।

তড়িৎ-বিয়োজন-বাদ (Theory of Electrolytic dissociation) : 1887 খৃষ্টাব্দে আরুহেনিয়াস (Arrhenius) তাঁহার বিখ্যাত তড়িৎ-বিয়োজন-বাদ প্রবর্তন করেন। এই মতানুযায়ী তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থগুলি দ্রবীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই অস্থায়ী এবং স্বতঃভঙ্গুর হইয়া পড়ে। পদার্থের অণুগুলির অল্পাধিক অংশ বিযুক্ত বা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। এই অণুগুলি ভাঙ্গিয়া

একাধিক সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হয়। প্রত্যেকটি অণু হইতে দুই প্রকারের তড়িৎ-যুক্ত কণার সৃষ্টি হয়—কতকগুলি ধনাত্মক এবং অপরগুলি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-যুক্ত।

যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড জলে দ্রব হইলেই উহার অণু হইতে একটি ধণাত্মক সোডিয়াম এবং একটি ঋণাত্মক ক্লোরিণ কণা উৎপন্ন হয়।

$$NaCl = Na^{+} + Cl^{-} \; ; \; HBr = H^{+} + Br^{-}$$

উপরে '+' এবং '–' চিহ্ন দ্বারা ধণাত্মক এবং ঋণাত্মক কণা নির্দেশ করা হয়। ঐরূপ একটি চিহ্ন বিদ্যুতের একটি একক বুঝায় এবং ইহাদের যথাক্রমে পরা এবং অপরা বিদ্যুৎ বলে।

ধণাত্মক এবং ঋণাত্মক কণা সমান-সংখ্যক নাও হইতে পারে; কিন্তু সমগ্র পরা-বিদ্যুতের এককের পরিমাণ এবং সমগ্র অপরা-বিদ্যুতের এককের পরিমাণ সমান হইতে হইবে। অতএব, পরা এবং অপরা বিদ্যুৎ সম পরিমাণে থাকার জন্য দ্রবণটি তড়িৎ-নিরপেক্ষ (Electrically neutral) হইয়া থাকে।

অণু বিয়োজিত এই কণার নাম **'আয়ন'** (ion)। পরা-বিদ্যুৎযুক্ত কণাকে **'ক্যাটায়ন'** (cation) এবং অপরা-বিদ্যুৎযুক্ত কণাকে **অ্যানায়ন'** (anion) বলে। সংক্ষেপে, পদার্থের অণুর এই প্রকার তড়িৎ-যুক্ত কণাতে বিয়োজনকে 'আয়নিত হওয়া' বলা হয়।

কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু এবং উহার বিদ্যুৎ যুক্ত আয়নের ধর্মগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যেমন, সোডিয়ামের পরমাণু জলের সংস্পর্শে আসিবামাত্র রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু ধণাত্মক সোডিয়াম আয়নের সঙ্গে জলের কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। অন্যান্য আয়ন ও পরমাণু সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

অনেক ক্ষেত্রে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের অণু-বিয়োজিত হইয়া যৌগ মূলকের আয়নও সৃষ্টি করিতে পারে। যেমন: $H_2SO_4 \rightleftharpoons 2H^{+} + SO_4^{--}$

দ্রাবের বিয়োজনের ফলে যে সকল আয়ন উৎপন্ন হয় উহাদের কোন একটিকে পৃথক করিয়া লওয়া সম্ভব নয় এবং দ্রবণ হইতে জল সরাইয়া লইলে পুনরায় পদার্থটি ফিরিয়া পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিপরীত-ধর্মী আয়নগুলি পরস্পর পুনর্মিলিত হয়। কিন্তু কতকগুলি বস্তু চিনি, অ্যালকোহল ইত্যাদি জলে দ্রবীভূত হয় বটে, কিন্তু জলের সহিত বিক্রিয়া করে না বা অণুগুলি ভাঙ্গিয়া যায় না বলিয়া ইহাদের দ্রবণের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চলাচল করে না। ইহাদের তড়িৎ অবিশ্লেষ্য (Non-electrolyte) বলে।

তড়িৎ বিশ্লেষণ ঃ দ্রবণের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালনা করিলে দ্রাবের অণুগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে। বিদ্যুৎ অ্যানোডের সাহায্যে দ্রবণে প্রবেশ করে এবং অ্যানোড হইতে ক্যাথোডের দিকে প্রবাহিত হয়। অতএব অ্যানোডকে আমরা পরা-প্রান্ত (positive end) এবং ক্যাথোডকে অপরা-প্রান্ত (negative end) বলিতে পারি। বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে ঋণাত্মক আয়নগুলি স্বাভাবিক আকর্ষণেই বিপরীত-ধর্মী পরা-প্রান্তের দিকে এবং ধণাত্মক আয়নগুলি অপরা-প্রান্তের দিকে ধাবমান হয়। অ্যানায়নগুলি যখন পরাবিদ্যুৎ-সম্পন্ন অ্যানোডের উপর আসিয়া পড়ে তখন উহাদের অপরা-বিদ্যুৎ লোপ পায় এবং উহারা বিদ্যুৎহীন কণা বা পরমাণুতে পরিণত হয়। ক্যাথাডেও এই ভাবেই ক্যাটায়নগুলি বিদ্যুৎহীন হইয়া পরমাণু বা কণাতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। ফলে দুইটি তড়িৎ-দ্বারে পদার্থটি দুইটি নূতন পদার্থে বিশ্লেষিত হইয়া পড়ে। তড়িৎ-বিশ্লেষণ সর্বত্রই এইভাবে হয়।

প্লাটিনাম তড়িৎ-দ্বারের সাহয্যে জিঙ্ক ক্লোরাইড দ্রবণে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করিলে জিঙ্ক ক্যাটায়ন ক্যাথোডে গিয়া দুইটি অপরা-বিদ্যুতের একক সহযোগে জিঙ্ক পরামাণুতে পর্য্যবসিত হয়। ক্লোরিণ অ্যানায়ন অ্যানোডে যাইয়া একটি অপরা-বিদ্যুতের একক পরিত্যাগ পূর্বক ক্লোরিণ পরমাণু এবং অবশেষে ক্লোরিণ অণুতে পরিণত হয়। এইভাবে জিঙ্ক ক্লোরাইড তড়িৎ-বিশ্লিষ্ট হইয়া জিঙ্ক ও ক্লোরিণ উৎপন্ন করে।

$$ZnCl_2 = Zn^{++} + 2Cl^- \qquad 2Cl^- - 2e = 2Cl$$

$$Zn^{++} + 2e = Zn, \qquad Cl + Cl = Cl_2$$

"e" = অপরা বিদ্যুৎ একক (unit of negative electricity)

জিঙ্ক ক্লোরাইডের পরিবর্তে জিঙ্কের যে কোন দ্রবণীয় লবণ, যথা জিঙ্ক সালফেট, জিঙ্ক নাইট্রেট প্রভৃতির তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় সর্বদাই জিঙ্ক ক্যাথোডে সঞ্চিত হয়। ক্যাথোড অপরা-বিদ্যুৎবাহী। অতএব, জিঙ্ক আয়ন সব সময়ই ধণাত্মক বা পরাবিদ্যুৎ-যুক্ত হইবে।

এইরূপ যে কোনও ধাতুর দ্রবণীয় ক্লোরাইড যথা—পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি লইলে সর্বদাই ক্লোরিণ অ্যানোডে নির্গত হয়। অ্যানোড পরা-বিদ্যুৎবাহী। সুতরাং সর্বদাই ক্লোরিণ আয়ন ঋণাত্মক বা অপরা-বিদ্যুৎবাহী হইবে।

এইভাবে দেখা গিয়াছে, জিঙ্ক এবং অন্যান্য যে কোন ধাতুর আয়ন এবং

হাইড্রোজেনের আয়ন সকল সময়েই পরা-বিদ্যুৎবাহী (electro-positive) এবং হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্যান্য অধাতব মৌলিক পদার্থগুলি অপরা-বিদ্যুৎবাহী (elctro-negative)।

বিভিন্ন পদার্থের তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে কি কি বস্তু উৎপন্ন হইবে তাহা যে কেবল মাত্র সেই পদার্থের উপর নির্ভর করে, তাহা নয়। পরন্তু তড়িৎ-বিশ্লেষণকালীন অবস্থার উপরও নির্ভর করে। অনেক সময়েই তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে যে পদার্থটি তড়িৎ-দ্বারে উৎপন্ন হয় তাহা পরে দ্রাবক অথবা তড়িৎ-দ্বারের ধাতুর সহিত বিক্রিয়ার ফলে আবার নূতন রকম পদার্থে পরিণত হইয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ হইতেই ইহা বুঝা যাইবে।

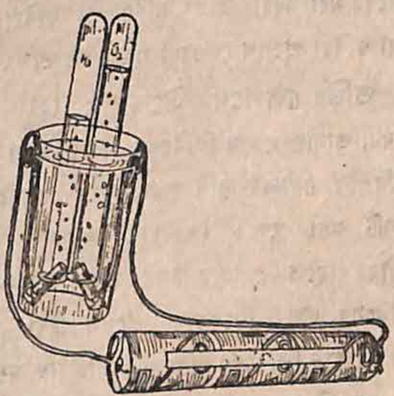
তড়িৎ-বিশ্লেষ্যর নাম	ব্যবহৃত ক্যাথোড	ব্যবহৃত অ্যানোড	ক্যাথোডে উৎপন্ন বস্তু	অ্যানোডে উৎপন্ন বস্তু
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড [ঘন]	কার্বন অথবা প্লাটিনাম	কার্বন	1 আয়তন হাইড্রোজেন	1 আয়তন ক্লোরিণ
সালফিউরিক অ্যাসিড (লঘু)	প্লাটিনাম	প্লাটিনাম	হাইড্রোজেন 2 আয়তন; অম্লগ্রাহীতা হ্রাস পায়	অক্সিজেন 1 আয়তন; অম্লগ্রাহীতা বৃদ্ধি পায়।
কপার সালফেট	কপার	প্লাটিনাম	কপার সঞ্চিত হয়	অক্সিজেন এবং সালফিউরিক অ্যাসিড
কপার সালফেট	কপার	কপার	কপার সঞ্চিত হয়	কপার দ্রবীভূত হয়।

অতএব, তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলাফল হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, দ্রাবক, দ্রবণের গাঢ়তা, তড়িৎদ্বারের বস্তু, তড়িৎপ্রবাহের মাত্রা প্রভৃতির উপর তড়িৎ বিশ্লেষণের ফল নির্ভর করে।

জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ : জল সুপরিবাহী না হইলেও উহার ভিতর বিদ্যুৎ চলাচল করিতে পারে এবং জল তড়িৎ-বিশ্লেষ্য। উহার কতক অণুর বিয়োজনের ফলে H^+ ক্যাটায়ন এবং OH^- অ্যানায়ন সৃষ্টি করে, যথা—$H_2O = H^+ + OH^-$। বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে OH অ্যানায়ন অ্যানোডে গিয়া

উহার অপরা-বিদ্যুৎভার পরিত্যাগ করে এবং OH যৌগমূলকে পরিণতি লাভ করে। পরে OH যৌগমূলকগুলি সংযুক্ত হইয়া জল এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে। সুতরাং অ্যানোডে আমরা অক্সিজেন নির্গত হইতে দেখি। ক্যাথোডে অবশ্যই H^+ আয়ন মুক্তি লাভ করিয়া প্রথমে হাইড্রোজেন পরমাণু এবং পরে হাইড্রোজেন অণুতে পরিণত হয়। অতএব জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণে আমরা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পাই।

পরীক্ষা : কাঁচের পাত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত বিশুদ্ধ জল লও। উহার মধ্যে ব্যবহার করা টর্চের ব্যাটারীর দুইটি কার্বন দণ্ড সংগ্রহ করিয়া ঐ পাত্রে রাখো ও তার সহযোগে ভালো ব্যাটারীর সহিত সংযুক্ত কর। দুইটি জল পূর্ণ পরীক্ষানল কার্বন দণ্ডের উপর উপুর করিয়া রাখো। দেখিবে পরীক্ষানলে বুদ বুদ আকারে যে গ্যাস সঞ্চিত হইয়াছে উহারা যথাক্রমে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।



চিত্র ৮

$H_2O \rightarrow H^+ + OH$,

ক্যাথোডে : $H^+ + e = H$

$H + H = H_2$

অ্যানোডে : $OH^- - e = OH$

$4OH = 2H_2O + O_2$

তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ :

(১) তড়িৎ-লেপন বা ইলেকট্রোপ্লেটিং (Electroplating)

(২) ইলেকট্রোটাইপিং (Electro-typing)

(৩) ধাতুর আকর (Ore) হইতে ধাতু নিষ্কাশন করিতে।
যথা : ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি।

(৪) ধাতু পরিশোধন করিতে। যথা : সোনা, তামা ইত্যাদি।

(৫) নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে। যথা : কষ্টিক সোডা, সোডিয়াম কার্বনেট ইত্যাদি।

(৬) বিভিন্ন ধাতুর ওজন এবং তুল্যাংকভার নির্ণয় করিতে।

তড়িৎ লেপণ বা ইলেকট্রোপ্লেটিং ঃ একটি জিঙ্ক বা লোহার পাতকে কপার-সালফেট দ্রবণে ডুবাইলে কপার ঐ পাতের উপর জমা হয় এবং সমপরিমাণ জিঙ্ক বা লোহা উহাদের পাত হইতে দ্রবণে দ্রবীভূত হয়। এইভাবে একটি ধাতুকে অন্য ধাতুর উপর জমা করিয়া লেপণ করার পদ্ধতি বহু প্রাচীন।

1805 সালে ইটালীর ব্রুজেনটেলি (Brugentelli) তড়িৎ লেপন প্রথা প্রবর্তন করেন। যে ধাতু দ্বারা প্রলেপ দিতে হইবে সেই ধাতুর বিশ্লেষক্ষম দ্রবণীয় লবণের মধ্য দিয়া তড়িৎ পরিচালনা করিয়া সেই ধাতুটিকে অন্য ধাতুর উপর জমা করিয়া প্রলেপ দেওয়ার পদ্ধতিকে তড়িৎ লেপন (electroplating) বলে।

তড়িৎ লেপনের উদ্দেশ্য ঃ (১) কোন ধাতুকে সুশ্রী করিবার জন্য। যেমন, তামার কোন জিনিসের উপর রূপা বা সোনার প্রলেপ দিয়া তামার জিনিসটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়। চলতি ভাষায় ইহাকে রূপা বা সোনার গিলটি করা বলে। (২) ধাতুর ক্ষয়করণ বা মরিচা বন্ধ করার জন্য। যেমন, জলীয় বায়ুতে লোহার উপর মরিচা ধরে ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। লোহার কোন জিনিসের উপর নিকেলের প্রলেপ দিয়া মরিচা (rust) বন্ধ করা যায়। (৩) কোন জিনিসের ঔজ্জ্বল্য বাড়াইবার জন্য।

পদ্ধতি ঃ তড়িৎ লেপনের পূর্বে ধাতব জিনিসটি প্রথমে সাবান, বা ক্ষারের কোন দ্রবণে পরে লঘু অ্যাসিডে ডুবাইয়া খুব ভালো করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। যাহাতে ধাতব জিনিসটির উপর কোন তৈলজাতীয় পদার্থ বা ধাতব অক্সাইডের বা অন্য কোন অপদ্রবের আস্তরণ না থাকে।

তড়িৎ লেপন চৌবাচ্চায় (electroplating tank) সাধারণত তড়িৎ লেপন করা হয়। এই চৌবাচ্চায় রাখা হয় যে পদার্থ দ্বারা প্রলেপ দিতে হইবে সেই পদার্থের কোন বিশ্লেষক্ষম দ্রবণীয় লবণ (electrolyte)। এই দ্রবণের মধ্যে ঝুলাইয়া রাখা হয় তড়িৎ-দ্বারগুলি (electrodes)। এই চৌবাচ্চাগুলি সিমেন্টের, কাঠের, কাঁচের বা কলাই করা লোহার তৈরী হইতে পারে।

যে দ্রব্যকে লেপন করা প্রয়োজন তাহাকে তড়িৎ লেপন চৌবাচ্চায় ক্যাথোড বা নেগেটিভ তড়িৎ-দ্বার রূপে ব্যবহার করা হয় এবং যে পদার্থ দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হয় সে পদার্থকে ব্যবহার করা হয় অ্যানোড বা পজিটিভ তড়িৎ-দ্বারের দণ্ডরূপে। যেমন, তামা বা লোহার কোন জিনিসের উপর রূপার প্রলেপ দেওয়ার জন্য অ্যানোডরূপে রূপার পাত, তড়িৎ বিশ্লেষ্যরূপে সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ এবং ক্যাথোড রূপে ব্যবহার করিতে হয় তামা বা লোহার পাত্রটি।

বিভিন্ন ধাতুর প্রলেপ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন তড়িৎ বিশ্লেষ্য ঃ

(১) **তামার প্রলেপ** ঃ—সোডিয়াম-কিউপ্রো-সায়নাইডের দ্রবণ।

(২) **রূপার প্রলেপ**—সোডিয়াম-আর্জেণ্টো-সায়নাইড ও অতিরিক্ত সোডিয়াম সায়নাইড দ্রবনের মিশ্রণ।

(৩) **সোনার প্রলেপ**—সোডিয়াম-অরাস-সায়নাইডের দ্রবণ।

(৪) **নিকেল প্রলেপ**—নিকেল-সালফেট ও নিকেল-অ্যামোনিয়াম সালফেটের মিশ্রিত দ্রবণ।

ক্রোমিয়াম প্রলেপ—সাধারণতঃ নিকেল প্রলেপের উপর ক্রোমিয়াম প্রলেপ দিতে হয়। ক্রোমিক-সালফেট ও ক্রোমিক অ্যাসিডের মিশ্রণ।

(৫) **রবারের প্রলেপ**—তড়িৎ লেপণ পদ্ধতিতে কোন ধাতব জিনিসের উপর রবারের প্রলেপ দেওয়া যায়। এইক্ষেত্রে শতকরা 35 ভাগ রবার, অ্যামোনিয়াম হাইড্রকসাইড, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং পটাসিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রিত দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

তড়িৎ বিশ্লেষ্যের প্রয়োজনীয় বিশেষত্ব ঃ

(১) সাধারণতঃ একাধিক তড়িৎ-বিশ্লেষ্যর দ্রবণের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়।

(২) তড়িৎ-বিশ্লেষ্যটি উত্তম তড়িৎ পরিবাহী হওয়া চাই।

(৩) তড়িৎ বিশ্লেষ্যগুলি জারিত, বিজারিত এবং আর্দ্র বিশ্লেষিত হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ

যৌগিক পদার্থগুলির চর্চার স্থবিধার জন্য রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতে উহাদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন অ্যাসিড (acid), ক্ষারক (base) ও লবন (salt)। প্রাচীনকালেও সালফিউরিক, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুতির পদ্ধতি জানা ছিল। কিন্তু মধ্যযুগের অ্যালকেমিষ্টরা হইতে সুরু করিয়া বয়েল, ল্যাভয়সিয়ার, বার্জিলাস, লাইবিগ কেহই অ্যাসিডের সন্তোষজনক সংজ্ঞা দিতে পারেন নাই। 1887 সালে বিজ্ঞানী আরহেনিয়াসের সংজ্ঞাই মোটামুটি বিজ্ঞান ভিত্তিক। যথা:—



রোমানযুগে সৈন্যদের লবণ বেতনরূপে গণ্য হইত। ল্যাটিন ভাষায় লবণের নাম salarium উহা হইতে বর্তমান salary বা বেতন শব্দটি আসিয়াছে।

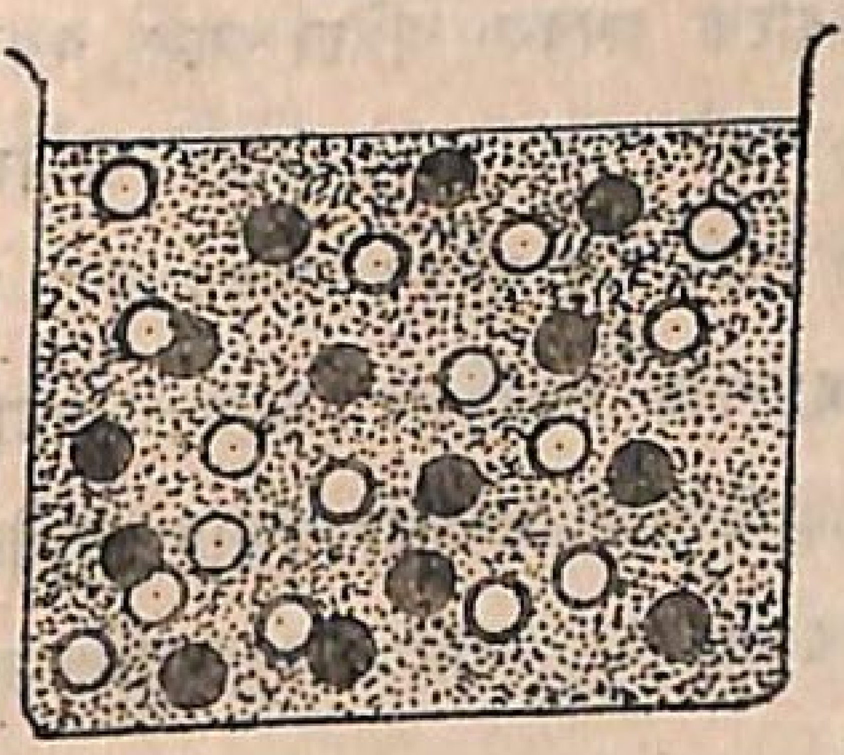
যে সকল হাইড্রোজেন যুক্ত যৌগিক পদার্থ জলীয় দ্রবণে আয়নিত হইয়া হাইড্রোজেন আয়ন H^+ উৎপন্ন করে তাহাদের অ্যাসিড বলে।

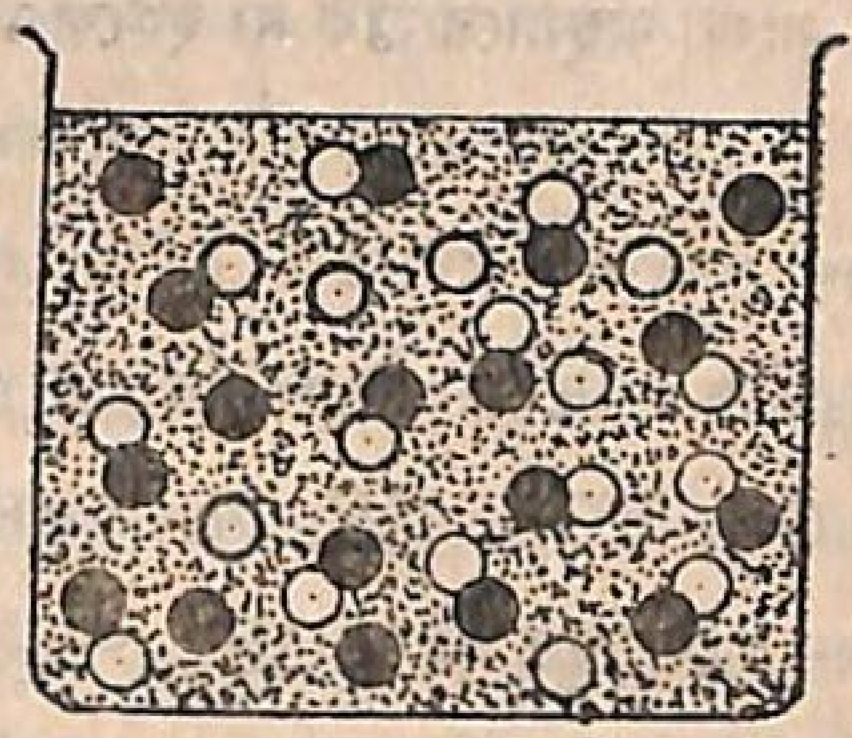
উদাহরণ: $\underset{\text{জলীয়দ্রবণ}}{\underline{HCl}} \rightarrow H^+ + Cl^-$.

$\underset{\text{জলীয়দ্রবণ}}{\underline{H_2SO}} \rightarrow 2H^+ + SO_4^{--}$.

দেখা যাইতেছে যে উভয় অ্যাসিডের জলীয়দ্রবণ আয়নিত H^+ ব্যতীত অপর কোন পরা-তড়িৎ যুক্ত (positive) আয়ন উৎপন্ন করে না। কিন্তু সকল অ্যাসিডের আয়নরূপে বিয়োজিত হওয়ার ক্ষমতা এক নয়। কাহারও বেশী কাহারও কম। যেমন হাইড্রোক্লোরিক, সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডের বেশী। ইহারা তীব্র অ্যাসিড (strong acid)।

আবার কার্বনিক অ্যাসিড, অ্যাসেটিক অ্যাসিডের কম। ইহারা মৃদু অ্যাসিড (weak acid) অর্থাৎ তীব্র অ্যাসিডের জলীয়দ্রবণে বেশী আয়ন থাকে আর অল্প অণু থাকে। আর মৃদু অ্যাসিডে অল্প আয়ন থাকে, বেশী অণু থাকে চিত্র (৯) ও (১০)।





চিত্র ৯ বেশী আয়ন অল্প অণু চিত্র ১০ অল্প আয়ন বেশী অণু

যদি বলা হয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড শতকরা 0·4% আয়নিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে প্রতি একহাজার অ্যাসেটিক অ্যাসিডের অণুর মধ্যে মাত্র চারিটি অণু বিয়োজিত হইয়া আয়নরূপে বিরাজ করে।

$$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3\,COO^-.$$

অ্যাসিডের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ ঃ

অ্যাসিডের এই ধর্মগুলি জানা থাকিলে আমরা অ্যাসিডকে চিনিতে পারি। ১। অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ অম্ল স্বাদ যুক্ত। বলা বাহুল্য, কাঁচা লেবু টক কারণ ইহাতে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে। দৈ টক ল্যাকটিক্ অ্যাসিড আছে বলিয়া। ২। নীল লিটমাসের দ্রবণকে লাল করে। ৩। কতকগুলি ধাতুর সহিত বিক্রিয়া করিয়া হাইড্রোজেন ও লবণ উৎপন্ন করে। ৪। সর্বদা ক্ষারক দ্রব্যের সহিত বিক্রিয়ার দ্বারা লবণ ও জল উৎপন্ন করে। ৫। কার্বনেট বা বাই-কার্বনেট যুক্ত যৌগিক পদার্থের সহিত বিক্রিয়া করিয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

ক্ষারক ঃ যে সকল পদার্থ অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া কেবল লবণ ও জল উৎপন্ন করে তাহাদের ক্ষারক বলে। সাধারণতঃ ইহারা ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রকসাইড।

$$Na_2O + 2HCl = 2NaCl + H_2O$$

ক্ষারক অ্যাসিড লবণ জল

$$Ca(OH) + 2HCl = CaCl_2 + 2H_2O.$$

আবার দেখা যায় অ্যামোনিয়া কোন ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রকসাইড নয় কিন্তু অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ উৎপন্ন করে কিন্তু জল প্রস্তুত করে না। যথা, $NH_3 + HCl = NH_4Cl$.

সংজ্ঞা অনুসারে ঠিক না হইলেও অ্যামোনিয়াকে ক্ষারক বলিয়া মনে করা হয়। দেখা যায় কতকগুলি ক্ষারক জলে দ্রবীভূত হইয়া যায় ও ইহাদের জলীয় দ্রবণ সর্বদাই বিয়োজিত হইয়া হাইড্রোকিল (OH^-) আয়ন উৎপন্ন করে। ক্ষারকীয় পদার্থের এইরূপ দ্রবণকে কেবল মাত্র ক্ষার (**alkali**) বলে। যথা, $NaOH$, KOH, NH_4OH ইত্যাদি। $NaOH$ জলে দ্রবণীয়, ইহার জলীয় দ্রবণ বিয়োজিত হইয়া OH^- আয়ন উৎপন্ন করে। শুধু তাই নয় অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ ও জল প্রস্তুত করে।

ক্ষার + অ্যাসিড = লবণ + জল ; ক্ষারক + অ্যাসিড = লবণ + জল।

আবার, ইহাও দেখা যায় যে কতকগুলি ক্ষারকীয় অক্সাইড যথা, CaO, প্রথমে জলে দ্রবীভূত হইয়া হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয় ও পরে বিয়োজিত হইয়া OH আয়ন উৎপন্ন করে। যেমন, $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$;

$$Ca(OH)_2 \rightleftharpoons Ca^{++} + 2OH^-$$

অতএব ক্ষারকের সহিত ক্ষারের সম্বন্ধ বলিতে গিয়া বলা যায় ক্ষার মাত্রই ক্ষারক, কিন্তু সমস্ত ক্ষারক ক্ষার নহে। কারণ সমস্ত ক্ষারকই জলে দ্রবীভূত হয় না। যথা, জিঙ্ক অক্সাইড ক্ষারক কিন্তু জলে অদ্রবণীয় বলিয়া ক্ষার নয়।

ক্ষারের শ্রেণীবিভাগ :

বিভিন্ন ক্ষারের দ্রবণের আয়নরূপে বিয়োজিত হওয়ার ক্ষমতা বিভিন্ন।

যে ক্ষার জলীয় দ্রবণে তড়িৎ বিয়োজিত হইয়া বেশী মাত্রায় হাইড্রোকসিল (OH^-) গঠন করে উহাকে তীব্র ক্ষার বলে। যথা, সোডিয়াম হাইড্রকসাইড, পটাসিয়াম হাইড্রকসাইড ইতাদি।

যে ক্ষার তড়িৎ বিয়োজনের ফলে অল্প মাত্রায় হাইড্রোকসিল আয়ন (OH^-) গঠন করে তাহাই মৃদু ক্ষার। যথা, অ্যামোনিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রকসাইড ইত্যাদি।

ক্ষারের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ :

১। সচরাচর ক্ষারের দ্রবণ স্পর্শ করিলে পিচ্ছিল বলিয়া মনে হয়। ২। লাল লিটমাসের দ্রবণকে নীল করে। ৩। অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া

গেলে জিঙ্ক ও সালফিউরিক অ্যাসিড বিক্রিয়ক বলিয়া উহাদের বামদিকে ও জিঙ্ক সালফেট এবং হাইড্রোজেন বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ বলিয়া উহাদের ডানদিকে লিখিতে হয়।

Zinc + Sulphuric acid = Zinc Sulphate + Hydrogen.

বিক্রিয়াটি চিহ্ন ও সঙ্কেতের দ্বারা এই ভাবে প্রকাশ করিতে হয়—

$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$.

এইভাবে চিহ্ন ও সঙ্কেতের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রকাশ করার পদ্ধতিকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে।

রাসায়নিক সমীকরণ গঠনকালের কয়েকটি নিয়ম ঃ

১। যে সমস্ত পদার্থ বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে এবং যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাদের সবগুলি জানা প্রয়োজন এবং তাহাদের প্রত্যেকটির চিহ্ন বা সঙ্কেত জানিতে হইবে।

২। সমীকরণ প্রকাশ করিতে প্রত্যেকটি বস্তুকে উহার অণুর সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে। পরমাণুর দ্বারা প্রকাশ করা হয় না।

সমীকরণ চিহ্নের উভয় দিকে যে কোন প্রকারের পরমাণুর (অণুর মধ্যস্থিত) সংখ্যা এক হওয়া প্রয়োজন। এইজন্য প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন সংখ্যক অণুর সমাবেশ করিতে হইবে।

যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংযোগে জলের উৎপত্তি। ইহা প্রকাশ করিতে আমরা লিখিতে পারি—$H_2 + O = H_2O$.

ইহাতে রাসায়নিক বিক্রিয়াটি বুঝা যায় বটে, কিন্তু ইহা নিয়মানুগত নহে। কারণ, এইখানে অক্সিজেনকে অণুর সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করা হয় নাই। পরমাণুর সাহায্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। আবার, $H_2 + O_2 = 2H_2O$;

এইবার সবগুলি বস্তুই নিজ নিজ অণুতে লেখা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমীকরণটি নির্ভুল নহে। কেন না, দুইদিকে হাইড্রোজেন পরমাণুর সমষ্টি এক নহে।

এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটির সঙ্গত সমীকরণ হইবে—$2H_2 + O_2 = 2H_2O$.

ইহাতে সমীকরণ পদ্ধতির সব নিয়মই প্রতিপালিত হইয়াছে।

রাসায়নিক সমীকরণের সমতা করণ ঃ

রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় পদার্থের অণুগুলি বদলাইয়া নূতন অণুর সৃষ্টি

হয়। কিন্তু যে সমস্ত পরমাণুর দ্বারা পদার্থটি গঠিত তাহাদের বিনাশ বা বিলোপ হয় না। কেবল নূতন রকমে ঐ পরমাণুগুলি সজ্জিত হইয়া নূতন অণুর সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গিয়াছে রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে বিভিন্ন পদার্থের অণুর মধ্যে যত সংখ্যক পরমাণু থাকে বিক্রিয়ার পরেও নূতন পদার্থের মধ্যে ঠিক তত সংখ্যক পরমাণু বর্তমান থাকে। অতএব বিক্রিয়ার আগে রাসায়নিক পদার্থের মোট যে ওজন থাকে, বিক্রিয়ার পরেও নূতন রাসায়নিক পদার্থের ওজন সেইরূপই থাকে। যেমন, সোডিয়াম-হাইড্রকসাইড (কষ্টিক সোডা) ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে যে খাদ্য লবণ ও জল তৈরী হয় সেই বিক্রিয়াটির সমীকরণ এইরূপ—$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$.

এই বিক্রিয়াতে দেখা যাইতেছে বিক্রিয়ার আগে (বামদিকে) $Na + O + Cl + H + H$, মোট পাঁচটি পরমাণু। বিক্রিয়ার পরে (ডানদিকে) অর্থাৎ লবণ ও জলের অণুতে $Na + Cl + H + H + O$ মোট পাঁচটি পরমাণু। অতএব বিক্রিয়ার আগে ও পরে পরমাণুর প্রকৃতি ও সংখ্যা সমান। শুধু তাই নয়, হিসাব করিলে দেখা যায় ওজনও উভয় দিকে সমান।

$$Na + O + Cl + H + H + = Na + Cl + H + H + O$$
$$23 + 16 + 35{\cdot}5 + 1 + 1 = 23 + 35{\cdot}5 + 1 + 1 + 16$$
$$76{\cdot}5 = 76{\cdot}5$$

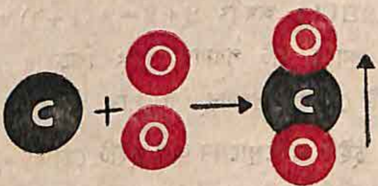
সেইজন্য বস্তুর বিনাশ নাই বা পরমাণুর ধ্বংস নাই এই সত্যতা বজায় রাখিবার জন্য **প্রয়োজনানুসারে সমীকরণে বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন সংখ্যক অণুর সমাবেশ করিতে হয়। এই পদ্ধতিকে সমীকরণের সমতাকরণ** (balancing) বলে।

অ্যালুমিনিয়াম ধাতু অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইড সৃষ্টি করে। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের অণুতে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু দুইটি অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। সমীকরণটি যদি লেখা যায়, $Al + O_2 = Al_2O_3$ কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কারণ অক্সিজেন অণুতে সর্বদাই দুইটি পরমাণু থাকে। অতএব অক্সিজেনের পরমাণু দুইদিকে সমান সংখ্যক করার জন্য বামদিকে 3 দিয়া ও ডানদিকে 2 দিয়া গুণ করিতে হইবে। এখন সমীকরণটি দাঁড়ায়, $Al + 3O_2 = 2Al_2O_3$। কিন্তু ইহাতে ডানদিকে অ্যালুমিনিয়ামের পরমাণুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে 4টি। অতএব বামদিকে অ্যালুমিনিয়ামের পরমাণু বাড়াইতে হইবে ও 4 দিয়া গুণ করিতে হইবে।

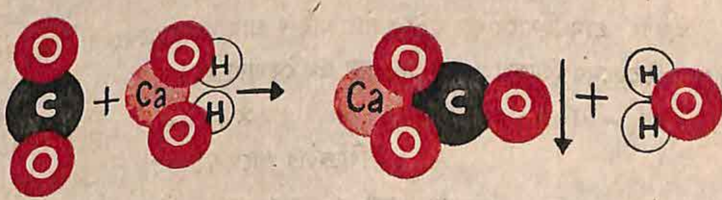
$4Al + 3O_2 = 2Al_2O_3$; ইহাই সমীকরণের সমতাকরণ ও সঠিক সমীকরণ লিখিবার পদ্ধতি।



১নং চিত্রে SO_4 পরমাণুপু-ঞ্জর যোজ্যতা দেখানো হইয়াছে 2।



২নং চিত্রে $C + O_2 = CO_2$। উভয় দিকে পরমাণুর সংখ্যা সমান (চিত্রে বল রূপে দেখানো হইয়াছে)।



৩নং চিত্রে $CO_2 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 + H_2O$.
উভয় দিকে পরমাণুর সংখ্যা সমান।

সমীকরণের আদিক ও মাত্রিক অর্থ :

রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায় :

(১) বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা :—
$H_2 + Cl_2 = 2HCl$; এই বিক্রিয়ায় জানা যায় যে হাইড্রোজেন অণু ও ক্লোরিণ

অণু সংযুক্ত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অণু গঠন করে। $2H_2 + O_2 = 2H_2O$; এই সমীকরণ হইতে জানা যায় যে হাইড্রোজেন অণু অক্সিজেন অণুর সহিত যুক্ত হইয়া জলের অণু গঠন করে।

(২) রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য কয়টি করিয়া বিক্রিয়ক অণুর প্রয়োজন এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরে কয়টি করিয়া বিক্রিয়ালব্ধ নূতন অণু তৈরী হয় তাহাও জানা যায়। যথা : উপরের বিক্রিয়া অনুযায়ী একটি হাইড্রোজেন (H_2) অণু, একটি ক্লোরিণ (Cl_2) অণু মিলিয়া দুইটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) অণু গঠন করে। সেইরূপ 2 অণু হাইড্রোজেন এবং 1 অণু অক্সিজেন 2 অণু জল গঠন করে।

(৩) বিক্রিয়ার আগে ও পরে মোট পরমাণুর ও অণুর সংখ্যা জানা যায়। যথা : $H_2 + Cl_2 = 2HCl$; অর্থাৎ $2 + 2 = 2\,(1 + 1)$ অর্থাৎ. আগে ছিল 4টি পরমাণু, পরেও আছে 4টি পরমাণু এবং বিক্রয়ার আগে ছিল দুইটি হাইড্রোজেন ও দুইটি ক্লোরিণ পরমাণু এবং পরে গঠিত দুইটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অণুর মধ্যেও দুইটি হাইড্রোজেন এবং দুইটি ক্লোরিণ পরমাণু রহিয়াছে।

(৪) বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের ওজন জানা যায়।

জল তৈরীর বিক্রিয়ার সমীকরণ : $2H_2 + O_2 = 2H_2O$;

অর্থাৎ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পারমাণবিক ওজন অনুযায়ী :

$$2(\,2 \times 1\,) + 16 \times 2 = 2(\,2 + 16\,)$$

(বিক্রিয়ার আগে) $36 = 36$ (বিক্রিয়ার পরে)

অর্থাৎ, গ্রাম হিসাবে ধরা হইলে বলা যায় 4 গ্রাম হাইড্রোজেনের সঙ্গে 32 গ্রাম অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলে 36 গ্রাম জল তৈয়ারী হইবে।

$H_2 + Cl_2 = 2HCl$; এই বিক্রিয়ায় : $2 \times 1 + 2 \times 35{\cdot}5 = 2(\,1 + 35{\cdot}5\,)$

বিক্রিয়ার আগে $73 = 73$ বিক্রিয়ার পরে।

(৫) রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে ও পরের পদার্থ যদি গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে তবে সমীকরণ হইতে আয়তনের হিসাবও জানা যায়। যথা :

H_2	$+ Cl_2$	$= 2HCl$
এক আয়তন	এক আয়তন	দুই আয়তন

অর্থাৎ, এক অণু পরিমাণ গ্যাসীয় দ্রব্যের জন্য আয়তনের পরিমাণ যদি এক ধরা হয়, তাহা হইলে দুই অণুর জন্য আয়তন পরিমাণ হইবে দুই, ইত্যাদি। আয়তনের পরিমাণ সি. সি হিসাবে ধরা হইলে উল্লিখিত সমীকরণ দেখিয়া বলা

যায়। এক সি. সি. হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক সি. সি. ক্লোরিণের মিলনে দুই সি. সি. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস তৈয়ারী হইবে অথবা দুই আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেনের সংযোগে দুই আয়তন বাষ্প উৎপন্ন হইবে

রাসায়নিক সমীকরণ হইতে কি জানা যায় না ঃ

(১) বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থগুলির ভৌতিক অবস্থা কি তাহা জানা যায় না।

(২) বিক্রিয়া তাপ উদগারী না তাপ শোষক (Exothermic or Endothermic) তাহা বুঝা যায় না।

(৩) বিক্রিয়ার গতি এবং সময় কোন কিছুরই আভাস পাওয়া যায় না।

(৪) বিক্রিয়ার চাপ, তাপ বা অনুঘটকের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাহাও বুঝা যায় না।

(৫) বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের রাসায়নিক গুণাবলী জানা যায় না।

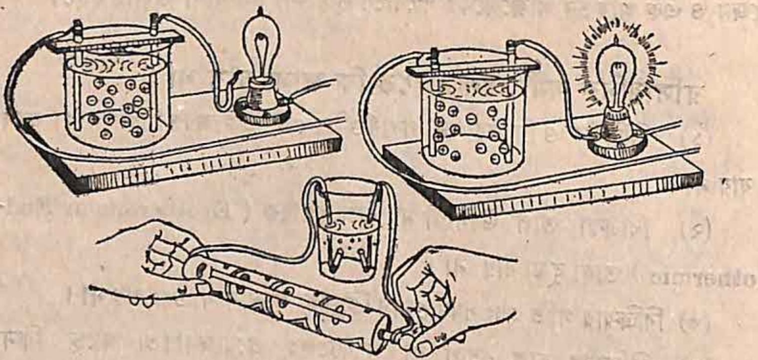
চতুর্থ অধ্যায়

তড়িৎ বিশ্লেষণ

সমস্ত বস্তর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলাচল করিতে পারে না ইহা আমরা আমাদের ব্যবহারীক জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জানি। লোহা, সোনা, তামা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, অথবা অ্যাসিড বা লবণের জলীয় দ্রবণ অনায়াসে তড়িৎ পরিবহন করিতে পারে। ইহাদিগকে তড়িৎ-পরিবাহী (conductors) বলে। সাধারণ অঙ্গার, গন্ধক, কাঠ বা রবার ইত্যাদির ভিতর দিয়া কখনও বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলাচল সম্ভব নয়। ইহাদের তড়িৎ অ-পরিবাহী (bad conductors) বলে। তড়িৎ পরিবহণে সক্ষম ও তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে পদার্থগুলিকে এইভাবে বিভক্ত করা চলে।

তড়িৎ-পরিবাহী ঃ যে সকল বস্তু বিদ্যুৎ পরিবহণ করিতে পারে, কিন্তু তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা তাহাদের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না তাহাদের তড়িৎ পরিবাহী বলে। ধাতুগুলি এই পর্যায়ে পড়ে।

তড়িৎ বিশ্লেষ্য ঃ কোন কোন বস্তুর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-পরিবহনকালে, বস্তুগুলি বিয়োজিত হইয়া যায়, এবং নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে। অ্যাসিড,



হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের দ্রবণের মধ্য দিয়া তড়িৎ চালাইলে আলো জ্বলিয়া উঠে।

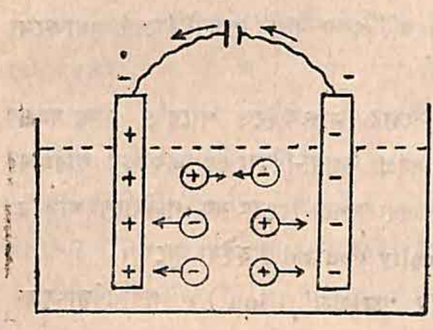
ক্ষার এবং লবণ জাতীয় পদার্থের দ্রবণ এই পর্যায়ে পড়ে। ইহারা সকলেই যৌগিক পদার্থ। সমস্ত দ্রবণীয় যৌগিক পদার্থের অবশ্য বিদ্যুৎ-পরিবহণ করার ক্ষমতা নাই যেমন—অ্যালকোহল, চিনি ইত্যাদি। যে সকল যৌগিক পদার্থ বিদ্যুৎ-পরিবাহী, তাহারাও কঠিন অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করিতে পারে না। কেবলমাত্র গলিত অবস্থায় অথবা কোন কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় উহারা তড়িৎ-পরিবাহী হইয়া থাকে।

যেমন, লবণের কঠিন দানার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-চালনা সম্ভব নয়। কিন্তু লবণের গলিত অবস্থায় অথবা উহার জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়া স্বচ্ছন্দে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলিতে পারে। শুষ্ক হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসীয় বা তরল উভয় অবস্থাতেই তড়িৎ পরিবহন করিতে পারে না। জল অতি অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ পরিবহন করিতে পারে, কিন্তু শুষ্ক হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ও জলের মিশ্রণ, অর্থাৎ দ্রবণ অতি সহজেই বিদ্যুৎ পরিবহন করে এবং তড়িৎ পরিচালনার ফলে বিয়োজিত হইয়া ক্লোরিণ ও হাইড্রোজেনে পরিণত হয়।

যে সকল তরল বা গলিত পদার্থ বিদ্যুৎ-প্রবাহে বিয়োজিত হয় তাহাদের তড়িৎ-বিশ্লেষ্য বা ইলেকট্রোলাইট বলে।

এই সকল তরল পদার্থ কোন বস্তুর দ্রবণ, নতুবা উহার গলিত-অবস্থা হইতে পারে। **বিদ্যুৎ সাহায্যে পদার্থের বিয়োজনকে তড়িৎ বিশ্লেষণ** (Electrolysis) বলে।

ক্যাথোড, অ্যানোড ও তড়িৎ-দ্বার ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তড়িৎ-বিশ্লেষণের জন্য অ্যাসিড, ক্ষার বা লবণের দ্রবণ ব্যবহৃত হয়। এই সকল দ্রবণকে একটি পাত্রে রাখিয়া উহার দুই প্রান্তে দুইটি ধাতুর পাত আংশিক ডুবাইয়া রাখা হয়। এই পাত দুইটি তারের সাহায্যে একটি ব্যাটারীর পজিটিভ এবং নেগেটিভ মেরুর সহিত যোগ করিয়া দিলে, লবণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই দুইটি ধাতুর পাতকে **তড়িৎ দ্বার** (electrodes) বলে। যে পাতটি পজিটিভ মেরুর সহিত সংযুক্ত তাহাকে **অ্যানোড** (anode) এবং অপরটি যাহা নেগেটিভ মেরুর সহিত সংযুক্ত তাহাকে **ক্যাথোড** (cathode) বলে। অতএব বিদ্যুৎ অ্যানোড-দ্বারে দ্রবণে প্রবেশ করে এবং ক্যাথোড দ্বারের সাহায্যে নির্গত হয়। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণের ভিতরের পদার্থটি বিয়োজিত হইয়া যাইতেছে এবং এই বিয়োজন ক্রিয়া কেবলমাত্র তড়িৎ-দ্বারের নিকটেই হইয়া থাকে, সম্পূর্ণ দ্রবণের ভিতর হয় না (চিত্র ৭)।



চিত্র ৭

অ্যানোড ও ক্যাথোড হিসাবে সাধারণতঃ তামা ও প্ল্যাটিনামের ব্যবহার বেশী। প্রয়োজন অনুসারে নিকেল, লৌহ, গ্যাস কার্বন, গ্রাফাইট ইত্যাদি বিদ্যুৎ-পরিবাহক পদার্থও ব্যবহৃত হয়।

অর্দ্ধ-তড়িৎ-পরিবাহী (Semi-conductor) ঃ কতকগুলি বস্তু স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যুৎ-অপরিবাহী কিন্তু উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ-পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও শেষ পর্য্যন্ত তড়িৎ-পরিবাহী বস্তুতে পরিণত হয়। যেমন, জার্মেনিয়াম।

তড়িৎ-বিয়োজন-বাদ (Theory of Electrolytic dissociation) : 1887 খৃষ্টাব্দে আরহেনিয়াস (Arrhenius) তাঁহার বিখ্যাত তড়িৎ-বিয়োজন-বাদ প্রবর্তন করেন। এই মতানুযায়ী তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থগুলি দ্রবীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই অস্থায়ী এবং স্বতঃভঙ্গুর হইয়া পড়ে। পদার্থের অণুগুলির অল্লাধিক অংশ বিযুক্ত বা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। এই অণুগুলি ভাঙ্গিয়া

একাধিক সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হয়। প্রত্যেকটি অণু হইতে দুই প্রকারের তড়িৎ-যুক্ত কণার সৃষ্টি হয়—কতকগুলি ধনাত্মক এবং অপরগুলি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-যুক্ত।

যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড জলে দ্রব হইলেই উহার অণু হইতে একটি ধণাত্মক সোডিয়াম এবং একটি ঋণাত্মক ক্লোরিণ কণা উৎপন্ন হয়।

$$NaCl = Na^{+} + Cl^{-}\ ;\ HBr = H^{+} + Br^{-}$$

উপরে '+' এবং '−' চিহ্ন দ্বারা ধণাত্মক এবং ঋণাত্মক কণা নির্দেশ করা হয়। ঐরূপ একটি চিহ্ন বিদ্যুতের একটি একক বুঝায় এবং ইহাদের যথাক্রমে পরা এবং অপরা বিদ্যুৎ বলে।

ধণাত্মক এবং ঋণাত্মক কণা সমান-সংখ্যক নাও হইতে পারে; কিন্তু সমগ্র পরা-বিদ্যুতের এককের পরিমাণ এবং সমগ্র অপরা-বিদ্যুতের এককের পরিমাণ সমান হইতে হইবে। অতএব, পরা এবং অপরা বিদ্যুৎ সম পরিমাণে থাকার জন্য দ্রবণটি তড়িৎ-নিরপেক্ষ (Electrically neutral) হইয়া থাকে।

অণু বিয়োজিত এই কণার নাম **'আয়ন'** (ion)। পরা-বিদ্যুৎযুক্ত কণাকে **'ক্যাটায়ন'** (cation) এবং অপরা-বিদ্যুৎযুক্ত কণাকে **অ্যানায়ন'** (anion) বলে। সংক্ষেপে, পদার্থের অণুর এই প্রকার তড়িৎ-যুক্ত কণাতে বিয়োজনকে 'আয়নিত হওয়া' বলা হয়।

কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু এবং উহার বিদ্যুৎ যুক্ত আয়নের ধর্মগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যেমন, সোডিয়ামের পরমাণু জলের সংস্পর্শে আসিবামাত্র রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু ধণাত্মক সোডিয়াম আয়নের সঙ্গে জলের কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। অন্যান্য আয়ন ও পরমাণু সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

অনেক ক্ষেত্রে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের অণু-বিয়োজিত হইয়া যৌগ মূলকের আয়নও সৃষ্টি করিতে পারে। যেমন: $H_2SO_4 \rightleftharpoons 2H^{+} + SO_4^{--}$

দ্রাবের বিয়োজনের ফলে যে সকল আয়ন উৎপন্ন হয় উহাদের কোন একটিকে পৃথক করিয়া লওয়া সম্ভব নয় এবং দ্রবণ হইতে জল সরাইয়া লইলে পুনরায় পদার্থটি ফিরিয়া পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিপরীত-ধর্মী আয়নগুলি পরস্পর পুনর্মিলিত হয়। কিন্তু কতকগুলি বস্তু চিনি, অ্যালকোহল ইত্যাদি জলে দ্রবীভূত হয় বটে, কিন্তু জলের সহিত বিক্রিয়া করে না বা অণুগুলি ভাঙ্গিয়া যায় না বলিয়া ইহাদের দ্রবণের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চলাচল করে না। ইহাদের তড়িৎ অবিশ্লেষ্য (Non-electrolyte) বলে।

তড়িৎ বিশ্লেষণ ঃ দ্রবণের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালনা করিলে দ্রাবের অণুগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে। বিদ্যুৎ অ্যানোডের সাহায্যে দ্রবণে প্রবেশ করে এবং অ্যানোড হইতে ক্যাথোডের দিকে প্রবাহিত হয়। অতএব অ্যানোডকে আমরা পরা-প্রান্ত (positive end) এবং ক্যাথোডকে অপরা-প্রান্ত (negative end) বলিতে পারি। বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে ঋণাত্মক আয়নগুলি স্বাভাবিক আকর্ষণেই বিপরীত-ধর্মী পরা-প্রান্তের দিকে এবং ধণাত্মক আয়নগুলি অপরা-প্রান্তের দিকে ধাবমান হয়। অ্যানায়নগুলি যখন পরাবিদ্যুৎ-সম্পন্ন অ্যানোডের উপর আসিয়া পড়ে তখন উহাদের অপরা-বিদ্যুৎ লোপ পায় এবং উহারা বিদ্যুৎহীন কণা বা পরমাণুতে পরিণত হয়। ক্যাথাডেও এই ভাবেই ক্যাটায়নগুলি বিদ্যুৎহীন হইয়া পরমাণু বা কণাতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। ফলে দুইটি তড়িৎ-দ্বারে পদার্থটি দুইটি নূতন পদার্থে বিশ্লেষিত হইয়া পড়ে। তড়িৎ-বিশ্লেষণ সর্বত্রই এইভাবে হয়।

প্লাটিনাম তড়িৎ-দ্বারের সাহয্যে জিঙ্ক ক্লোরাইড দ্রবণে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করিলে জিঙ্ক ক্যাটায়ন ক্যাথোডে গিয়া দুইটি অপরা-বিদ্যুতের একক সহযোগে জিঙ্ক পরামাণুতে পর্য্যবসিত হয়। ক্লোরিণ অ্যানায়ন অ্যানোডে যাইয়া একটি অপরা-বিদ্যুতের একক পরিত্যাগ পূর্বক ক্লোরিণ পরমাণু এবং অবশেষে ক্লোরিণ অণুতে পরিণত হয়। এইভাবে জিঙ্ক ক্লোরাইড তড়িৎ-বিশ্লিষ্ট হইয়া জিঙ্ক ও ক্লোরিণ উৎপন্ন করে।

$$ZnCl_2 = Zn^{++} + 2Cl^- \qquad 2Cl^- - 2e = 2Cl$$

$$Zn^{++} + 2e = Zn, \qquad Cl + Cl = Cl_2$$

"e" = অপরা বিদ্যুৎ একক (unit of negative electricity)

জিঙ্ক ক্লোরাইডের পরিবর্তে জিঙ্কের যে কোন দ্রবণীয় লবণ, যথা জিঙ্ক সালফেট, জিঙ্ক নাইট্রেট প্রভৃতির তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় সর্বদাই জিঙ্ক ক্যাথোডে সঞ্চিত হয়। ক্যাথোড অপরা-বিদ্যুৎবাহী। অতএব, জিঙ্ক আয়ন সব সময়ই ধণাত্মক বা পরাবিদ্যুৎ-যুক্ত হইবে।

এইরূপ যে কোনও ধাতুর দ্রবণীয় ক্লোরাইড যথা—পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি লইলে সর্বদাই ক্লোরিণ অ্যানোডে নির্গত হয়। অ্যানোড পরা-বিদ্যুৎবাহী। সুতরাং সর্বদাই ক্লোরিণ আয়ন ঋণাত্মক বা অপরা-বিদ্যুৎবাহী হইবে।

এইভাবে দেখা গিয়াছে, জিঙ্ক এবং অন্যান্য যে কোন ধাতুর আয়ন এবং

হাইড্রোজেনের আয়ন সকল সময়েই পরা-বিদ্যুৎবাহী (electro-positive) এবং হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্যান্য অধাতব মৌলিক পদার্থগুলি অপরা-বিদ্যুৎবাহী (elctro-negative)।

বিভিন্ন পদার্থের তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে কি কি বস্তু উৎপন্ন হইবে তাহা যে কেবল মাত্র সেই পদার্থের উপর নির্ভর করে, তাহা নয়। পরন্তু তড়িৎ-বিশ্লেষণকালীন অবস্থার উপরও নির্ভর করে। অনেক সময়েই তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে যে পদার্থটি তড়িৎ-দ্বারে উৎপন্ন হয় তাহা পরে দ্রাবক অথবা তড়িৎ-দ্বারের ধাতুর সহিত বিক্রিয়ার ফলে আবার নূতন রকম পদার্থে পরিণত হইয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ হইতেই ইহা বুঝা যাইবে।

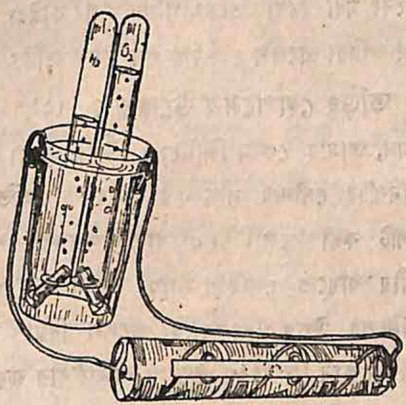
তড়িৎ-বিশ্লেষ্যর নাম	ব্যবহৃত ক্যাথোড	ব্যবহৃত অ্যানোড	ক্যাথোডে উৎপন্ন বস্তু	অ্যানোডে উৎপন্ন বস্তু
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড [ঘন]	কার্বন অথবা প্লাটিনাম	কার্বন	1 আয়তন হাইড্রোজেন	1 আয়তন ক্লোরিণ
সালফিউরিক অ্যাসিড (লঘু)	প্লাটিনাম	প্লাটিনাম	হাইড্রোজেন 2 আয়তন ; অম্লগ্রাহীতা হ্রাস পায়	অক্সিজেন 1 আয়তন; অম্লগ্রাহীতা বৃদ্ধি পায়।
কপার সালফেট	কপার	প্লাটিনাম	কপার সঞ্চিত হয়	অক্সিজেন এবং সালফিউরিক অ্যাসিড
কপার সালফেট	কপার	কপার	কপার সঞ্চিত হয়	কপার দ্রবীভূত হয়।

অতএব, তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলাফল হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, দ্রাব্য, দ্রাবক, দ্রবণের গাঢ়তা, তড়িৎদ্বারের বস্তু, তড়িৎপ্রবাহের মাত্রা প্রভৃতির উপর তড়িৎ বিশ্লেষণের ফল নির্ভর করে।

জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ : জল সুপরিবাহী না হইলেও উহার ভিতর বিদ্যুৎ চলাচল করিতে পারে এবং জল তড়িৎ-বিশ্লেষ্য। উহার কতক অণুর বিয়োজনের ফলে H^+ ক্যাটায়ন এবং OH^- অ্যানায়ন সৃষ্টি করে, যথা— $H_2O = H^+ + OH^-$। বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে OH অ্যানায়ন অ্যানোডে গিয়া

উহার অপরা-বিদ্যুৎভার পরিত্যাগ করে এবং OH যৌগমূলকে পরিণতি লাভ করে। পরে OH যৌগমূলকগুলি সংযুক্ত হইয়া জল এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে। সুতরাং অ্যানোডে আমরা অক্সিজেন নির্গত হইতে দেখি। ক্যাথোডে অবশ্যই H^+ আয়ন মুক্তি লাভ করিয়া প্রথমে হাইড্রোজেন পরমাণু এবং পরে হাইড্রোজেন অণুতে পরিণত হয়। অতএব জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণে আমরা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পাই।

পরীক্ষা : কাঁচের পাত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত বিশুদ্ধ জল লও। উহার মধ্যে ব্যবহার করা টর্চের ব্যাটারীর দুইটি কার্বন দণ্ড সংগ্রহ করিয়া ঐ পাত্রে রাখো ও তার সহযোগে ভালো ব্যাটারীর সহিত সংযুক্ত কর। দুইটি জল পূর্ণ পরীক্ষানল কার্বন দণ্ডের উপর উপুর করিয়া রাখো। দেখিবে পরীক্ষানলে বুদ বুদ আকারে যে গ্যাস সঞ্চিত হইয়াছে উহারা যথাক্রমে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।



চিত্র ৮

ক্যাথোডে : $H^+ + e = H$

$H + H = H_2$

$H_2O \rightarrow H^+ + OH$,

অ্যানোডে : $OH^- - e = OH$

$4OH = 2H_2O + O_2$

তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ :

(১) তড়িৎ-লেপন বা ইলেকট্রোপ্লেটিং (Electroplating)

(২) ইলেক্‌ট্রোটাইপিং (Electro-typing)

(৩) ধাতুর আকর (Ore) হইতে ধাতু নিষ্কাশন করিতে।
যথা : ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম. ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি।

(৪) ধাতু পরিশোধন করিতে। যথা : সোনা, তামা ইত্যাদি।

(৫) নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে। যথা : কষ্টিক সোডা, সোডিয়াম কার্বনেট ইত্যাদি।

(৬) বিভিন্ন ধাতুর ওজন এবং তুল্যাংকভার নির্ণয় করিতে।

তড়িৎ লেপণ বা ইলেকট্রোপ্লেটিংঃ একটি জিঙ্ক বা লোহার পাতকে কপার-সালফেট দ্রবণে ডুবাইলে কপার ঐ পাতের উপর জমা হয় এবং সমপরিমাণ জিঙ্ক বা লোহা উহাদের পাত হইতে দ্রবণে দ্রবীভূত হয়। এইভাবে একটি ধাতুকে অন্য ধাতুর উপর জমা করিয়া লেপণ করার পদ্ধতি বহু প্রাচীন।

1805 সালে ইটালীর ব্রুজেনটেলি (Brugentelli) তড়িৎ লেপন প্রথা প্রবর্তন করেন। যে ধাতু দ্বারা প্রলেপ দিতে হইবে সেই ধাতুর বিশ্লেষক্ষম দ্রবণীয় লবণের মধ্য দিয়া তড়িৎ পরিচালনা করিয়া সেই ধাতুটিকে অন্য ধাতুর উপর জমা করিয়া প্রলেপ দেওয়ার পদ্ধতিকে তড়িৎ লেপন (electroplating) বলে।

তড়িৎ লেপনের উদ্দেশ্য ঃ (১) কোন ধাতুকে সুশ্রী করিবার জন্য। যেমন, তামার কোন জিনিসের উপর রূপা বা সোনার প্রলেপ দিয়া তামার জিনিসটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়। চলতি ভাষায় ইহাকে রূপা বা সোনার গিলটি করা বলে। (২) ধাতুর ক্ষয়করণ বা মরিচা বন্ধ করার জন্য। যেমন, জলীয় বায়ুতে লোহার উপর মরিচা ধরে ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। লোহার কোন জিনিসের উপর নিকেলের প্রলেপ দিয়া মরিচা (rust) বন্ধ করা যায়। (৩) কোন জিনিসের ঔজ্জ্বল্য বাড়াইবার জন্য।

পদ্ধতি ঃ তড়িৎ লেপনের পূর্বে ধাতব জিনিসটি প্রথমে সাবান, বা ক্ষারের কোন দ্রবণে পরে লঘু অ্যাসিডে ডুবাইয়া খুব ভালো করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। যাহাতে ধাতব জিনিসটির উপর কোন তৈলজাতীয় পদার্থ বা ধাতব অক্সাইডের বা অন্য কোন অপদ্রবের আস্তরণ না থাকে।

তড়িৎ লেপন চৌবাচ্চায় (electroplating tank) সাধারণত তড়িৎ লেপন করা হয়। এই চৌবাচ্চায় রাখা হয় যে পদার্থ দ্বারা প্রলেপ দিতে হইবে সেই পদার্থের কোন বিশ্লেষক্ষম দ্রবণীয় লবণ (electrolyte)। এই দ্রবণের মধ্যে ঝুলাইয়া রাখা হয় তড়িৎ-দ্বারগুলি (electrodes)। এই চৌবাচ্চাগুলি সিমেণ্টের, কাঠের, কাঁচের বা কলাই করা লোহার তৈরী হইতে পারে।

যে দ্রব্যকে লেপন করা প্রয়োজন তাহাকে তড়িৎ লেপন চৌবাচ্চায় ক্যাথোড বা নেগেটিভ তড়িৎ-দ্বার রূপে ব্যবহার করা হয় এবং যে পদার্থ দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হয় সে পদার্থকে ব্যবহার করা হয় অ্যানোড বা পজিটিভ তড়িৎ-দ্বারের দণ্ডরূপে। যেমন, তামা বা লোহার কোন জিনিসের উপর রূপার প্রলেপ দেওয়ার জন্য অ্যানোডরূপে রূপার পাত, তড়িৎ বিশ্লেষ্যরূপে সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ এবং ক্যাথোড রূপে ব্যবহার করিতে হয় তামা বা লোহার পাত্রটি।

বিভিন্ন ধাতুর প্রলেপ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন তড়িৎ বিশ্লেষ্য ঃ

(১) **তামার প্রলেপ ঃ**—সোডিয়াম-কিউপ্রো-সায়নাইডের দ্রবণ।

(২) **রূপার প্রলেপ**—সোডিয়াম-আর্জেণ্টো-সায়নাইড ও অতিরিক্ত সোডিয়াম সায়নাইড দ্রবনের মিশ্রণ।

(৩) **সোনার প্রলেপ**—সোডিয়াম-অরাস-সায়নাইডের দ্রবণ।

(৪) **নিকেল প্রলেপ**—নিকেল-সালফেট ও নিকেল-অ্যামোনিয়াম সালফেটের মিশ্রিত দ্রবণ।

ক্রোমিয়াম প্রলেপ—সাধারণতঃ নিকেল প্রলেপের উপর ক্রোমিয়াম প্রলেপ দিতে হয়। ক্রোমিক-সালফেট ও ক্রোমিক অ্যাসিডের মিশ্রণ।

(৫) **রবারের প্রলেপ**—তড়িৎ লেপণ পদ্ধতিতে কোন ধাতব জিনিসের উপর রবারের প্রলেপ দেওয়া যায়। এইক্ষেত্রে শতকরা 35 ভাগ রবার, অ্যামোনিয়াম হাইড্রকসাইড, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং পটাসিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রিত দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

তড়িৎ বিশ্লেষ্যের প্রয়োজনীয় বিশেষত্ব ঃ

(১) সাধারণতঃ একাধিক তড়িৎ-বিশ্লেষ্যর দ্রবণের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়।

(২) তড়িৎ-বিশ্লেষ্যটি উত্তম তড়িৎ পরিবাহী হওয়া চাই।

(৩) তড়িৎ বিশ্লেষ্যগুলি জারিত, বিজারিত এবং আর্দ্র বিশ্লেষিত হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ

যৌগিক পদার্থগুলির চর্চার সুবিধার জন্য রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতে উহাদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন অ্যাসিড (acid), ক্ষারক (base) ও লবন (salt)। প্রাচীনকালেও সালফিউরিক, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুতির পদ্ধতি জানা ছিল। কিন্তু মধ্যযুগের অ্যাল-কেমিষ্টরা হইতে সুরু করিয়া বয়েল, ল্যাভয়সিয়ার, বার্জিলাস, লাইবিগ কেহই অ্যাসিডের সন্তোষজনক সংজ্ঞা দিতে পারেন নাই। 1887 সালে বিজ্ঞানী আরহেনিয়াসের সংজ্ঞাই মোটামুটি বিজ্ঞান ভিত্তিক। যথা :—



রোমানযুগে সৈন্যদের লবণ বেতনরূপে গণ্য হইত। ল্যাটিন ভাষায় লবণের নাম salarium উহা হইতে বর্তমান salary বা বেতন শব্দটি আসিয়াছে।

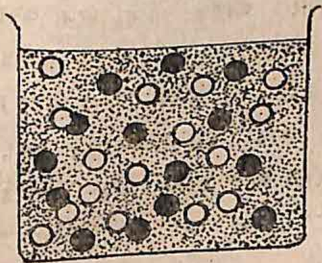
যে সকল হাইড্রোজেন যুক্ত যৌগিক পদার্থ জলীয় দ্রবণে আয়নিত হইয়া হাইড্রোজেন আয়ন H^+ উৎপন্ন করে তাহাদের অ্যাসিড বলে।

উদাহরণ : $\underset{\text{জলীয়দ্রবণ}}{HCl \rightarrow H^+ + Cl^-}.$

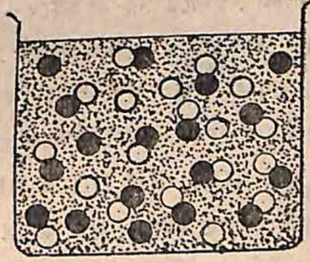
$\underset{\text{জলীয়দ্রবণ}}{H_2SO \rightarrow 2H^+ + SO_4^{--}}.$

দেখা যাইতেছে যে উভয় অ্যাসিডের জলীয়দ্রবণ আয়নিত H^+ ব্যতীত অপর কোন পরা-তড়িৎ যুক্ত (positive) আয়ন উৎপন্ন করে না। কিন্তু সকল অ্যাসিডের আয়নরূপে বিয়োজিত হওয়ার ক্ষমতা এক নয়। কাহারও বেশী কাহারও কম। যেমন হাইড্রোক্লোরিক, সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডের বেশী। ইহারা তীব্র অ্যাসিড (strong acid)।

আবার কার্বনিক অ্যাসিড, অ্যাসেটিক অ্যাসিডের কম। ইহারা মৃদু অ্যাসিড (weak acid) অর্থাৎ তীব্র অ্যাসিডের জলীয়দ্রবণে বেশী আয়ন থাকে আর অল্প অণু থাকে। আর মৃদু অ্যাসিডে অল্প আয়ন থাকে, বেশী অণু থাকে চিত্র (৯) ও (১০)।



চিত্র ৯ বেশী আয়ন অল্প অণু



চিত্র ১০ অল্প আয়ন বেশী অণু

যদি বলা হয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড শতকরা 0·4% আয়নিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে প্রতি একহাজার অ্যাসেটিক অ্যাসিডের অণুর মধ্যে মাত্র চারিটি অণু বিয়োজিত হইয়া আয়নরূপে বিরাজ করে।

$$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-.$$

অ্যাসিডের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ ঃ

অ্যাসিডের এই ধর্মগুলি জানা থাকিলে আমরা অ্যাসিডকে চিনিতে পারি। ১। অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ অম্ল স্বাদ যুক্ত। বলা বাহুল্য, কাঁচা লেবু টক কারণ ইহাতে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে। দৈ টক ল্যাকটিক্ অ্যাসিড আছে বলিয়া। ২। নীল লিটমাসের দ্রবণকে লাল করে। ৩। কতকগুলি ধাতুর সহিত বিক্রিয়া করিয়া হাইড্রোজেন ও লবণ উৎপন্ন করে। ৪। সর্বদা ক্ষারক দ্রব্যের সহিত বিক্রিয়ার দ্বারা লবণ ও জল উৎপন্ন করে। ৫। কার্বনেট বা বাই-কার্বনেট যুক্ত যৌগিক পদার্থের সহিত বিক্রিয়া করিয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

ক্ষারক ঃ যে সকল পদার্থ অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া কেবল লবণ ও জল উৎপন্ন করে তাহাদের ক্ষারক বলে। সাধারণতঃ ইহারা ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রকসাইড।

$$Na_2O + 2HCl = 2NaCl + H_2O$$

ক্ষারক অ্যাসিড লবণ জল

$$Ca(OH) + 2HCl = CaCl_2 + 2H_2O.$$

আবার দেখা যায় অ্যামোনিয়া কোন ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রকসাইড নয় কিন্তু অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ উৎপন্ন করে কিন্তু জল প্রস্তুত করে না। যথা, $NH_3 + HCl = NH_4Cl$.

সংজ্ঞা অনুসারে ঠিক না হইলেও অ্যামোনিয়াকে ক্ষারক বলিয়া মনে করা হয়। দেখা যায় কতকগুলি ক্ষারক জলে দ্রবীভূত হইয়া যায় ও ইহাদের জলীয় দ্রবণ সর্বদাই বিয়োজিত হইয়া হাইড্রোকিল (OH^-) আয়ন উৎপন্ন করে। ক্ষারকীয় পদার্থের এইরূপ দ্রবণকে কেবল মাত্র ক্ষার (alkali) বলে। যথা, $NaOH$, KOH, NH_4OH ইত্যাদি। $NaOH$ জলে দ্রবণীয়, ইহার জলীয় দ্রবণ বিয়োজিত হইয়া OH^- আয়ন উৎপন্ন করে। শুধু তাই নয় অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ ও জল প্রস্তুত করে।

ক্ষার + অ্যাসিড = লবণ + জল ; ক্ষারক + অ্যাসিড = লবণ + জল।

আবার, ইহাও দেখা যায় যে কতকগুলি ক্ষারকীয় অক্সাইড যথা, CaO, প্রথমে জলে দ্রবীভূত হইয়া হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয় ও পরে বিয়োজিত হইয়া OH আয়ন উৎপন্ন করে। যেমন, $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$.

$$Ca(OH)_2 \rightleftharpoons Ca^{++} + 2OH^-$$

অতএব ক্ষারকের সহিত ক্ষারের সম্বন্ধ বলিতে গিয়া বলা যায় ক্ষার মাত্রই ক্ষারক, কিন্তু সমস্ত ক্ষারক ক্ষার নহে। কারণ সমস্ত ক্ষারকই জলে দ্রবীভূত হয় না। যথা, জিঙ্ক অক্সাইড ক্ষারক কিন্তু জলে অদ্রবণীয় বলিয়া ক্ষার নয়।

ক্ষারের শ্রেণীবিভাগ :

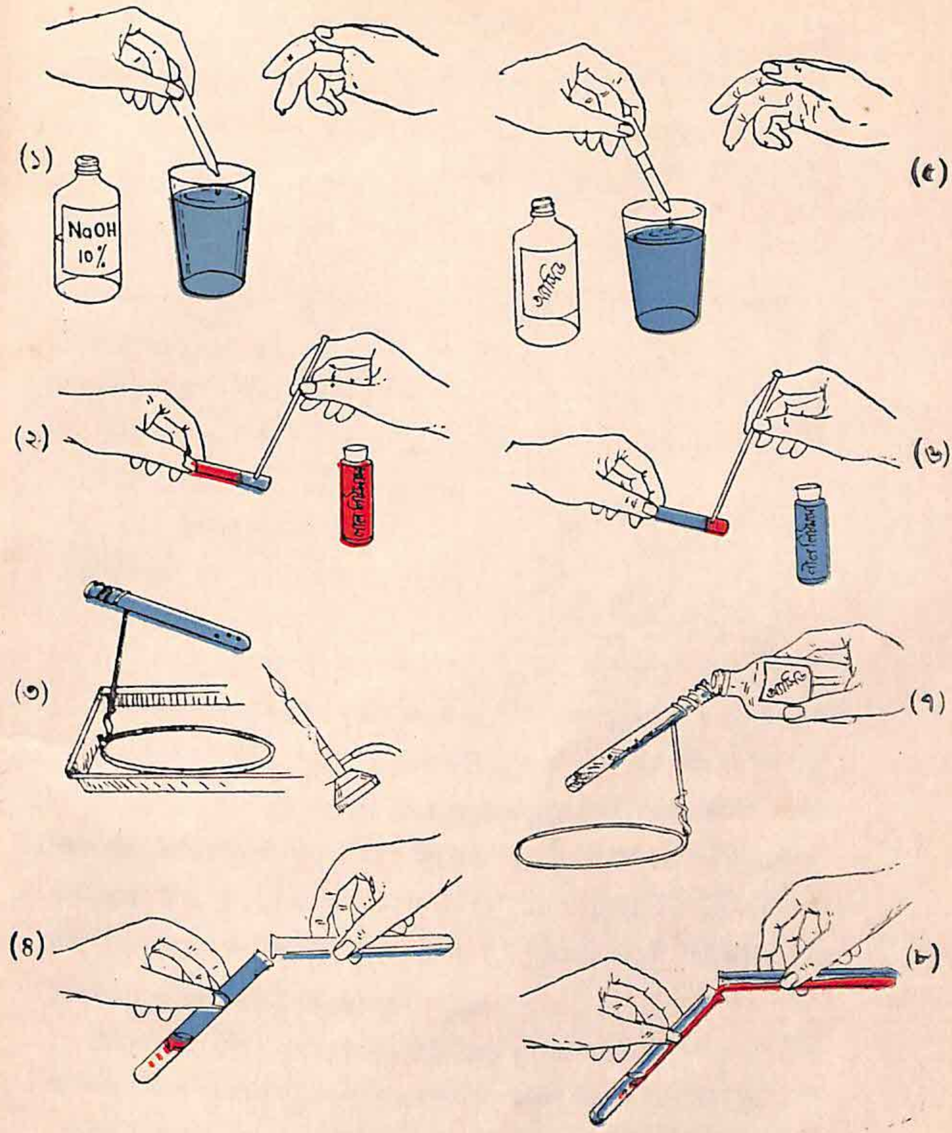
বিভিন্ন ক্ষারের দ্রবণের আয়নরূপে বিয়োজিত হওয়ার ক্ষমতা বিভিন্ন।

যে ক্ষার জলীয় দ্রবণে তড়িৎ বিয়োজিত হইয়া বেশী মাত্রায় হাইড্রোকসিল (OH^-) গঠন করে উহাকে তীব্র ক্ষার বলে। যথা, সোডিয়াম হাইড্রকসাইড, পটাসিয়াম হাইড্রকসাইড ইতাদি।

যে ক্ষার তড়িৎ বিয়োজনের ফলে অল্প মাত্রায় হাইড্রোকসিল আয়ন (OH^-) গঠন করে তাহাই মৃদু ক্ষার। যথা, অ্যামোনিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রকসাইড ইত্যাদি।

ক্ষারের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ :

১। সচরাচর ক্ষারের দ্রবণ স্পর্শ করিলে পিচ্ছিল বলিয়া মনে হয়। ২। লাল লিটমাসের দ্রবণকে নীল করে। ৩। অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া



ক্ষার চিনিবার কয়েকটি পরীক্ষা। অ্যাসিড চিনিবার কয়েকটি পরীক্ষা।

(১) পিচ্ছিল, লাল লিটমাস দিলে নীল হয়, (২) লাল লিটমাসের কাগজকে নীল করে, (৩) ধাতুর সহিত বিক্রিয়া করে, (৪) অ্যাসিড মিশ্রিত করিলে নীল দ্রবণ লাল হয়, (৫) স্বাদ টক, (৬) নীল লিটমাসকে লাল করে, (৭) ধাতুর সহিত বিক্রিয়া করে, (৮) নীল ক্ষারের দ্রবণকে লাল করে।

লবণ ও জল প্রস্তুত করে। ৪। অ্যামোনিয়াম লবণের সহিত মিশ্রিত করিলে ঐ লবণ বিয়োজিত হয় ও অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ বাহির হয়। ৫। কোন কোন ক্ষার শরীরের ত্বকের সংস্পর্শে আসিলে উহা দাহ বা ক্ষতের সৃষ্টি করে। যথা, NaOH, KOH ইত্যাদি।

প্রশমন ক্রিয়া (Neutralisation): অ্যাসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ার ফলে লবণ ও জল উৎপন্ন হয়। এই লবণ ও জলের কোন ক্ষারকত্ব বা অম্লত্ব থাকে না। অতএব বলা যায় অ্যাসিড ক্ষারকীয় পদার্থের ক্ষারত্ব দূর করে এবং ক্ষারক ও অ্যাসিডের অম্লত্ব প্রশমিত করে। অ্যাসিড এবং ক্ষারকের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়াকে **প্রশমন ক্রিয়া** বলে।

প্রশমন-ক্রিয়ার ফলে যে লবণ উৎপন্ন হয়, সেইগুলি দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবাহী হয় এবং বিয়োজিত অবস্থায় থাকে।

যেমন— ক্ষারক অ্যাসিড লবণ জল

$$K^+OH^- + H^+Cl^- = K^+Cl^- + H_2O.$$

দেখা যাইতেছে যে কোন অ্যাসিড ও ক্ষারকের প্রশমণ ক্রিয়াতে কেবল H^+ আয়নের সহিত OH^- আয়নের রাসায়নিক মিলন সম্পাদিত হয়। অতএব প্রশমন ক্রিয়ার আয়নিক ব্যাখ্যা এইরূপ—**সমতুল্যাংক পরিমাণ অ্যাসিড ও ক্ষার মিশ্রিত করিলে অ্যাসিডের হাইড্রোজেন (H^+) এবং ক্ষারের হাইড্রকসিল আয়ন (OH^-) পারস্পরিক সংযোগে অবিয়োজিত ও প্রশম জল অণু (H_2O) গঠন করিয়া যে বিক্রিয়া ঘঠায় তাহাকে প্রশমন বলে।**

লবণ: অ্যাসিড এবং ক্ষারকের বিক্রিয়াতে জলের সহিত অপর যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকেই লবণ বলে। অর্থাৎ প্রশমন ক্রিয়ার ফলে জল ছাড়া যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাই লবণ। আবার অ্যাসিডের হাইড্রোজেন কোন ধাতুর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াও লবণের সৃষ্টি হয়।

যথা, $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2.$

জিঙ্ক অ্যাসিড জিঙ্ক-সালফেট লবণ

অ্যাসিড ও ক্ষারকের প্রশমনক্রিয়া হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ক্ষারকের পরাবিদ্যুৎবাহী অংশ অ্যাসিডের অপরাবিদ্যুৎবাহী অংশের সহিত মিলিত হইয়া লবণ গঠন করে। যথা, $Na^+ + OH^- + H^+ + Cl^- = Na^+Cl^- + H_2O.$

এই জন্য লবণের একটি অণুকে দুইটি অংশে ভাগ করা হয়। ধাতব অংশকে ক্ষারকীয় অংশ (base) বা ক্ষারক-মূলক এবং অপর অংশকে আম্লিক অংশ (acidic) বা অ্যাসিড-মূলক বলা হয়। এই সমস্ত পরাবিদ্যুৎবাহী এবং অপরাবিদ্যুৎবাহী আয়নগুলি মৌলিক পদার্থ বা যৌগমূলকও হইতে পারে; যেমন—$NH_4^+ \; OH^- + H^+NO_3 = NH_4NO_3^- + H_2O$.
NH_4NO_3 লবণে NH_4 যৌগমূলকটি পরাবিদ্যুৎবাহী আয়ন বলিয়া ধাতুর ধনাত্মক আয়নের মত ব্যবহার করে কিন্তু $SO_4^=$, $CO_3^=$ ইত্যাদি যৌগমূলকগুলি ঋণাত্মক আয়নের ধর্ম প্রকাশ করে।

অতএব লবণের সন্তোষজনক সংজ্ঞা এইরূপ—

অ্যাসিডের প্রতিস্থাপন যোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু বা আয়ন সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে কোন ধাতুর পরমাণু বা ক্ষারকীয় মূলক বা আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইলে যে যৌগিক পদার্থটি গঠিত হয় তাহাই লবণ।

লবণের শ্রেণী বিভাগ : শমিত লবণ, অম্ল লবণ ও ক্ষার লবণ।

যেমন, অম্ল-লবণে—প্রতিস্থাপন যোগ্য হাইড্রোজেন থাকে। $NaHSO_4$, $KHCO_3$ ইত্যাদি। শমিত লবণে—কোন প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন থাকে না। K_2SO_4, Na_2CO_3 ইত্যাদি। ক্ষার লবণে—প্রতিস্থাপন যোগ্য হাইড্রকসিল থাকে। $Pb(OH)(NO_3)$।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া

জারণ ক্রিয়া (Oxidation) : কোন পদার্থের জারণ বলিতে সাধারণতঃ উহার সহিত অক্সিজেনের সংযোগ বুঝায়। ম্যাগনেসিয়াম বা ফসফরাসের দহনকালে অক্সিজেনের সহিত সংযোগ ঘটে। অর্থাৎ উহারা জারিত লইয়া উহাদের অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। $2Mg + O_2 = 2MgO$; $4P + 5O_2 = 2P_2O_5$.

অক্সিজেন সংযোগ না হইয়া যদি কোন বিক্রিয়ার ফলে কোন পদার্থ হইতে হাইড্রোজেন দূরীকৃত হয়, তাহাও জারণ-ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন,

হাইড্রোজেন সালফাইডের (H_2S) সহিত ব্রোমিনের বিক্রিয়ার ফলে উহার হাইড্রোজেন দূরীভূত হয় এবং সালফার পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন সালফাইড জারিত হইয়া সালফার এ পরিণত হইয়াছে।

$$H_2S + Br_2 = S + 2HBr.$$

কিন্তু জারণ শব্দটি আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আমরা জানি, অক্সিজেন অপরাবিদ্যুৎবাহী মৌল। অক্সিজেনের পরিবর্তে যদি অন্য কোন অপরাবিদ্যুৎ-বাহী মৌল কোন পদার্থে যুক্ত হয় তাহা হইলে সেই বিক্রিয়াটিও জারণ বলিয়া গণ্য হইবে। $2FeCl_2 + Cl_2 = 2FeCl_3$.

এই ক্ষেত্রে অপরা বিদ্যুৎবাহী ক্লোরিণ যুক্ত হওয়ায়, ফেরাস ক্লোরাইড জারিত হইয়া ফেরিক্ ক্লোরাইডে পরিণত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ফেরিক্ ক্লোরাইডের অপরাবিদ্যুৎবাহী ক্লোরিণের অংশের অনুপাত জারণের ফলে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, ফেরাস ক্লোরাইড জারিত হইয়া ফেরিক্ ক্লোরাইডে পরিণত হওয়ার ফলে আয়রণের যোজ্যতা বাড়িয়া গিয়াছে! অর্থাৎ ফেরাস ক্লোরাইডে দ্বিযোজী আয়রণ, ফেরিক ক্লোরাইডে ত্রিযোজীতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং জারণ শ্রেণীভূক্ত বিক্রিয়াতে পদার্থের পরাবিদ্যুৎবাহী অংশের অর্থাৎ ধাতুর যোজ্যতা বৃদ্ধি পায়। যেমন, $SnCl_2$ জারিত হইলে $SnCl_4$ হয়। এই ক্ষেত্রেও টিনের (Sn) যোজ্যতা জারণের ফলে দুই হইতে চার হইয়াছে।

সুতরাং কোন পদার্থে অক্সিজেন সংযোগ, অথবা কোন পদার্থ হইতে হাইড্রোজেন দূরীকরণ, অথবা কোন পদার্থের অপরা-বিদ্যুৎবাহী অংশের অনুপাত বৃদ্ধি-এজাতীয় যে কোন প্রকারের রাসায়নিক সংগঠনকে জারণ বলা হয়।

বিজারণ: বিজারণ-ক্রিয়া জারণের সম্পূর্ন বিপরীত। মোটামুটি কোন পদার্থ হইতে অক্সিজেন সরাইয়া লইলে উহা বিজারিত হইয়াছে বলা হয়। হাইড্রোজেন গ্যাসে কপার অক্সাইড উত্তপ্ত করিলে কপার ধাতু পাওয়া যায়, কারণ, হাইড্রোজেন দূরীভূত হয় ও অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন করে। অর্থাৎ কপার অক্সাইডের অক্সিজেন দূরীকৃত হয়। ইহাই বিজারণ ক্রিয়া। $CuO + H_2 = Cu + H_2O$.

আবার কোন পদার্থে হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়াও বিজারণ ক্রিয়া। যথা,

$$Cl_2 + H_2 = 2HCl.$$

এইক্ষেত্রে ক্লোরিণের সহিত হাইড্রোজেনের সংযোগ হইয়াছে, অর্থাৎ ক্লোরিণ বিজারিত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইয়াছে।

'জারণের' মত 'বিজারণ ক্রিয়া' আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন পদার্থের অপরাবিদ্যুৎবাহী অংশের অনুপাত বিক্রিয়ার ফলে যদি হ্রাস পায়, তাহা হইলে সেইরূপ বিক্রিয়াকে বিজারণ ক্রিয়া বলা হয়। যেমন, ফেরিক ক্লোরাইডের ক্লোরিণের অংশ জায়মান হাইড্রোজেনের সাহায্যে কমিয়া যায় ও উহা ফেরাস্ ক্লোরাইডে পরিণত হয়। $2FeCl_3 + 2H = 2FeCl_2 + 2HCl$.

অতএব, বলা যায় ফেরিক ক্লোরাইড বিজারিত হইয়াছে।

$$HgCl_2 + Hg = Hg_2Cl_2.$$

এই বিক্রিয়াতে মারকিউরিক ক্লোরাইড মারকিউরাস ক্লোরাইড হওয়াতে অপরাবিদ্যুৎবাহী Cl_2 এর অনুপাত কমিয়াছে। সুতরাং ইহা $HgCl_2$এর বিজারণ।

কোন পদার্থে হাইড্রোজেন সংযোগ, অথবা কোন পদার্থ হইতে অক্সিজেন দূরীকরণ, অথবা কোন পদার্থের অপরাবিদ্যুৎ-বাহী অংশের অনুপাত হ্রাস এই জাতীয় যে কোন প্রকারের রাসায়নিক সংগঠনকে বিজারণ বলা হয়।

আমরা দেখিয়াছি, ফেরিক ক্লোরাইড বিজারিত হইয়া ফেরাস্ ক্লোরাইডে পরিণত হয়। লক্ষ্য করা যাইতেছে, ফেরিক ক্লোরাইডে আয়রণ পরমাণু ত্রি-যোজী কিন্তু ফেরাস্ ক্লোরাইডে দ্বি-যোজী। অর্থাৎ বিজারণের ফলে আয়রণের যোজ্যতা কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং বলা যায়, বিজারণ বিক্রিয়াতে পদার্থের পরাবিদ্যুৎবাহী অংশের অর্থাৎ ধাতুর যোজ্যতা হ্রাস পায়।

জারক ও বিজারক দ্রব্য : যে সকল পদার্থের সাহায্যে কোন বস্তুর জারণ কার্য্য সম্পাদিত হয় উহাদিগকে জারক দ্রব্য, এবং যে সকল পদার্থের সাহায্যে বিজারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় তাহাদিগকে বিজারক দ্রব্য বলে। অর্থাৎ, জারণ বিক্রিয়ার সময় জারক দ্রব্যের প্রয়োজন এবং বিজারণ বিক্রিয়ার জন্য বিজারক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়।

কয়েকটি জারক ও বিজারক দ্রব্যের নাম :

জারক দ্রব্য	বিজারক দ্রব্য
অক্সিজেন, ওজোন, হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড, নাইট্রিকঅ্যাসিড, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ইত্যাদি।	জায়মান হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন গ্যাস, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাথমিক গ্যাসীয় পদার্থ

তরল বায়ু: তরল বাতাসের আংশিক পাতনের সাহায্যেও বায়ু হইতে অক্সিজেন পাওয়া যায়। বাতাস হইতে প্রথমে উহার কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প দূরীভূত করা হয়। তারপর অতিরিক্ত চাপে উহাকে ক্রমাগত শীতল করা হয়। উষ্ণতা কমাইবার জন্য বাহ্যিক উপায় ছাড়াও, হঠাৎ অতিরিক্ত চাপ হইতে সরু নলের ভিতর ভিতর দিয়া বাতাসকে অল্প চাপে প্রসারিত করা হয়। ইহাতেও বাতাসের উষ্ণতা খুব কমিয়া যায় (জুল-টমসন্ প্রক্রিয়া)। এইভাবে যখন উষ্ণতা-190° সেলসিয়াসের নীচে পৌঁছায়, তখন বায়ু ক্রমশঃ তরল হইতে থাকে। তরল বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে। নাইট্রোজেনের স্ফুটনাঙ্ক—195° সেলসিয়াস এবং অক্সিজেনের স্ফুটনাঙ্ক-183° সেলসিয়াস। অতএব নাইট্রোজেন অক্সিজেন অপেক্ষা অধিকতর উদ্বায়ী। সুতরাং তরল বাতাসকে আংশিকভাবে পাতিত করিলে প্রথমে নাইট্রোজেন গ্যাস হইয়া চলিয়া যাইবে এবং পাতনযন্ত্রে অক্সিজেনের অনুপাত বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে প্রায় নাইট্রোজেন-মুক্ত অক্সিজেন পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এত শীতল অবস্থায় পাতনকার্য্যে বিশেষ রকম যন্ত্রের ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কোন শিল্পে অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন হইলে সচরাচর এইরূপেই তৈয়ারী করা হয়। অসুস্থ হইলে শ্বাস কার্যের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য সিলিণ্ডারে যে অক্সিজেন আনা হয় উহা এইভাবে তৈয়ারী করা হয়।

নিষ্ক্রিয় গ্যাস (Inert gases) 1894 খৃষ্টাব্দে র‍্যালে (Raleigh) দেখিতে পাইলেন যে বায়ু হইতে প্রস্তুত নাইট্রোজেনের প্রতি লিটারের ওজন 1·2572 গ্রাম; কিন্তু রাসায়নিক উপায়ে উৎপন্ন নাইট্রোজেনের ওজন, 1·2505 গ্রাম। বায়বীয় নাইট্রোজেন এবং রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত নাইট্রোজেনের ঘনত্বের এই বৈষম্য দেখিয়া র‍্যালে মনে করিলেন যে বায়ুর নাইট্রোজেনে আরও কোন গ্যাস নিশ্চয়ই বর্তমান আছে। বায়ুকে পুনঃ পুনঃ নানাভাবে বিশোধিত করিয়া দেখা গেল যে যে স্বল্প পরিমাণ গ্যাস পড়িয়া থাকে উহার ঘনত্ব নাইট্রোজেন হইতে স্বতন্ত্র এবং অক্সিজেনের সহিত বিদ্যুৎক্ষরণের দ্বারাও উহার কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। এই গ্যাস কোন রকম পদার্থের

সহিতই রাসায়নিক ক্রিয়া করে না। সুতরাং ইহার নাম দেওয়া হইল নিষ্ক্রিয় গ্যাস। অপর কোন মৌলের সহিত যুক্ত হয় না বলিয়া উহাদিগকে যোজ্যতাহীন বা শূন্যযোজী (Zero valent) মৌল বলা হয়। ইহারা সংখ্যায় পাঁচটি।

এই পাঁচটি গ্যাসের নাম যথাক্রমে,

হিলিয়াম (Helium), নিয়ন (Neon), আরগন (Argon), ক্রপ্টন (Krypton), জিনন (Xenon),

বিজ্ঞাপনের জন্য যে লাল, নীল রঙ্গের বিজলী বাতি ব্যবহার করা হয় উহার মধ্যে এই সকল নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। নানান অনুপাতে নিয়ন মিশ্রিত গ্যাস ভর্ত্তি করিয়া নানা রঙ্গের আলোর বাতি তৈয়ারী হয় বলিয়া ইহাদের নাম নিয়ন-আলো।

কার্বন ডাই-অক্সাইড বিবর্তন চক্র (Carbon dioxide cycle):

কার্বন ডাই-অক্সাইড আমাদের শ্বাসকার্যে সাহায্য না করিলেও বাতাসের একটি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় উপাদান। বাতাসে ইহার পরিমান 10,000 মাত্রায় 3 ভাগ অর্থাৎ আয়তনে শতকরা 03 ভাগ। জীবদেহ এবং উদ্ভিদ দেহের প্রাণশক্তি এই কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপর নির্ভর করে। ইহার সাহায্যে উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি বজায় থাকে। জীবজন্তু ও উদ্ভিদের দেহে কার্বন ঘটিত যৌগ আছে। বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতেই উহাদের দেহের কার্বন গঠিত হয়। প্রাণী জগতে ও উদ্ভিদ জগতে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহৃত হইলেও মোটামুটি বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় স্থির থাকে। নিম্নলিখিত উপায়ে ইহা সম্ভব হয়—

(১) উদ্ভিদ সূর্য্যালোকের এবং সবুজ ক্লোরোফিলের (Chlorophyl) সাহায্যে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল হইতে নিজ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপন্ন করে। উদ্ভিদের দেহ বৃদ্ধি হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত ঐ দেহ শক্ত কাঠ জাতীয় জিনিসে পরিণত হয়। এই প্রণালীকে আলোক সংশ্লেষণ (Photo-synthesis) বলে।

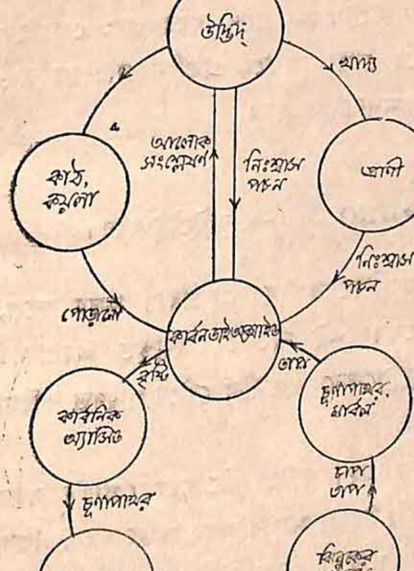
(২) প্রাণীদেহের কার্বন উদ্ভিদ হইতে আসে। কোন কোন প্রাণী খাদ্যরূপে উদ্ভিদ গ্রহণ করে এবং কোন কোন প্রাণী অন্যান্য প্রাণীকেও খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। খাদ্য মধ্যস্থিত কার্বন দেহের মধ্যে বিক্রিয়া করিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। নিঃশ্বাসের ভিতর দিয়া এই কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে চলিয়া যায়।

ইহা ছাড়া প্রাণী এবং উদ্ভিদের দেহের ধ্বংস এবং পচনের ফলেও কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় ও উহা বাতাসে চলিয়া যায়।

(৩) বাতাসের এই কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়া নদীতে পরে। নদীর জল সমুদ্রে গিয়া পড়ে। সমুদ্রের জলে সেইজন্য যে পরিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায় উহা বায়ু অপেক্ষা 20 গুণ বেশী। সেইজন্য সমুদ্রের জল খর। সমুদ্রের সামুদ্রিক জন্তুরা খরতা লবণ গ্রহণ করিয়া (shellfish) ইহার সাহায্যে শক্তখোল (shell) তৈয়ারী করে। ইহা ক্যালসিয়াম কার্বনেট। ইহারাই পরে চুনাপাথর (limestone) এবং খড়িমাটি (chalk) ইত্যাদি খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। এই ক্যালসিয়াম কার্বনেট মাটির জৈব অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ায় বা তাপের ফলে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে উহাও বাতাসে ফিরিয়া যায়।

(৪) উদ্ভিদ মাটির তলায় চাপা পড়িয়া উহার দেহের কাঠ জাতীয় অংশ দীর্ঘদিন ধরিয়া জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কয়লায় পরিণত হয়। এই কয়লা পোড়াইলে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয় ইহাও বাতাসে চলিয়া যায়।

এই ভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের পারমাণ প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। ইহাই কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিবর্তন চক্র (চিত্র ১১)।



কার্বন ডাই-অক্সাইড চক্র

চিত্র ১১

নাইট্রোজেন চক্র: নাইট্রোজেন যৌগ বাতাসে ও জীবজগতে প্রাণীদেহে ও উদ্ভিদ-দেহেও প্রোটিন হিসাবে প্রচুর পরিমাণে আছে। এই

প্রোটিন ব্যতীত প্রাণীজগতের অস্তিত্ব বা বৃদ্ধি সম্ভব নয়। বাতাসের অক্সিজেনও জীবজগতের প্রাণশক্তির জন্য অপরিহার্য। মানুষ বা অন্যান্য জীবজন্তু সরাসরি এই অক্সিজেন গ্রহণ করে ও ব্যবহার করে। প্রোটিনের জন্যও প্রাণী বা উদ্ভিদের নাইট্রোজেন খুবই প্রয়োজন। কিন্তু নাইট্রোজেন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। সুতরাং বাতাসের এই নাইট্রোজেন সরাসরি কাজে লাগান বা জীবদেহে উহার রাসায়নিক মিলন ঘটান সম্ভব হয় না।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে বাতাসের নাইট্রোজেন পরোক্ষ উপায়ে জীবজগতের পক্ষে সহজলভ্য হইয়া থাকে। যেমন,

(১) মেঘে বিদ্যুৎক্ষরণের ফলে আকাশের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন নাইট্রিক অক্সাইডের সৃষ্টি করে এবং পরে উহা নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়া উহা মাটিতে আসে এবং সেখানে উহা প্রশমিত হইয়া বিভিন্ন নাইট্রেট লবণের সৃষ্টি করে। এই লবণ মাটির তলায় জলে সঞ্চিত থাকে। এই নাইট্রেট লবণ হইতে উদ্ভিদ নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং প্রোটিনে রূপান্তরিত করে। আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় গড়ে প্রতদিন প্রায় ছয় লক্ষ মণ নাইট্রোজেন এই ভাবে বায়ু হইতে অপসারিত হয়।

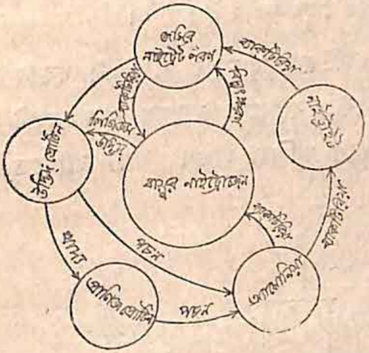
$$\frac{N_2 + O_2}{\text{বায়ু}} \rightarrow NO \xrightarrow{O} NO_2 \xrightarrow{H_2O} HNO_3 \xrightarrow[\text{ক্ষার}]{\text{জমির}} \text{নাইট্রেট্ লবণ।}$$

(২) লিগুইমিনাস জাতীয় গাছের শিকড়ের উপর একপ্রকার অঙ্কুর জন্মে, উহাকে **নডিউল** (nodule) বলে। এই নডিউলে অবস্থিত একপ্রকার ব্যাকটিরিয়া সোজাসুজি বাতাসের নাইট্রোজেনকে প্রোটিন যৌগে পরিণত করিয়া উদ্ভিদ-খাদ্যের উপযোগী করিয়া থাকে।

জন্তুরা সর্বদাই উদ্ভিদ্ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া নিজেদের প্রোটিন সঞ্চয় করে। জন্তুদের ভিতর যাহারা মাংসাশী উহারা আবার অপর জন্তুর মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি হইতেও নিজেদের প্রোটিন পায়। মানুষ, উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য পশুজাত দ্রব্য হইতে তাহার দেহের গঠনের জন্য প্রোটিন তৈয়ারী করে।

এইভাবে সমস্ত জীবজগতে বায়ুর নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হইলেও মোটামুটি বায়ু মণ্ডলের নাইট্রোজেনের পরিমাণ প্রায় স্থির থাকে। তাহার কারণ, কতকগুলি বিপরীত ক্রিয়াও প্রকৃতিতে সদাসর্বদা ঘটিতেছে এবং উহার ফলে যে নাইট্রোজেন যৌলের উৎপাদন হইতেছে উহাও বায়ুতে ফিরিয়া যায়।

উদ্ভিদ বা জীবজন্তু ধ্বংসের পর উহার দেহের পচন সুরু হয়। ইহাতে ইহাদের প্রোটিন সমূহ অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়াম যৌগে পরিণত হয়। জমিতে এই সকল পদার্থ বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে প্রথমে নাইট্রাইট্ এবং পরে নাইট্রেট্-এ পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই সমস্ত নাইট্রেটের কতকাংশ উদ্ভিদ্ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু অপরাংশ আবার এক প্রকার ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হইয়া বাতাসে ফিরিয়া যায়। এইভাবে নাইট্রোজেন বায়ু হইতে অপসারিত হইয়া জীবজগতে প্রবেশ করে, আবার জীবজগতে উদ্ভিদ ও জীবদেহের ধ্বংস ও পচনের ফলে দেহ হইতে ঐ নাইট্রোজেন বাহির হইয়া আসে ও উহা বায়ুতে ফিরিয়া যায়।



নাইট্রোজেন চক্র
চিত্র-১২

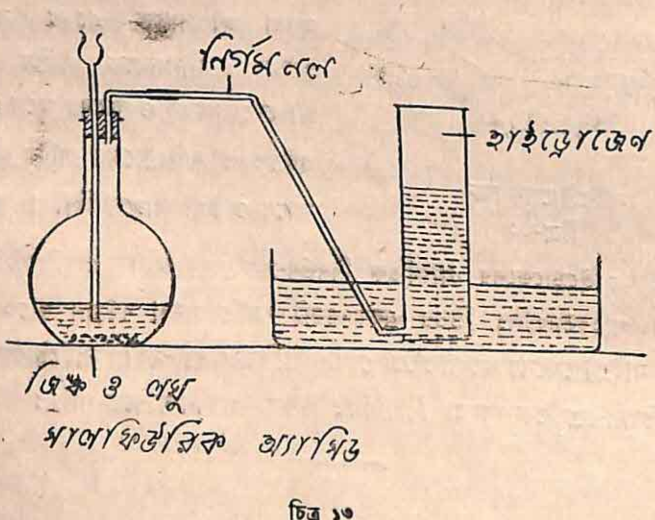
ইহাকেই নাইট্রোজেনের প্রাকৃতিক বিবর্তন-চক্র বলা হয়। প্রকৃতিতে এই বিপরীত পরিবর্তনগুলির ভিতর এমন একটি সঙ্গতি সর্বদা বর্তমান থাকে যে বায়ুতে নাইট্রোজেনের অনুপাতটির কোন ব্যতিক্রম হয় না। নাইট্রোজেনের এই পরিক্রম-চক্রটিকে আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রকাশ করিতে পারি :

সঙ্কেত H_2। **চিহ্ন** H।

হাইড্রোজেন যে একটি মৌলিক পদার্থ 1766 খৃষ্টাব্দে ইহা ক্যাভেণ্ডিস্ সর্ব প্রথমে প্রমাণ করেন।

প্রকৃতিতে হাইড্রোজেন প্রায় সর্বদাই অন্যান্য মৌলের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। যেমন, জল, পেট্রোলিয়াম এবং বিভিন্ন জৈব পদার্থ ইত্যাদি।

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ একটি ফ্লাস্কের মধ্যে খানিকটা দস্তার ছিবড়া (granulated Zinc) লও। কর্কের সাহায্যে ফ্লাস্কের মুখে একটি দীর্ঘনাল ফানেল এবং একটি বাঁকান নির্গমনল জুড়িয়া দাও। লক্ষ্য রাখিতে

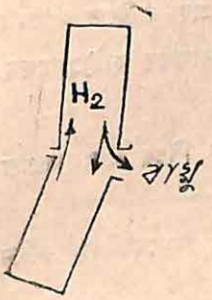


চিত্র ১৩

হইবে যে কর্ক এবং নলগুলির সংযোগ যেন সম্পূর্ণ বায়ুরোধী (air-tight) হয়। কারণ, তাহা না হইলে হাইড্রোজেনের সহিত বায়ু মিশিয়া গিয়া একটি বিস্ফোরক মিশ্রণে পরিণত হইবে (চিত্র ১৩)। নির্গম-নলের শেষ প্রান্তটি একটি গ্যাস-দ্রোণীর ভিতরে জলের নীচে রাখিতে হইবে। ইহার পর দীর্ঘনাল-ফানেলের ভিতর দিয়া লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ফ্লাস্কের ভিতরে ঢালিয়া দাও। অ্যাসিডের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত যেন দস্তার ছিবড়াগুলি এবং দীর্ঘনাল-ফানেলের প্রান্তটি অ্যাসিডে ডুবিয়া থাকে, নচেৎ এই ফানেলের ভিতর দিয়াই হাইড্রোজেন বাহির হইয়া যাইবে। অ্যাসিড ও জিঙ্কের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$.

উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাস প্রথমে ফ্লাকের অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে নির্গম-নলের ভিতর দিয়া বাহির করিয়া দেয়। বাতাস বাহির হইয়া যাওয়ার পর নির্গম-নল দিয়া হাইড্রোজেন আসিতে থাকে এবং গ্যাসদ্রোণীর জলের ভিতর দিয়া বুদ্‌বুদের আকারে উঠিতে থাকে। একটি গ্যাস-জার জলে সম্পূর্ণ ভর্ত্তি করিয়া যেখানে গ্যাসের বুদ্‌বুদ বাহির হইতেছে সেখানে উপুড় করিয়া ধর। হাইড্রোজেন গ্যাস-জারের জল অপসারিত করিয়া সেই পাত্রে সঞ্চিত হইতে থাকিবে।

প্রথম গ্যাস-জারটি হাইড্রোজেন পূর্ণ করিয়া উহাতে একটি জলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইয়া দাও। যদি বিস্ফোরণ হয় (অর্থাৎ আওয়াজ হয়) তবে বুঝিতে হইবে ফ্লাস্কের অভ্যন্তরের বায়ু সম্পূর্ণ বাহির হইয়া যায় নাই। আরও খানিক্ষণ হাইড্রোজেন গ্যাস ছাড়িয়া দিয়া ভিতরের বাতাসকে সম্পূর্ণ দূর করিয়া দাও। অতঃপর হাইড্রোজেনের ধর্ম পরীক্ষা করার জন্য কয়েকটি গ্যাস-জার এইভাবে হাইড্রোজেন গ্যাসে ভর্ত্তি করিয়া লও।



চিত্র ১৪

হাইড্রোজেনের ধর্ম : (১) বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন একটি স্বচ্ছ, বর্ণহীন গ্যাস। জগতের ইহা লঘুতম পদার্থ। নীচের গ্যাস-জার হইতে হাইড্রোজেন হালকা বলিয়া উপরের গ্যাস জারে যাইবে (চিত্র ১৪)।

(২) হাইড্রোজেন একটি দাহ্য পদার্থ। বায়ু বা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আগুনের সংস্পর্শে আসিলেই উহা জলিয়া উঠে এবং রাসায়নিক জল উৎপন্ন করে।

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O.$$

(৩) অনেক উত্তপ্ত ধাতব অক্সাইডের উপর দিয়া হাইড্রোজেন চালনা করিলে সেই সকল যৌগ হইতে অক্সিজেন বিচ্যুত হইয়া জল ও ধাতু উৎপন্ন হয়। যেমন, হাইড্রোজেনের সান্নিধ্যে কপার-অক্সাইড উত্তপ্ত করিলে জল এবং কপার পাওয়া যায়।

$$CuO + H_2 = Cu + H_2O.$$

(৪) বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনেক অ-ধাতুর সহিত হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে যেমন :—

$H_2 + Cl_2 = 2HCl$ (আলোর বর্তমানে)

$3H_2 = N_2 = 2NH_3$ (উত্তাপ, প্রভাবক এবং চাপের সাহায্যে)

$H_2 + 2C = C_2H_2$ (বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে)

(৫) কোন কোন ধাতব পদার্থ, বিশেষত প্যালাডিয়াম, আয়রণ ইত্যাদি হাইড্রোজেন গ্যাসকে-শোষণ করিয়া লইতে পারে। ধাতুর এই প্রকার গ্যাস-শোষণ কার্য্যকে অন্তর্ধৃতি বলা হয়। এই অবস্থায় হাইড্রোজেনের বিজারণ ক্ষমতা আছে।

(৬) দেখা গিয়াছে, কোন কোন পদার্থ হাইড্রোজেনের সহিত সাধারণভাবে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে না। কিন্তু সেই পদার্থের ভিতরেই যদি হাইড্রোজেন উৎপন্ন করা হয় তবে সদ্যোজাত হাইড্রোজেনের সহিত উক্ত পদার্থগুলির রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। সুতরাং উৎপত্তি ক্ষণে অর্থাৎ জায়মান অবস্থায় (nascent state) হাইড্রোজেন বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। জায়মন হাইড্রোজেন পারমাণবিক অবস্থায় থাকে বলিয়া সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা অধিকতর সক্রিয়।

হাইড্রোজেনের ব্যবহার :—বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে এবং অন্যান্য প্রয়োজনেই আজকাল হাইড্রোজেনের প্রচুর ব্যবহার হয়।

১। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিথাইল অ্যালকোহল, অ্যামোনিয়া, কৃত্রিম পেট্রোল উৎপাদন শিল্পে ইহার ব্যবহার সর্বাধিক।

২। অক্সিজেনের সহিত ইহাকে জ্বালাইয়া যে অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা তৈয়ারী করা হয়। উহার উষ্ণতা খুব বেশী, এবং ধাতু গলানোর বা জোড়া লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

৩। কৃত্রিম চর্বি জাতীয় পদার্থ উৎপাদন করিতে ইহার প্রয়োজন হয়।

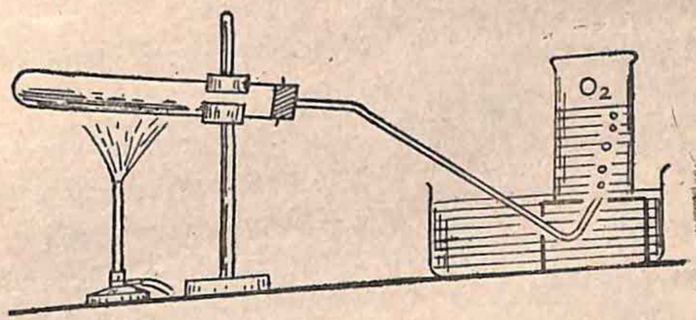
সঙ্কেত O_2। **চিহ্ন O।**

শীলে, প্রিষ্টলী, এবং ল্যাভয়সিয়র, অষ্টাদশ শতাব্দীর এই তিন জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রায় একই সময়ে তাঁহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র উপায়ে এই গ্যাসটির সন্ধান পাইয়াছিলেন। যৌগ সমূহের ভিতর পৃথিবীতে অক্সিজেনের প্রাচুর্য সর্বাধিক। পৃথিবীর বস্তু সমষ্টির প্রায় অর্দ্ধেকই অক্সিজেন। বায়ুর আয়তনের শতকরা 20·9 ভাগ এবং জলের ওজনের শতকরা 88 8 ভাগ অক্সিজেন।

ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত পদ্ধতি : চার ভাগ বিচূর্ণ পটাসিয়াম ক্লোরেট, এক ভাগ বিচূর্ণ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লও। শক্ত কাঁচের একটি পরীক্ষানলের প্রায় অর্দ্ধেকটা এই মিশ্রন দ্বারা ভরিয়া লও।

পরীক্ষানলের মুখে একটি কর্ক আঁটিয়া উহাতে একটি সরু নির্গমনল জুড়িয়া দাও। নির্গম-নলটি গ্যাস-দ্রোণীতে জলের নীচে থাকিবে। একটি বন্ধনীর সাহায্যে পরীক্ষানলটি এমনভাবে রাখ যাহাতে উহার মুখের দিকটা ঈষৎ অবনমিত অবস্থায় থাকে। এখন পরীক্ষানলটিকে তাপ দিলেই আস্তে আস্তে উহার অভ্যন্তরস্থ পটাসিয়াম ক্লোরেট বিয়োজিত হইয়া পটাসিয়াম ক্লোরাইড এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হইবে (চিত্র ১৫)।

$$2KClO_3 = 2KCl + 3O_2.$$



চিত্র ১৫

অক্সিজেন গ্যাস নির্গম-নল দিয়া আসিয়া জলের ভিতর বুদ্বুদের আকারে বাহির হইতে থাকিলে ঐ স্থানে একটি জলপূর্ণ গ্যাসজার উপুর করিয়া রাখ। গ্যাসজারের ভিতর হইতে জল সরিয়া যাইবে এবং গ্যাসজারটি অক্সিজেন গ্যাসে ভর্তি হইয়া যাইবে এখন একটি ঢাকনি দিয়া উহার মুখটি বন্ধ করিয়া লও। অক্সিজেনের ধর্মের পরীক্ষার জন্য এইরূপে কয়েকটি গ্যাসজার অক্সিজেনে পূর্ণ কর।

অক্সিজেনের ধর্ম : (১) অক্সিজেন একটি স্বচ্ছ, বর্ণহীন, গ্যাস। বাতাসের চেয়ে ইহা ঈষৎ ভারী ; জলে ইহার দ্রাব্যতা অল্প। স্বল্প হইলেও এই দ্রবীভূত অক্সিজেন জলে আছে বলিয়া মাছ, বহুবিধ জলচর প্রাণী এবং উদ্ভিদ জলে বাস করিতে পারে।

(২) অক্সিজেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা সমধিক। কাঠ, কেরোসিন, মোম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি বাতাসে আগুন ধরাইয়া দিলে উহারা জলিয়া ওঠে এবং পুড়িতে থাকে। পুড়িবার সময় উত্তাপ ও অল্পাধিক আলোর সৃষ্টি হয়। এই প্রজ্বলনের সময় প্রকৃত পক্ষে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত ঐ সকল পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয় জ্বলন্ত মোমবাতির উপর যদি একটি গ্লাস চাপা

দাও অথবা হারিকেনের লণ্ঠনের নীচের বায়ু-প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া দাও তবে মোম বা লণ্ঠনের বাতি আর জ্বলিবে না। এই জাতীয় রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দহন বলে। (৩) অক্সিজেন নিজে দাহ্য পদার্থ নহে, কিন্তু অপরের দহন ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

(৪) অক্সিজেন সোজাসুজি বহু ধাতব এবং অধাতব মৌলিক পদার্থের সহিত যুক্ত হইতে পারে। ইহাতে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকে অক্সাইড বলে। যেমন' $C + O_2 = CO_2$; $2Zn + O_2 = 2ZnO$.

(৫) মৌলিক পদার্থ ছাড়া, অনেক যৌগিক পদার্থের সহিতও অক্সিজেন সংযুক্ত হয় যেমন, $2NO + O_2 = N_2O_4$.

স্বচ্ছ বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে অক্সিজেন সংস্পর্শে আসামাত্রা উহা লাল রং-এর নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়। অক্সিজেনের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য অনেক সময় এই ক্রিয়ার সহায়তা লওয়া হয়।

অক্সিজেনের ব্যবহার: (১) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ শিখা জ্বলিবার সময় যে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয় উহা ধাতুর পাত প্রভৃতি জুড়িতে ব্যবহার হয়।

(২) সালফিউরিক অ্যাসিড্ এবং নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে।

(৩) জলের নীচে ডুবুরীদের, উড়োজাহাজে পরিচালনার জন্য ও রোগীর কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য্যের সময়। অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়।

(৪) নানা প্রকার ধাতু যেমন, লোহা, তামা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে।

সঙ্কেত N_2 **চিহ্ন N।**

1772 খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন গ্যাসটি আবিষ্কার করেন। নাইটার খনিজে (nitre) এই মৌলিক পদার্থটি আছে বলিয়া চাপ্ টাল্ (1790) উহার নামকরণ করেন—"নাইট্রোজেন"।

বাতাসে মৌলিক অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন বর্তমান। নাইট্রোজেনের বিভিন্ন যৌগও প্রকৃতিতে যথেষ্ট দেখা যায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বিভিন্ন প্রোটিনগুলি সবই নাইট্রোজেনের যৌগিক পদার্থ।

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত পদ্ধতি: (১) ল্যাবরেটরীতে সচরাচর অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের দ্রবণ উত্তপ্ত করিয়া নাইট্রোজেন তৈয়ারী করা হয়। অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের বিয়োজন অনেক সময় সংযত করা সুকঠিন এবং বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহার পরিবর্তে সোডিয়াম নাইট্রাইট ও অ্যামোনিয়াম

ক্লোরাইডের দ্রবণ মিশ্রিত করিয়া লওয়া হয়। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম নাইট্রাইট একত্র হইয়া অ্যমোনিয়াম নাইট্রাইট সৃষ্টি করে এবং ইহা বিয়োজিত হইয়া নাইট্রোজেন উৎপন্ন করে।

$$NH_4Cl + NaNO_2 = NH_4NO_2 + NaCl,$$
$$NH_4\,NO_2 = N_2 + 2H_2O.$$

একটি গোল কর্ক আটা কুপীতে তুল্য পরিমাণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম নাইট্রাইটের দ্রবণকে অল্প গরম করিলেই নাইট্রোজেন উৎপন্ন হইবে এবং নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া গ্যাসজারে সঞ্চিত হইবে। এই নাইট্রোজেন বিশুদ্ধ নয়। কোন তীব্র ক্ষারে ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা ধৌত করিয়া বিশোধিত করা হয়।

নাইট্রোজেনের ধর্মঃ নাইট্রোজেন বর্ণহীণ, গন্ধহীন, গ্যাসীয় পদার্থ। উহার ঘনত্ব প্রায় বাতাসের ঘনত্বের সমান এবং জলে উহার দ্রাবতা নিতান্তই কম। সাধারণ উষ্ণতায় নাইট্রোজেনের কোনরূপ রাসায়নিক সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না। কোন মৌল বা যৌগিকের সহিত সাধারণ উষ্ণতায় ইহা যুক্ত হয় না। ইহা নিজেও দাহ্য নয় এবং অপরের দহনে সহায়কও নয়।

(১) Ca, Mg প্রভৃতি কোন কোন ধাতু এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইড উত্তপ্ত অবস্থায় নাইট্রোজেন-এর সহিত যুক্ত হয়। যথা, $3Mg + N_2 = Mg_3N_2$.

$CaCN_2 = C + CaCN_2$ [ক্যালসিয়াম সায়নামাইড]

$CaCN_2$ এবং কার্বনের মিশ্রণকে "নাইট্রোলিম বলে ইহা জমির সার।

(২) অতিরিক্ত চাপে (200 অ্যাটমস্‌ফিয়ার) এবং প্রায় 500°C উষ্ণতায়, লোহ চূর্ণের প্রভাবে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক মিলনে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

নাইট্রোজেনের ব্যবহার: (১) অ্যামোনিয়া প্রস্তুতিতে। (2) বৈদ্যুতিক বালবের ভিতরে এবং গ্যাস থার্মোমিটারে নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয়।

অ্যামোনিয়া।

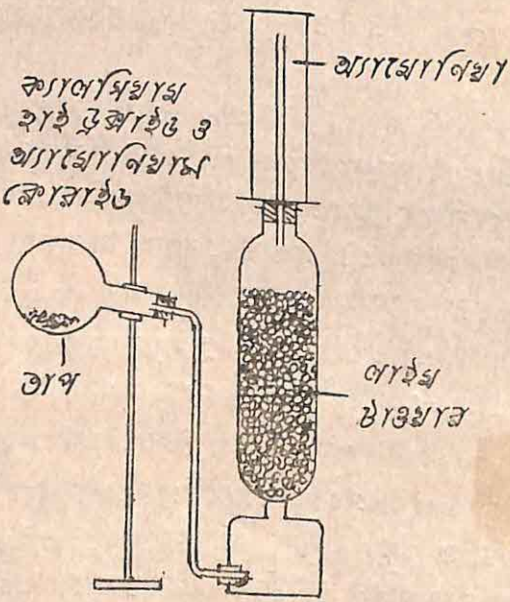
সঙ্কেত NH_3।

বাতাসে কখনও স্বল্প পরিমাণে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। উদ্ভিদ ও প্রাণী-দেহের ধ্বংস ও পচনের ফলে জমিতে অ্যামোনিয়া ঘটিত লবণ পাওয়া যায়। প্রোটিনের উপর ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ার ফলেই এই অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত পদ্ধতি : সাধারণত অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের উপর কোন ক্ষারক জাতীয় পদার্থের বিক্রিয়া ঘটাইয়া অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা হয়। ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কলিচুণ ক্ষারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 = 2NH_3 + CaCl_2 + 2H_2O.$$

একটি গোল কূপীতে সমপরিমাণ অ্যামোনিয়াম ক্লেরোইড ও ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইয়া উত্তপ্ত কর। কূপীর নির্গন-নলের অপর প্রান্তটি একটি কলিচূণের টাওয়ারের (lime tower) সহিত যুক্ত করিয়া দাও। চূণের টাওয়ারের উপরে একটি নল সংযুক্ত থাকে (চিত্র ১৬)। এই

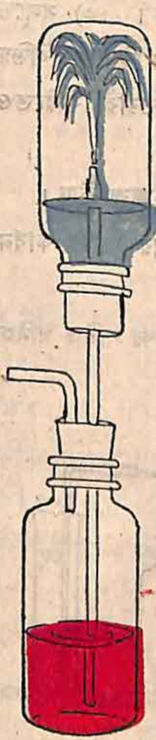


চিত্র ১৬

নলের উপর একটি গ্যাসজার উপুড় করিয়া রাখো। উৎপন্ন অ্যামোনিয়া নির্গমনল দিয়া আসিয়া চূণের টাওয়ারে প্রবেশ করিবে। চূণের ভিতর দিয়া যাওয়ার ফলে অ্যামোনিয়ার সহিত কোন জলীয় বাষ্প থাকিলে তাহা কলিচুণ শোষণ করিয়া লয়। অ্যামোনিয়া আসিয়া গ্যাসজারে সঞ্চিত হইবে। এইক্ষেত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড্ বা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড জলীয় বাষ্প দূরীকণের জন্য ব্যবহৃত হয় না, কারণ ইহাদের উভয়ের সহিতই অ্যামোনিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। অ্যামোনিয়া বাতাস অপেক্ষা অনেক লঘু বলিয়া উহা গ্যাসজার হইতে

বাতাসকে নীচের দিকে ঠেলিয়া দিয়া উহাতে সঞ্চিত হইতে পারে। অ্যামোনিয়া জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়, সেই জন্য ইহাকে জলের অপসারণ দ্বারা গ্যাসজারে সংগ্রহ করা যায় না।

অ্যামোনিয়ার ধর্ম : (১) ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস। ইহা বাতাস অপেক্ষা অনেক হাল্কা। (২) অ্যামোনিয়া জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। জলে ইহার দ্রবণকে "লাইকার অ্যামোনিয়া" (Liquor ammonia) বলে।



চিত্র ১৭

অ্যামোনিয়া জলে দ্রবীভূত হওয়ার সময় জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া অ্যামোনিয়াম্ হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে। ইহা একটি ক্ষার। (৩) অ্যামোনিয়া অপরের দহনে সাহায্য করে না, এবং স্বভাবতঃ নিজেও অদাহ্য।

(৪) বাতাস বা অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় অ্যামোনিয়া যদি উত্তপ্ত প্লাটিনাম-জালির (প্রভাবক) উপর দিয়া প্রবাহিত করা হয়, তাহা হইলে অ্যামোনিয়া নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হয়। নাইট্রিক অ্যাসিড শিল্প এই বিক্রিয়ার উপরই নির্ভর করে।

$$4NH_3 + 5O_2 = 6H_2O + 4NO.$$

(৫) উত্তপ্ত কপার-অক্সাইডের উপর দিয়া অ্যামোনিয়া পরিচালনা করিলে অ্যামোনিয়া জারিত হইয়া নাইট্রোজেনে পরিণত হয়।

$$2NH_3 + 3CuO = 3Cu + 3H_2O + N_2.$$

উপরের বোতলে অ্যামোনিয়া ভর্তি করিয়া লাল লিটমাস দ্রবণ ভর্তি আর একটি বোতলের সহিত যুক্ত করা হইল। উপরের বোতলটিকে একটু ঠাণ্ডা করিলেই লিটমাস-দ্রবণ নলের ভিতর দিয়া উপরের বোতলটিতে প্রবেশ করিবে। অ্যামোনিয়ার সংস্পর্শে আসিলেই লাল লিটমাস নীল হইয়া যায় এবং অ্যামোনিয়া জলে দ্রুত দ্রবীভূত হয়। ফলে বোতলের অভ্যন্তরে চাপ কমিয়া যায় এবং নীচের লাল লিটমাস দ্রবণ বেগে ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটি ফোয়ারার সৃষ্টি করে। অ্যামোনিয়ার ক্ষারকত্ব এবং দ্রাব্যতা উভয়ই এই পরীক্ষাতে প্রমাণিত হয় (চিত্র ১৭)।

(১) অ্যামোনিয়া নেস্‌লার নামক দ্রবণের (Nessler's solution) সংস্পর্শে আসিলেই তামাটে রংয়ের অধঃক্ষেপ দেয়। এই পরীক্ষার দ্বারা অ্যামোনিয়া চিনিতে পারা যায়।

অ্যামোনিয়ার ব্যবহার : (১) অ্যামোনিয়া ক্ষারক হিসাবে ব্যবহার হয়। (২) জল ঠাণ্ডা করার জন্য তরল অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হয়। (৩) সল্‌ভে প্রণালীতে সোডা তৈয়ারী করার জন্য। (৪) জমিতে সার হিসাবে বিভিন্ন অ্যামোনিয়াম লবণ ব্যবহৃত হয়। (৫) নাইট্রিক অ্যাসিড তৈয়ারী করিতেও ব্যবহৃত হয়।

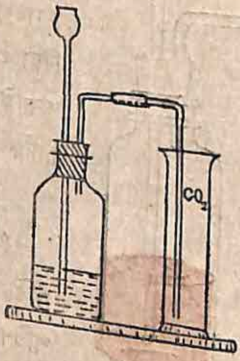
কার্বন ডাই-অক্সাইড।

সঙ্কেত CO_2।

পৃথিবীর কোন কোন অংশে ভূগর্ভ হইতেও অনেক সময় যথেষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়।

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত পদ্ধতি : ধাতব কার্বনেট লবণের সহিত খনিজ অ্যাসিডের বিক্রিয়ার সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত করাই সাধারণ রীতি।

সাধারণতঃ মার্বেল-পাথরের সহিত লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশাইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈয়ারী করা হয়। খানিকটা ছোট মার্বেলের টুকরা একটি দীর্ঘনাল-ফানেল এবং একটি নির্গম-নল আঁটা বোতলের মধ্যে লইয়া দীর্ঘনাল-ফানেলের ভিতর দিয়া লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেওয়া হয়। ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া থাকে। ইহা বায়ু অপেক্ষা ভারী বলিয়া বায়ুর উর্দ্ধভ্রংশের দ্বারা গ্যাসজারে সঞ্চয় করা হয় (চিত্র ১৮)।



চিত্র ১৮

$$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2.$$

সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্বারা ধৌত করিয়া গ্যাসটিকে শুষ্ক করা হয়।

এই প্রস্তুতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা সমীচীন নয়, কেননা প্রথমতঃ খানিকটা বিক্রিয়া হওয়ার পরই উৎপন্ন অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম সালফেট মার্বেলের উপর জমিয়া বিক্রিয়াটি বন্ধ করিয়া দেয়।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের ধর্ম : (১) কার্বনডাই-অক্সাইড একটি বর্ণহীন গ্যাস। ইহার একটি মৃদুঘ্রাণ এবং একটু অম্ল-স্বাদ আছে। চাপ-বৃদ্ধি

করিয়া সহজেই এই গ্যাসটিকে তরল করা যায়। ষ্টীলের সিলিণ্ডারে অতিরিক্ত চাপে তরল কার্বন ডাই-অক্সাইডকে সহসা বাষ্পীভূত করিতে গেলেই উহার খানিকটা জমিয়া কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। ইহা হিমায়ক-রূপে প্রচুর ব্যবহার হয়। ইহাকে "শুকনো বরফ" (Dry ice) বলা হয়।

(২) কার্বন ডাই-অক্সাইড নিজে দাহ্য নয় এবং অপর কোন বস্তুর দহনেও সহায়ক নয়। এই জন্য ছোট ছোট অগ্নিকাণ্ড নির্বাপণ করিতে প্রায়ই কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহৃত হয়।

(৩) জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়াম বা পটাসিয়াম এই গ্যাসে যথারীতি জ্বলিতে থাকে। দহনের ফলে CO_2 হইতে কালো কার্বন কণা পাওয়া যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড যে কার্বনের যৌগ ইহাই তাহার প্রমাণ। $2Mg + CO_2 = 2MgO + C$.

(৪) কার্বন ডাই-অক্সাইডে জীবজন্তু থাকিলে অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকার্য বন্ধ হইয়া মারা যায়।

(৫) সাধারণ অবস্থায় কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে প্রায় সমায়তন পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু চাপবৃদ্ধি করিয়া উহার দ্রাব্যতা যথেষ্ট বাড়ান যায়। অতিরিক্ত চাপে অধিক পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত করিয়াই বাতান্বিত জল সোড়া, লেমনেড প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। (৬) কার্বন ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণটি অম্ল-জাতীয় ইহার নাম কার্বনিক অ্যাসিড।

$$H_2O + CO_2 = H_2CO_3.$$

(৭) ক্ষারের-দ্রবণের সহিত ক্রিয়া করিয়া কার্বনেট বা বাই-কার্বনেট লবণ উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ার ফলে চুনের জল ঘোলা হয়।

$$Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O.$$

পুনরায় অতিরিক্ত পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে, ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেটে পরিণত করে, ফলে ঘোলা চুনের জল পুনরায় পরিস্কার হইয়া যায়।

$$CaCO_3 + H_2O + CO_2 = Ca(HCO_3)_2.$$

(৮) লোহিততপ্ত কার্বন, অথবা উত্তপ্ত জিঙ্ক, আয়রণ-চূর্ণ প্রভৃতি কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বিজারিত করে। $CO_2 + C = 2CO$.

কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যবহার: (১) সমস্ত উদ্ভিদ্-জগতের বৃদ্ধি ও অস্তিত্বের জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইডের একান্ত প্রয়োজন। (২) হিমায়করূপে আজকাল প্রচুর পরিমাণ কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহৃত হয়। (৩) অগ্নি-

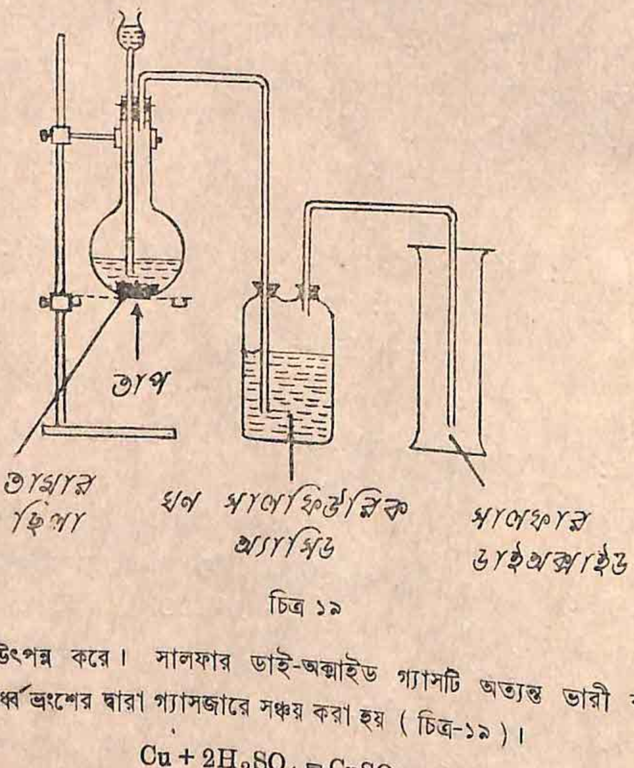
নির্বাপণের কাজে এবং বাতান্বিত জল প্রস্তুত করিতে ও (৫) সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত করিতেও কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োজন হয়।

সঙ্কেত SO_2। **সালফার-ডাই-অক্সাইড।**

আগ্নেয়গিরির গ্যাসে সালফার ডাই-অক্সাইড থাকে। কয়লা পোড়ানোর ফলে যে গ্যাস হয় তাহাতেও কিছু কিছু সালফার ডাই-অক্সাইড থাকে।

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত পদ্ধতি:

একটি গোল কূপীতে খানিকটা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ও কপারের ছিলাকে উত্তপ্ত করা হয়। নির্গম-নলটি একটি গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড-পূর্ণ গ্যাস-ধাবকের সহিত যুক্ত থাকে। অতঃপর গোল কূপীটি উত্তপ্ত করিলে সালফিউরিক অ্যাসিড কপার দ্বারা বিজারিত হয় এবং সালফার ডাই-অক্সাইড



চিত্র ১৯

গ্যাস উৎপন্ন করে। সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসটি অত্যন্ত ভারী বলিয়া বায়ুর ঊর্ধ্ব ভ্রংশের দ্বারা গ্যাসজারে সঞ্চয় করা হয় (চিত্র-১৯)।

$$Cu + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O.$$

সালফার ডাই-অক্সাডের ধর্ম: (১) সালফার ডাই-অক্সাইড বর্ণহীন তীব্র ঝাঁঝালো শ্বাস-নিরোধী গ্যাস কিন্তু ইহা বিষ নয়। বাতাস অপেক্ষা ইহা ভারী। সাধারণ উষ্ণতায় একটু বেশী চাপ দিলেই ইহা তরলিত হইয়া থাকে। তরল সালফার ডাই-অক্সাইডে অনেক মৌল এবং কোন কোন লবণ দ্রবীভূত হয়।

(২) সালফার ডাই-অক্সাইড নিজে দাহ্য নয় এবং অপরের দহনেও সহায়তা করে না; তবে জ্বলন্ত পটাসিয়াম বা লৌহচূর উহাতে জ্বলিতে থাকে:

$$3Fe + SO_2 = 2FeO + FeS.$$

(৩) সালফার ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ অম্লজাতীয়। বস্তুতঃ এই জলীয় দ্রবণটিই **সালফিউরাস অ্যাসিড-দ্রবণ**।

ওজোন সালফার ডাই-অক্সাইডকে জারিত করে

$$3SO_2 + O_3 = 3SO_3.$$

বস্তুতঃ, এই অক্সিজেন-গ্রহণ-ক্ষমতার জন্যই সালফার ডাই-অক্সাইড বিজারণ-গুণ সম্পন্ন হইয়াছে। সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস চালনা করিলে লাল পটাস পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ বর্ণহীন হইয়া যায়।

$$2KMnO_4 + 5SO_2 + 2H_2O = K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 2H_2SO_4.$$

এই সকল বিজারণের ফলে SO_2 সর্বদাই সালফিউরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

(৫) অনেক জৈবজাতীয় রঙ্গীন পদার্থকে সালফার ডাই-অক্সাইড বিরঞ্জিত করিয়া থাকে। এই বিরঞ্জন-ক্রিয়া জল ব্যতিরেকে হইতে পারে না। খুব সম্ভবত SO_2 প্রথমে জলের সহিত ক্রিয়ার ফলে জায়মান হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে, এবং এই জায়মান হাইড্রোজেনই প্রকৃত বিরঞ্জক।

$$SO_2 + 2H_2O = H_2SO_3 + 2H.$$

কয়েকটি রঙ্গীন ফুলের পাপড়ি সিক্ত অবস্থায় সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসে রাখিয়া দিলে কয়েক মিনিটেই উহা সাদা হইয়া যায়। সেইজন্য সিল্ক, উল প্রভৃতি সালফার ডাইঅক্সাইডের সাহায্যে পরিস্কৃত বা সাদা করা হয়।

(৬) কোন কোন ক্ষেত্রে সালফার ডাই-অক্সাইড জারক হিসাবেও ক্রিয়া করে। যেমন: - $2H_2S + SO_2 = 3S + 2H_2O.$

ব্যবহার: সাধারণ বিরঞ্জক হিসাবে ইহার প্রয়োগ আছে। চিনি উৎপাদনেও ইহা বিরঞ্জক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রোগ-জীবাণুনাশক বলিয়া ইহা

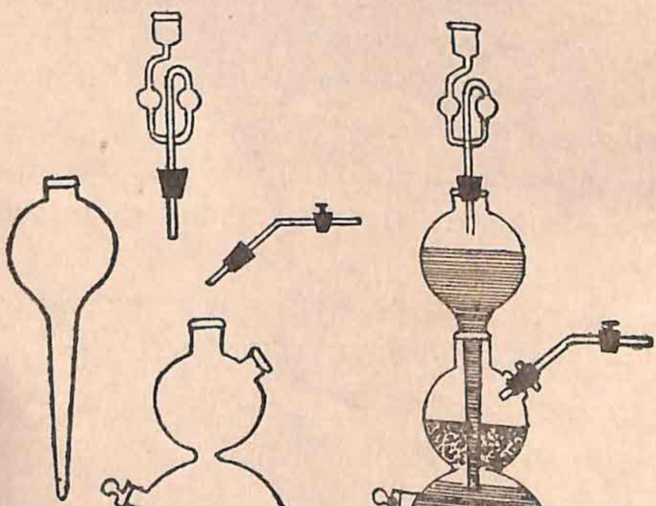
বীজঘ্ন (disinfectant) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতেই ইহার ব্যবহার সর্বাধিক।

সঙ্কেত H_2S। **হাই ড্রাজেন-সালফাইড।**

এই পদার্থটি কোন কোন প্রস্রবণের জলে, আগ্নেয়গিরির গ্যাসে, এবং জৈব পদার্থে, পাওয়া যায়। চামড়া, পচাডিম, মাছ প্রভৃতির দুর্গন্ধ এই গ্যাসটির জন্যই।

সচরাচর ধাতব সালফাইডের উপর হাইড্রোক্লারিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার দ্বারা হাইড্রোজেন-সালফাইড প্রস্তুত করা হয়।

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ ল্যাবরেটরীতে সর্বদাই ফেরাস সালফাইড ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্বারা হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুত করা হয়।



চিত্র ২০

উলফ বোতলে ইহা প্রস্তুত করা হয়। ফেরাস সালফাইড, অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিলেই হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস নির্গম-নল দিয়া বাহির হইতে থাকে। গ্যাসটি বায়ু অপেক্ষা অনেক ভারী, সুতরাং বায়ুর উর্দ্ধভ্রংশের দ্বারা গ্যাসজারে সংগৃহীত করা হয়। $FeS + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2S$.

পারদের উপরে এই গ্যাস সঞ্চয় করা হয় না, কারণ ইহা পারদের সহিত

বিক্রিয়া করে। অনেক সময় গরম জলের উপরেও এই গ্যাস সংগৃহীত করা হয়। গরম জলে ইহার দ্রাব্যতা অপেক্ষাকৃত কম।

পরীক্ষাগারে অধিক পরিমাণে এই গ্যাস পাইতে হইলে কিপ-যন্ত্রে ইহা উৎপাদন করা হয়। কিপ-যন্ত্রের মধ্য গোলকে ফেরাস-সালফাইড লওয়া হয় এবং উপরে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় (চিত্র-২০)।

ফেরাস-সালফাইড হইতে উৎপন্ন গ্যাস বিশুদ্ধ নহে। প্রায়ই উহার সহিত হাইড্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত থাকে; কারণ, ফেরাস-সালফাইডে কিছু লৌহ মৌলাবস্থায় থাকে।

হাইড্রোজেন-সালফাইডের ধর্ম ঃ

হাইড্রোজেন-সালফাইড দুর্গন্ধযুক্ত ভারী একটি বর্ণহীন গ্যাস। গ্যাসটি বহুক্ষণ ধরিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে মারাত্মক হইতে পারে।

হাইড্রোজেন-সালফাইড অপর বস্তুর দহন সমর্থন করে না বটে, কিন্তু ইহা নিজে দাহ্য। জলিবার সময় জল ও সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে :-

$$2H_2S + 3O_2 = 2H_2O + 2SO_2\ ;$$

কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকিলে সালফার উৎপন্ন হয়।

$$2H_2S + O_2 = 2H_2O + 2S.$$

বিদ্যুৎক্ষরণে বা অতিরিক্ত উত্তাপে গ্যাসটি উহার মৌল দুইটিতে ভাঙ্গিয়া যায়।

(২) হাইড্রোজেন-সালফাইডের জলীয় দ্রবণ অম্লজাতীয় বলিয়া ইহা বিভিন্ন ক্ষারক পদার্থের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ ও জল উৎপন্ন করে।

$H_2S + NaOH = NaHS + H_2O$; $H_2S + 2NaOH = Na_2S + 2H_2O.$

ইহা অধিকাংশ ধাতুকেই আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে ধাতব-সালফাইডে পরিণত করে ও কালো করিয়া দেয়। সোনা ও প্লাটিনাম অবশ্য আক্রান্ত হয় না। $Pb + H_2S = PbS + H_2$, ইত্যাদি।

(৩) হাইড্রোজেন-সালফাইড অনেক ধাতব লবণের জলীয় দ্রবণের সহিত বিক্রিয়া করে এবং ধাতুকে ধাতব সালফাইডরূপে অধঃক্ষিপ্ত করে। ইহাদের অনেকের বিশিষ্ট রং থাকে। $CuSO_4 + H_2S = \underset{\text{কালো}}{CuS} + H_2SO_4.$

অজৈব লবণের রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই বিক্রিয়াসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) হাইড্রোজেনে সালফাইডের বিজারণ-ক্রিয়ার ফলে সালফার ডাই-অক্সাইডকে জল ও সালফারে পরিণত করে। ইহাও একটি জারণ-বিজারণ ক্রিয়া।

রসায়ন

প্রশ্নাবলী

১। (ক) পদার্থ কাহাকে বলে এবং উহার বিভিন্ন অবস্থা কি কি? (খ) পদার্থের ভৌত বা অবস্থাগত এবং রাসায়নিক ধর্ম বলিতে কি বোঝ?

২। ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলির সাহায্যে পদার্থের স্বরূপ-নিরূপণ কিরূপে সম্ভব তাহা কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৩। অবস্থাগত বা ভৌত পরিবর্তন ও রাসায়নিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য কি কি? উপযুক্ত উদাহরণ দাও।

নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি ভৌত অথবা রাসায়নিক—কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহা যুক্তিসহ বল।

(ক) সাধারণ লবণ বা চিনি জলের সহিত মিশাইয়া নাড়িয়া দেওয়া হইল এবং উহা অদৃশ্য হইয়া গেল।

(খ) এক টুক্‌রা সোডিয়াম জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

(গ) একটি উত্তপ্ত ফ্লাস্কে কয়েকটি আয়োডিনের স্ফটিক ফেলিলে ফ্লাস্কটি বেগুনী বাষ্পে পূর্ণ হইয়া যায়।

(ঘ) কেরোসিন তৈলের দহন।

(ঙ) লৌহের চুম্বকত্ব

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সংজ্ঞা লিখ—(ক) সমসত্ব ও অসমসত্ব পদার্থ, (খ) মৌলিক পদার্থ বা মৌল, (গ) যৌগিক পদার্থ বা যৌগ, ঘ) তাপ-উৎপাদক বিক্রিয়া ও তাপ-উৎপাদক যৌগ, (ঙ) তাপ-শোষক বিক্রিয়া ও তাপ-শোষক যৌগ।

৫। রাসায়নিক ক্রিয়া কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক ক্রিয়া কি কি? উদাহরণ দাও।

৬। রাসায়নিক ক্রিয়া বা রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটনের বিবিধ উপায় উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৭। সংজ্ঞা লিখ :—(ক) দ্রবণ, দ্রাবক, দ্রাব ; (খ) সংপৃক্ত দ্রবণ, (গ) অসংপৃক্ত দ্রবণ, (ঘ) অতিপৃক্ত দ্রবণ।

৮। ঘরের তাপমাত্রায় (ক) একটি দ্রবণের সংপৃক্ত দ্রবণ এবং (খ) সোডিয়াম থায়োসালফেট (হাইপো) এর অতিপৃক্ত দ্রবণ কিরূপে প্রস্তুত করিবে তাহা বর্ণনা কর।

৯। সংজ্ঞা লিখ :—গলনাঙ্ক, হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক।

১০। উদাহরণসহ সংজ্ঞা লিখ :—(ক) চিহ্ন, খ) সংকেত, (গ) যোজ্যতা, (ঘ) যৌগ-মূলক।

১১। একযোজী, দ্বিযোজী, ত্রিযোজী মৌল বলিতে কি বোঝ উদাহরণ-সহ বল।

১২। রাসায়নিক সমীকরণ কাহাকে বলে ? ইহার সম্পূর্ণ অর্থ কি ? সমী-করণের সীমাবদ্ধতা কি ?

১৩। (ক) পটাসিয়াম ক্লোরেট ও (খ) মারকিউরিক অক্সাইড হইতে কিরূপে অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয় চিত্রসহ বর্ণনা কর।

(ক) অক্সিজেনের প্রধান ধর্মগুলি উল্লেখ কর। (খ) অক্সিজেনের ব্যবহার কি কি ? (গ) এই গ্যাসের অস্তিত্ব কিরূপে প্রমাণ করিবে ?

১৪। ল্যাবরেটরীতে কিরূপে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করা হয় ? ইহার প্রস্তুতি ও সংগ্রহের সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা হয় তাহা উল্লেখ কর :—

(ক) জায়মান ও অন্তর্বৃতি হাইড্রোজেন বলিতে কি বোঝ ?

(খ) হাইড্রোজেনের প্রধান ধর্মগুলি বর্ণনা কর। হাইড্রোজেনের কি কি ব্যবহার ?

(গ) আণবিক অবস্থা অপেক্ষা জায়মান অবস্থায় হাইড্রোজেন যে অধিকতর সক্রিয় তাহা পরীক্ষার সাহায্যে দেখাও।

১৫। ল্যাবরেটরীতে নাইট্রোজেন প্রস্তুতির সচিত্র বর্ণনা দাও নাইট্রোজেনের প্রধান ধর্মগুলির উল্লেখ কর। ইহার ব্যবহার কি কি ?

১৬। (ক) ল্যাবরেটরীতে কিরূপে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা হয় ? কিরূপে এই গ্যাস শুষ্ক করিয়া সংগ্রহ করা হয় ? (খ) অ্যামোনিয়ার প্রধান ধর্ম ও ব্যবহার বিবৃত কর। (গ) অ্যামোনিয়াকে শুষ্ক করিবার জন্য গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ফসফরাস পেণ্ট অক্সাইড বা অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার না করিয়া চুন ব্যবহার করা হয় কেন ?